দ্বিতীয় জগৎ

ইন্দু দাঁ

বি. এম. পাবলিশার্স ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র

ও

ডঃ সুধীর বেরা

প্রণম্য বরেষু—

ইন্দু দাঁ

জবানবন্দী

পরম পূজনীয়া
রাঙা বৌদি,

আমার প্রণাম নিও। তোমার পত্র পেয়েছি। বিধুকে বারবার পত্র দিয়েও উত্তর না পেয়ে আমায় তুমি বিধুর খোঁজ নিতে বলেছিলে। তোমার নির্দেশ মতো আমি বিধুর বাড়ি গিয়ে তার খোঁজ করতে সবাই বললেন সে নাকি গত কিছুদিন যাবৎ বেপাত্তা, কোথায় গেছে তা বাড়ির লোকজন জানেন না, তাই নির্দিষ্ট করে তার হদিশ কেউ বলতে পারলেন না।

বিধুর ঘরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার লেখার টেবিলের উপর একটা কালো রঙের ডায়ারি নজরে পড়ল, সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে বুঝলাম, বিধু হয়তো এটা তোমাকে পাঠাবে বলেই লিখেছিল।

তোমার পত্রে তুমি আমার কাছেও অনুযোগ জানিয়েছ যে বিধু অনেকদিন থেকে তোমায় কোনো লেখা পাঠাচ্ছে না, আর তার লেখা না পেয়ে তোমার চিত্ত অস্থির, তাই বিধুর বাড়ির লোকের অনুমতি নিয়ে তার ডায়ারিটা নিয়ে এসে সে যা লিখেছে সেই ডায়ারি থেকে হুবহু সেটাকে নকল করে তোমায় পাঠিয়ে দিলাম, আশাকরি এতে তোমার অস্থির চিত্ত কিছুটা শান্ত হবে। বিধু ফিরলেই তোমাকে পত্র দিয়ে জানাব।

ইতি
প্রণামান্তে
তোমার ভাই—
সিধু

জানো বৌদি—

এই এখন লিখতে বসে ভাবতে অবাক লাগছে, যে, সত্যিই আমি লিখতে বসেছি। কিছুদিন হল আমার মনটা আমার সাথে ভীষণভাবে বেইমানী করছে। এতদিন ধরে যে মনের ঘরের সব দরজা জানলা খোলা রেখেছিলাম, আজ দেখি কোথা হতে ঝোড়ো হাওয়া এসে সেগুলো সশব্দে বন্ধ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ বৌদি, তোমার অনুযোগ ভরা চিঠি পেয়েই অনেকদিন পর আজকে আবার কলম ধরেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য অন্তর থেকে তো কই সাড়া পাচ্ছি না! কই কেউ তো আর আজ আমার হৃদয়ের কমলাসনে বসে কথা কইছে না। তবে কি স্বতোৎসারিত বাণীর নির্ঝর আজ শুষ্ক হয়ে গেল! তবে কি চামেলীর বনে আর তেমন করে চামেলীর সুগন্ধ বইবে না! মাধবীরা কি আর রঙিন ইশারায় আমায় মাতাল করে তুলবে না!

হৃদয়টার অবস্থা বেশ কয়েকদিন থেকে ঐ রকমই চলছে। তবে হাতটা বহুদিনের অভ্যাস বশতই হয়ত আজ কলম তুলে নিতে সাহস করেছে।

কিন্তু কী লিখব বল তো? যার কথা, যাদের কথা তুমি শুনতে চাও তার কথা, তাদের কথা কি আর আমি কোনও দিনই তেমন করে শোনাতে পারব? তুমি হয়তো জানো না বৌদি যার কাছে কূলের কোনো চিহ্নই নেই, তার কাছে পানসির হালে বসে থাকাও যা আর হাল ছেড়ে হাত গুটিয়ে পা ছড়িয়ে হতাশ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকাও তাই। এ যেন রাস্তার ভিখারীকে একটা বহুতল বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে, "এই বাড়িটা তোমার", বলে উপহাস করারই শামিল।

লিখতে বসে অবধি চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসছে। কেমন করে লিখি বল তো? কোমল হৃদয় আর পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ, তা যাদের অবস্থা আমার মতো, তারা ছাড়া হয়তো আর একজন বোঝেন, আর তিনি হলেন তোমাদের ঐ উপরওয়ালা, অর্থাৎ ভগবান নামক অপদেবতা।

অপদেবতা বললাম, কারণ, এই পুরুষের শরীর আর এই শরীরে নারীর মতো কোমল মন এই দুটোই তাঁরই সৃষ্টি, সৃষ্টি না বলে বরং অনাসৃষ্টি বলাই বোধহয় ভালো, কারণ, এই দুটি সামগ্রীই বড্ড পরস্পর-বিরোধী।

যাক ভগবানের প্রসঙ্গ থাক, আজ তুমি যার প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছো তার প্রসঙ্গেই বরং আসি, কি বল?

কিন্তু কী করে লিখি বলতো? অবশ্য যদিও লেখাটা কাল কালিতেই আরম্ভ করেছি কারণ যে কথা আজ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি তোমার অনুরোধে, সে এক কলঙ্কিত ইতিহাস, তার রঙ এই লেখার কালিটাব থেকেও কালো।

'কলঙ্কিত ইতিহাস', এইটুকু শুনেই হয়তো তুমি তোমার চাঁপাকলির মতো তর্জনী ওষ্ঠে ঠেকিয়ে বলবে, "তবে থাক না; নাই বা বললে সে কথা!" আমি খুব ভালোভাবেই জানি সামনে থাকলে তুমি ঠিক এই কথাই বলতে, কারণ তুমি যে সম্পর্কে বৌদি হয়েও মাতৃসমা সুকোমল-হৃদয়া, তাই যে কথা বলতে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়, সে কথা তুমি কিছুতেই শুনতে চাইতে না। সামনে থাকলে তুমি হয়তো উঠে পাশের ঘরে কোনো কাজের অছিলা করে চলে যেতে। কাছে থাকা আর দূরে থাকার মধ্যে মজা এখানেই, কাছে থাকলে হয়তো তোমার মুখের দিকে চেয়ে যে কথা বলতে পারতাম না, দূরে আছি বলেই কলম কালির দৌত্য মারফৎ সে কথা তোমার কাছে পৌঁছে দিতে আমার দ্বিধা নেই। অবশ্য প্রথমটায় সে দ্বিধা একেবারেই হয়নি এমনও নয়, তবু তোমার উপর আমার যতটা বিশ্বাস এতটা বিশ্বাস এই হতভাগার যদি ঐ অপদেবতা ভগবানটির উপর থাকতো।

জানো বৌদি, মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবি, ভগবান বলে কোথাও কিছু নেই। এই ভাবনাটা সময় সময় মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যায়, যে, তখন মানুষকেই সর্বশক্তিমান বলে মনে হয়, কিন্তু এই সর্বশক্তিমান মানুষই মাঝে মাঝে মানুষের

বিরুদ্ধে এমন এমন সব কাজ করে বসে, যে, তখন মনে হয় শুধু মানুষের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করেছে। এই অদৃশ্য শক্তিকে যদি ভগবান বলে মানতে হয় তো সব ভালো কাজের জন্য শুধু তাকে মেনে নিলে প্রশ্ন থেকে যায় তবে বাকি কুকাজগুলো কে করাচ্ছে।

দেখেছ তোমার খ্যাপা ভাইটার কাণ্ড! কোথা হতে পা পিছলে কোথায় চলে এসেছি। যাচ্ছিলাম হাওড়ায় ট্রেন ধবতে চলে এসেছি বেহালায় ট্রাম ধরতে।

যাই হোক তোমার চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি বেশ কিছুদিন ধরে আমার কোনো লেখা টেখা না পেয়ে খুবই অশান্তিতে দিনাতিপাত করছ। নিশ্চয়ই খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছ?

যাক্ তোমাকে আর উদ্বেগের মধ্যে রাখব না।

জানি বৌদি, আমার মা বেঁচে থাকলে হয়তো তোমারই মতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। এও বুঝতে পারছি আর কয়েকটা দিন আমার চিঠি এবং এই লেখা না পেলে তুমি হয়তো সব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এই পাগলটার জন্য ছুটে এখানেই চলে আসবে। এলেই হয়তো ভালো হত। তুমি এখানে এসে তোমার শান্ত শীতল হাত দু'খানা আমাব কপালে রাখলে আমার তীব্র কষ্ট, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার, আমার এই অপরিসীম বেদনার হয়তো কিছুটা লাঘব হত।

আচ্ছা বৌদি তুমি তো সেই কবে থেকেই আমায় দেখছ, তুমিই বল না এই হতভাগাটাকে কোনওদিন বেচাল দেখেছ? জানি আমার আরও কিছু বলার আগে তোমার ডান হাতের তালুটা দিয়ে আমার মুখটা চাপা দিয়ে বলে উঠবে "না না, সে কি কথা!" তোমার শুনতে অস্বস্তি বোধ হলেও আজ শুনতে হবে, তুমি শুনতে না চাইলেও আমায় শোনাতেই হবে কারণ, এই হতভাগার অন্তরের অন্ধকারের আবদ্ধ বিষাক্ত বাষ্পীয় পদার্থে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিকে বাইরে না আসতে দিলে সেই বিষাক্ত গ্যাসে হয়তো এই বাষ্পীয় আধারটি অর্থাৎ তোমার প্রাণপ্রিয় দেবরটির প্রাণনাশ ঘটবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই পুরোপুরি প্রাণনাশ না ঘটলেও তার আন্তরিক সৌকুমার্যের বহুতর বিনাশ ঘটেছে।

তোমার দেখা পাঁচ-ছয় বছর আগেকার শান্ত সুন্দর নিস্পৃহ সেই ছেলেটি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, আর তার বদলে তোমার দেবরটির ভিতর থেকে বের হয়ে পড়ছে অশান্ত সুন্দর অভাবপ্রবণ অসন্তুষ্ট এক বস্তুবিলাসী তরুণ, যার হৃদয়ের গভীরে সংগুপ্ত অসংখ্য অশালীন সংক্ষোভ।

সংক্ষোভগুলিকে অশালীন বললাম, তার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রধান কারণ হল, যার জীবনে এই কয়েক বছর আগেও কোনো চাওয়া ছিল না, আজ পেয়ে পেয়ে তার চাওয়াটা পাওয়ার সীমাকে অতিক্রম করে প্রচণ্ড প্রাপ্তির ধাপে পা ফেলতে চায়।

জানি বৌদি এইটুকু পড়েই তোমার চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা গলিত মুক্তার

মতো তরল পদার্থ ঝরে পড়ছে এতক্ষণে, আর এই এতদূরে বসেও আমি তা দেখতে পাচ্ছি।

তুমি ভাবছ কীইবা পেয়েছি আমি জীবনে? কোন শিশুকালে মাতৃহারা কৈশোরে পিতাকে অমরলোকের যাত্রী হতে দেখেছি। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখেছি চারিদিকে শুধু বঞ্চনা আর নৈরাশ্য। এই তো? কিন্তু তুমি তো এও জানো আমার বড় পিসিমা, আমার ঠাকুরদা আমায় কী চোখে দেখেছিলেন। হ্যাঁ বৌদি সেই দুই জোড়া চোখে দেবদেবীর চোখের শুভাশীষ ঝরে পড়েছিল আমার উপর, কিন্তু তখন আর আমার কতই বা বয়স। জগতের সকল দৃষ্টির অর্থ বোঝবার তখন বয়স কি সেটা? তুমিই বল না? বয়স যখন হল দৃষ্টি যখন স্বচ্ছ হল, তখন যেদিকে তাকাই দেখি মালিন্য ও কলঙ্ক।

না বৌদি তোমার কাছে লুকোব না। ঐ মালিন্য আর কলঙ্কের আগ্রাসী কবল থেকে আমিও রেহাই পাইনি। না হলে আজকে আমার এই হাল কেন! হ্যাঁ বৌদি, এও তোমাদের ঐ ভগবানেরই খেল।

তুমি হয়তো খুবই অবাক হয়ে গেছ আমার কথা শুনে তাইনা? কিন্তু এও জেনো নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যে পৃথিবীর সবার কাছে মিথ্যা বলতে পারলেও তোমার কাছে মিথ্যা বলবার সাহস আমার নেই।

হ্যাঁ সত্যি বলছি, তোমার এই দেবরটি আজ এক কলঙ্কিত নায়ক। তুমি এসময় সামনে থাকলে, শুধু এইটুকু শুনেই হয়তো তোমার সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত, রেগে তুমি আমার সামনে থেকে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সারা হতে, আর চোরের মতো মুখ করে তোমারই ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরে আমি নীরবে প্রহর গুনতাম তোমার খিল খোলবার অপেক্ষায়। তুমি খিল খুলে সামনে এলেই তোমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলতাম "রাঙা বৌদি, এবারকার মতো ক্ষমা করে দাও, আর কখনো এমন হবে না।" আমার একবার বলায় তোমার রাগ পড়ত না, তাই বারবার বলে শেষ চোখের জলে তোমার পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলে তবেই তোমার রাগ পড়ত, আর তুমি আমার হাত দুটো ধরে তুলে আমার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে অঙ্গুলি চুম্বন করতে, তবেই আমার মুখে হাসি ফুটত।

জানো রাঙা বৌদি! কতদিন ঐরকম কান্নার সময় ভেবেছি হয়তো আমার চোখের জলে তোমার পায়ের আলতা ধুয়ে যাচ্ছে, ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তোমার পায়ের দিকে তাকিয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কান্নার বেগ চতুর্গুণ হয়ে গেছে। তোমার আলতাহীন রাঙা চরণ দেখে মুহুর্তের মধ্যে মনে পড়ে গিয়েছে সেই দিনটার কথা যেদিনটায় কর্মস্থলে বসেই শুনতে হয়েছে রাঙাদা আর নেই।

জানো রাঙা বৌদি, তুমি সেদিন যতটা কেঁদেছিলে, ততটা না কাঁদলেও আমি সেদিন প্রায় সারাদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখের জল মুছেছি। কখনও কখনও

দুফোঁটা চোখের জল আমার লেখার খাতায় পড়েছে। লেখাটা জুবড়ে গেছে। অফিসের কেউ কেউ দেখে ফেলেছে, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে, কিন্তু আমি কাউকে বলিনি, আমার কী হয়েছে, কে হারিয়েছে। আর কেউ না জানুক তুমি তো জানো রাঙাদা কেন গেল? কোথায় গেল! আচ্ছা বৌদি তুমিই বল না একথা কি লোককে বলে বেড়াবার? এও তো কলঙ্কেরই ইতিহাস, তোমার কলঙ্ক, আমার কলঙ্ক, গোটা সমাজের কলঙ্ক, হ্যাঁ রাঙা বৌদি এ এক বিরাট কলঙ্ক আমাদের, আজও আমবা, স্বাধীনতা লাভের এই তিপ্পান্ন বছর পরেও শিক্ষিত কর্মঠ যুবক যুবতীদের দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থান কববার মতো কর্ম-সংস্থান করতে পারি না, তবু কত গর্ব আমাদের! এই আমরা স্যুট-টাই পরে মিটিং, কনফাবেন্স করে বেড়াই, টেবিল চাপড়ে কত আশার বাণী শোনাই, কত বিদ্রোহের বাজনা বাজাই, অন্ধকারে অদৃশ্য আলো দেখাই, শেষে ফুলের মালা কিংবা তোড়া হাতে করে বুক চিতিয়ে ধার করা বন্ধুর গাড়িতে চড়ে বাড়ির কাছে পাড়ার রাস্তার মোড়ে এসে বন্ধুর ড্রাইভারকে হাত নেড়ে, "আচ্ছা গুড নাইট মিঃ দত্ত," বলে লোককে জানান দিই আমি কত বৃহৎ একজন কেউ-কেটা।

হ্যাঁ রাঙা বৌদি, হেসে মরে যাই, যখন এইসব সভা সমিতিতে ডাক পড়ে। একপাশে বসে বসে সব দেখি। কি আর করি বল, চোখ দুটো তো আর উপড়ে ফেলতে পারি না, কারণ বন্ধ করে রাখলেও লোকে বলবে অসভ্য, মিটিংয়ে এসে ঘুমুচ্ছে, তাছাড়া আর একটা কারণও আছে এই প্রসঙ্গে বলেই ফেলি তোমাকে। আমি একবার বেলা প্রায় দুটো নাগাদ একটা ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম আমার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে শ-দেড়েক টাকা তুলবার জন্যে। সেদিন সকাল প্রায় আটটার সময় বের হতে হয়েছিল। কাজের চাপে বার-দুয়েক মাটির ভাঁড়ের চা ছাড়া পেটে তখনও কিছু পড়েনি। তাই চেকটা কাউন্টারে জমা দিয়ে নিশ্চিন্তে গিয়ে লাউঞ্জের বেঞ্চে বসে পড়লাম কারণ ঐ ব্যাঙ্কে চেক ক্যাশ করতে দিলে ঘণ্টা দুই আড়াই না কাটলে টাকা পাওয়া যায় না জানতাম, তাই বসেছিলাম, কিন্তু কর্মক্লান্ত শরীরে পাখার হাওয়া একটু গায়ে লাগতেই কোথা থেকে চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এসেছিল আর আমি বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পেটে একটা প্রচণ্ড গুঁতো লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, ব্যাঙ্কের দারোয়ান তখন তার ডান হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বাঁ হাতে আমার পেটে একটা বেতের রুলকাঠি ঠেকিয়ে বলছে, "শোনেকা হ্যায় তো ঘর যাও, ইয়ে তুমহারা আরাম-ঘর নেহি হ্যায়।"

তুমি তো জানোই রাঙা বৌদি, আমার সম্মান-জ্ঞান দারুণ, তাই ঘুমানোটা অন্যায় জেনে সব মেনে নিয়েও দারোয়ানের ঐ, 'তুমহারা' কথাটার তীব্র আপত্তি জানিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই ব্যাঙ্কের ঐ বেঞ্চে বসে থাকা আরও কিছু লোক ঐ দারোয়ানকে চেপে ধরল এবং সকলে মিলে উচ্চ নিনাদে এমন রব তুলল যে তখন আমারই লজ্জা পেতে লাগল। আমি তাদের বললাম, "যাকগে যাক, ছেড়ে দিন।" তারা

কিন্তু তখন দারোয়ানকে ছেড়ে প্রায় আমায় মারে আর কি! বলল, "জানেন না, ও ব্যাটা রোজই এরকম করে, ভাবে ব্যাঙ্কটা বুঝি ওর ঠাকুরদার, ভাবে আমরা বুঝি ওর বাপের লিচু বাগানে লিচু ছিঁড়তে ঢুকেছি চুরি করে, ওকে আজ শিক্ষা দিতে হবে," এই বলে সকলে মিলে দারোয়ানকে ধরে মারে আর কি! আমি কিন্তু তখন নরম হয়ে পড়েছি এবং ব্যাঙ্কের কিছু স্টাফের উপর আমারই মতো দেশের বহু লোকেরই যে ভিতরে ভিতরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তা বুঝেও দারোয়ানকে মারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হাতের কাগজপত্র বেঞ্চের উপর নামিয়ে রেখে তাদের রুখে দাঁড়িয়েছি। হল্লাটা অনেকক্ষণ চলতে থাকায় ইতিমধ্যে দু-চারজন স্টাফ বেরিয়ে এসে ম্যানেজার মিঃ নাগরকে ডেকে দিয়েছে। পিছন ফিরে মিঃ নাগরকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, কিন্তু ঐ গোলমালে তিনি যেন কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েই কিছু বলতে পারছেন না, কারণ তখন এত চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে যে কেউ আর করাও কথা শুনতেই পাচ্ছে না। লেখক হিসাবে আমার সঙ্গে মিঃ নাগরের যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তাই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাহস করে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ দাস, কী হয়েছে?" আমি বলতে যাচ্ছি, "কিছু হয়নি আপনি ভিতরে যান, সব ঠিক হয়ে যাবে," কিন্তু আমি বলবার আগেই তখন সমবেত জনতা বলতে আরম্ভ করেছে, "কী আবার হবে! ভদ্রলোককে রুলের গুঁতো মেরেছে। ছিঃ ছিঃ দারোয়ান হয়ে ব্যাঙ্কের আমানতকারীর গায়ে হাত! ভদ্রলোকের গায়ে হাত!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যত বলতে চাই, "না না, ও কিছু না ও কিছু না, আপনি ভাববেন না," সাধারণে ততই খেপে যায় আর বলে, "না আজ এর একটা ফয়সালা হোক। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলুন, কেন আমাদের জমা দেওয়া টাকা পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আর দারোয়ানের রুলের গুঁতো খেতে হয়।" ম্যানেজারকে আরও জবাবদিহি চাওয়া হল যে কাদের টাকায় ব্যাঙ্ক চলে? দেশের এই সব সাধারণ মানুষের টাকায় নাকি গুঁফো দারোয়ানের টাকায়? এছাড়া আরও যে কত কী কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়েছিল আজ আর তার সব কথা আমার মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে পরের দিন কলকাতার এক বিশেষ দৈনিক পত্রিকায় ঘটনাটাকে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তার কারণও আমিই। হতভাগা সাংবাদিক বন্ধু, মুরারীটা, অর্থাৎ সাংবাদিক বন্ধু মুরারী দে, সেও ছিল ঐ সময় ব্যাঙ্কের ভিতর, হয়তো এসেছিল কোনো কাজে আর গোলমালের মধ্যে আমাকে দেখে সব ব্যাপারটা দেখে শুনে বিহিত চেয়ে পরের দিনই সকালে ব্যাপারটাকে একেবারে ফার্স্টপেজ নিউজ করে দিয়েছিল।

পরের দিন বেলা প্রায় তিনটের সময় অফিসের ফোন বেজে উঠতেই, ফোন তুললাম। ওপার থেকে ধ্বনি এল, "মিঃ নাগর স্পিকিং, মিঃ দাস যদি কিছু মনে না করেন একবার আমার সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করলে ভালো হয়, আর না যদি আসেন তো আমাকেই যেতে হবে।"

আমি বললাম, "না না সেকি, হাতের কাজ সেরেই আমি আসছি আপনার কাছে।" জানো রাঙা বৌদি, ব্যাঙ্ক অফিসে খোদ ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখি প্লেটে টোষ্ট-অমলেট রেডি, আর আমি বসতেই কফি চলে এল। আমি তো খুব ঘাবড়ে গেলাম, ব্যাপারখানা কী? আমি তো এমন কিছু দরের লোক নই তবে মিঃ নাগর আজ এত খাতির করছেন কেন? সোজাসুজি মিঃ নাগরকে প্রশ্ন করতেই তিনি সলজ্জ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, "মিঃ দাস, কাল তো আমার ক্লায়েন্টরা চেঁচামেচি করে গেল আজ সকালে আমার স্টাফেরা সবাই এসে পেন-ডাউন স্ট্রাইক শুরু করে দিল। ব্যাপার কী? প্রশ্ন করতেই সবাই বলল একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকায় নাকি গতকালের ঘটনাটা বের হয়েছে এবং এতে নাকি আমার এই ব্রাঞ্চের সব স্টাফের মান-হানি হয়েছে। তাদের দাবী, এক্ষুণি ঐ দারোয়ান, যার জন্য এত সব কাণ্ড হয়েছে তাকে ট্রান্সফার কিংবা চার্জশীট দেওয়া হোক, না হলে কোনো কাজ হবে না। সকালবেলায় স্টাফেদের বলেছি এ ব্যাপারে বেলা সাড়ে চারটের সময় ডিসিশন নেওয়া হবে, আপনারা কাজ করুন। আমার কথায় কাজ তো করছেন সকলে কিন্তু এদিকে বেলা তো প্রায় সওয়া চারটে, আমার চার্জশীটও রেডি, এখন আপনিই বলুন তো আমি কী করি?" এই পর্যন্ত বলে ম্যানেজার মিঃ নাগর মুখটা নীচু করে আমার হাতে যে কাগজখানা ধরিয়ে দিলেন সেটা সত্যিই একটা চার্জশীট এবং মিঃ নাগরের সই পর্যন্ত করা রয়েছে।

মিঃ নাগরের কথায় বুঝলাম এযুগের মানুষ হলেও তাঁর মধ্যেকার সব কোমলতাটুকু নষ্ট হয়নি, তাই দারোয়ানের মতো একটা গরীব চাকুরীজীবীর অন্নসংস্থানের রাস্তাটা বন্ধ করে দিতে তাঁর মন সায় দিচ্ছে না।

আমিও ততক্ষণে তাঁর চার্জশীটে চোখ বুলোতে বুলোতে বেশ বিচলিতই হয়ে পড়েছিলাম, ভাবছিলাম, সামান্য কারণে আমাকেও যদি এইরকম করে কেউ চার্জশীট ধরিয়ে দিত? যেই এই কথা মনে হল অমনি মিঃ নাগরকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার এই ব্রাঞ্চের ইউনিয়নের পান্ডা কে?" তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার ইঙ্গিতটা বুঝে বললেন, "ডাকব তাঁকে?" আমি বললাম, "ডাকুন"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন, নমস্কার করে তাঁকে সব বলতেই তিনি বললেন, "না না এর কোনো ক্ষমা নেই, ওর সামান্য ভুলের জন্যই আমাদের গতকাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান শুনতে হয়েছে। এরকম স্টাফ এ ব্রাঞ্চে রাখলে আমরা আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পেন-ডাউন স্ট্রাইক চালাব। এই আমাদের শেষ ডিসিশন।"

তাঁর এই কথায় আমি তখন বেশ দিশাহারা, কারণ লোকটার চাকরি যদি যায় তো উপলক্ষ্য হয়ে থাকব আমি। না জানি বেচারার কত কষ্টই হবে, হয়তো ছেলে-পুলে-স্ত্রী, মা, বাবা সব না খেয়ে মরবে। আজকের দিনে কাউকে দু-পয়সার সাহায্য করতে পারি না আর কিনা ঐ পাপের বোঝা আজীবন কাঁধে বয়ে বেড়াতে হবে।

যেই এ কথা মনে হওয়া অমনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইউনিয়নের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারীর হাত দুটো ধরে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলতে লাগলাম, "দেখুন আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো, ঘটনাটা যখন আমাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে তখন এই শাস্তিতে অপরাধ বোধটা সব থেকে আমারই বেশি হবে, অন্তত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এবারকার মতো ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক।"

আমার এ-কথাতে ভদ্রলোকের ভ্রু-জোড়া কুঁচকে উঠল, বললেন, "কী বলছেন আপনি! এই ব্রাঞ্চের শতকরা নব্বই ভাগ স্টাফ বাঙালি। আপনি একজন বাঙালি। আমাদের ক্লায়েন্ট। আপনাকে দারোয়ান মারল রুলের গুঁতো, আর আমরা চুপচাপ সহ্য করব! সহ্য করলে তো নিজেদের, মানে বাঙালি জাতটাকেই অপমানিত হতে হবে।"

জানো রাঙা বৌদি, এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! যাই হোক, জাত্যাভিমান ভুলে আবার ভদ্রলোকের হাত দুটো ধরে বারংবার অনুরোধ করতে ভদ্রলোক কিছুটা নরম হয়ে বললেন, "তাহলে ওকে আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এর নিষ্পত্তি হতে পারে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো চমকে উঠলাম। সেই দারোয়ান, যাকে গতকাল দেখেছি। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, হয়তো আমার মতো বয়সের তার ছেলে আছে, সে ধরবে আমার পায়ে, এই চব্বিশ বছরের ফচকে ছোঁড়ার! কেন সামান্য ভুলের জন্য এই গুরুদণ্ড? আমি মনে মনে ভাবলাম আমি কীইবা এমন কেউকেটা! দুপাতা লিখতে পড়তে পারি বলেই কি আমার এই বিশেষ সম্মান। আর কত সাধারণ লোক যে দিনের পর দিন ব্যাঙ্কে এসে অযৌক্তিকভাবে কত হয়রান হচ্ছে তাদের বেলায়ও কি এই ট্রিটমেন্ট করা হয়।

উপায়ান্তর না দেখে মনে মনে যাই ভাবি, মুখে বললাম, "শুধু ক্ষমা চাইলেই হবে, আর সেটা এখনই হয়ে যাক্।" এই এখনই হয়ে যাক বলার উদ্দেশ্য, ভিতরে ভিতবে আমি তখন এত চঞ্চল হয়ে পড়েছি যে ঐ চার্জশীটটা আমার সামনে ম্যানেজারকে দিয়ে না ছিঁড়িয়ে আমি যাব না, এইরকম প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। তাই আমার কথামতো লোকটিকে ডাকা হল, সামনে এসে লোকটি একেবারে হাপুস নয়নে কেঁদে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ফেলল কেউ কিছু বলার আগেই, হয়তো সারাদিন ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের গোমড়ানো ভাব দেখে এবং কানাঘুষো সব শুনে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার চাকরি আর নেই, তাই আমাকে সামনে দেখেই বানের জলের মাঝে খড়কুটো ধরার মতোই আমার পা-দুখানা ধরে ফেলল। ঐ রকম দশাশই মার্কা চেহাবার লোকটিকে ঐ ভাবে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে শিবেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে তা আমি তো কোন ছার। তার হাত থেকে পা-দুটো ছাড়াবার জন্য যত না ব্যস্ত হয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক ব্যস্তভাবে ভগবানের কাছে তখন ক্ষমা চেয়েছিলাম নিজেকে পাপমুক্ত করবার জন্য, কারণ বাপের বয়সী লোকটির হাত দুখানা তখনও আমার পা দুটো জড়িয়ে।

কোনো রকমে তাকে ছাড়িয়ে হাত দুটো ধরে তুলে দাঁড় করালাম এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে গোঁফে তা দিতে দিতে গতকাল যে লোকটি আমার পেটে গুঁতো মেরেছিল সেই লোকটিরই সেই গোঁফ জোড়া তখন অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, তাকে একটা মৃদু ধমক দিয়ে বলতে গেলাম, "তুমি মরদ মানুষ, এত কাঁদছ কেন! যাও মন দিয়ে কাজ করগে যাও, আর ওরকম কোরো না কারও সঙ্গে।"

কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার নিজের গলাটাই কেঁপে গেল, আর এই কেঁপে যাওয়ার কারণটা নিশ্চই তোমায় বলতে হবে না রাঙাবৌদি, কারণ তুমি তো জানোই তোমার এই দেবরটি কাঁদতে ওস্তাদ, সে কি নিজের দুঃখে, কি পরের দুঃখে। ঐ লোকটার কান্নাটা তখন সত্যিই আমায় বিচলিত করে তুলেছিল।

যাই হোক এবার ইউনিয়নের সেই ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই ভদ্রলোক নিজে থেকে বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, আর কোনো গন্ডগোল হবে না, আমরাও পেন-ডাউন করছি না।" এতক্ষণে ম্যানেজার মিঃ নাগর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আপনার খাবারটা কখন থেকে পড়ে রয়েছে। নিন্ এবার ওটার সৎকার করুন," এই বলে বয়কে আর এক প্রস্থ কফি দিতে বললেন।

আমি ম্যানেজারের দিকে চার্জশীটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এটা ছিঁড়ুন তো আগে, তারপরে খাচ্ছি"।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চার্জশীটটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, "হ্যাঁ ভাই, কবি সাহিত্যিকরা কোমল হৃদয় হন বলে শুনেছি এতকাল, আজ স্বচক্ষে দেখে কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করলাম অন্তরে অন্তরে।"

মিঃ নাগরের আন্তরিকতাপূর্ণ কথার উত্তরে সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে টোস্টের প্লেটটা তুলে নিলাম।

জানো রাঙা বৌদি, দিন কতক পরে আবার কি একটা কাজে ব্যাঙ্কে গেছি, দেখি সেই দারোয়ান একগ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে সামনে দাঁড়িয়ে জোর একখান সেলাম দিল। সেদিন সেই ক্ষমা চাওয়ার সময় তার নামটা জেনে নিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম, "কী ব্যাপার দয়ানন্দন?"

দয়ানন্দন এক গাল হেসে বলল, "বাবুজী, ম্যানেজার সাবনে আপকো বোলায়া, আপনি ভেতরে যায়েন।"

সন্দিগ্ধ চিত্তে মিঃ নাগরের ঘরে ঢুকতেই তিনি একগাল হেসে বললেন, আরে মশাই এতদিন ছিলেন কোথায়? বলেই তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দিন কয়েক আগেকার একখানা বাংলা খবরের কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে বললেন, "লাল দাগ দেওয়া জায়গাটা পড়ে দেখুন।" ম্যানেজার নির্দেশিত স্থানটুকুর উপর চোখ বুলিয়ে বুঝলাম, দয়ানন্দের সেদিনের ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাটা।

বাড়ি ফিরে মুরারীকে টেলিফোনে বলাতেই মুরারী আবার পরের দিন ঐ ব্যাঙ্কের ঐ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ও ইউনিয়নের কর্তা এবং স্টাফদের প্রশংসা করে খানিকটা

লিখে দিয়েছিল। আর সেইটা পড়ে ব্যাঙ্কের সকলেই বেশ খুশী, কারণ এতে নাকি তাদের খারাপ হয়ে যাওয়া ইমেজ খানিকটা অন্তত ভালো হয়েছে।

মনে মনে ভাবলাম মুরারীটা মহা-পাজী তো! আবার ভাবলাম হয়তো প্রথম দিন রিপোর্টিংটা করে ওর মনেও সামান্য অপরাধবোধ জেগে উঠেছিল তাই পরের দিন আবার সেটাকে শুধরে দিয়েছে, কারণ ও ভালোই জানত একটা খবরের কাগজের রিপোর্টের কত দাম। এই খবরের কাগজই পারে মুহূর্তের মধ্যে কাউকে তুলতে আবার কাউকে নামাতে। ও হয়তো আন্দাজ করেছিল যে তার প্রথমদিনের রিপোর্টিংকে ভিত্তি করে দারোয়ানটার উপর নানা চাপ আসতে পারে, ফলে তার চাকরিটাও যেতে পারে। তাই দ্বিতীয় দিনে দয়ানন্দনের ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা এবং তার চাকরি বজায় থাকার ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার মুখ থেকে শুনেই সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠেছিল "যাক বাবা বাঁচালি, যা ভাবনা হয়েছিল বেচারার জন্য।"

দয়ানন্দনের প্রসঙ্গ তো ঐখানে চাপা পড়েছিল, কিন্তু মুস্কিল করল আমার মুরারীটা, দ্বিতীয় দিনের ঐ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ভালো রিপোর্টিং করার জন্য ডিসেম্বরের শীতেও আমায় ব্যাঙ্কে গেলেই ফ্রীজের ঠাণ্ডা জল খেতে হচ্ছে আজও, আর চেক রিসিভিং-এ দিলে মিনিট দশেকের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাচ্ছি। তারপর থেকে, অর্থাৎ ঘুমোবার ইচ্ছে থাকলেও আর ব্যাঙ্কের বেঞ্চে বসে ঘুমোবার উপায় নেই।

এই যাঃ, দেখছো রাঙা বৌদি, কি আশাভুলো তোমার এই দেবরটি? ভানতে বসেছিল ধান, গাইতে শুরু করে দিয়েছে শিবের গীত। আচ্ছা বলতো রাঙা বৌদি, তুমি ছাড়া আর কারও কাছে এরকম আবোল তাবোল বকলে কি কেউ সহ্য করবে? পাগল বলবে না?

হ্যাঁ রাঙা বৌদি, আজকে আমার পরিচয় প্রায় ঐ রকমই। সামনা-সামনি যদিও কেউ এখনও ঐ বিশেষণটি দিয়ে ভূষিত করেনি, তবুও কানা-ঘুষোয় যা কানে আসছে তাতে এখনও পর্যন্ত পাগল না হলেও আমায় খুব শীঘ্র এই পৃথিবীটা পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

তুমি তো জানো রাঙা বৌদি, পিতৃমাতৃহারা বলে আমি একটু সেন্টিমেন্টাল, আর এই মেন্টালিটিটা গড়ে উঠেছে ভালোবাসাকে নিয়ে। বুঝলে না বোধ হয়। হ্যাঁ রাঙা বৌদি, খুব পরিষ্কার করেই বলছি শোন। তোমার এই দেবরটি ভালোবাসার ভিখারী, যেখানেই ভালোবাসা সেখানেই তার ঝুলিটা এগিয়ে দেয়। আমার এ অবস্থার জন্য আজকে মনে মনে কিন্তু তোমাকেও দোষ দিই কখনও কখনও। মনে মনে দোষ দিলেও সামনে কিছুই বলতে মন চায় না। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মনে হয়, কতক্ষণে তুমি দক্ষিণ হস্তের তিনটি আঙুল দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করে স্নেহ চুম্বনের আওয়াজ তুলবে, সেই আঙুলগুলোকে নিজের অধরে ও ওষ্ঠে ঠেকিয়ে! হ্যাঁ রাঙা-বৌদি, সত্যি বলছি, এখানে এতদূরে বসেও মাঝে মাঝে যেন তোমার ছোঁওয়া পাই আমার চিবুকে। বুঝতে পারছ তো কত কাঙাল আমি।

এবার বলি শোন তোমাদের প্রশ্রয়ে আমার এই কাঙালপনা ধীরে ধীরে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

তুমি তো জানোই রাঙা বৌদি, আমি ছোটবেলা থেকে কত পাকা! দু'বছর কলেজে পড়তে না পড়তেই প্রেম করতে আরম্ভ করলাম, হ্যাঁ লুকিয়ে লুকিয়েই, কারণ, বাড়িতে চতুর্দিকে যে দারুণ পাহারা। তার উপরে বাপের একটি ছেলে বলে বিয়ের বাজারেও আমার দাম কম ছিল না, কারণ দেশে বাপের সম্পত্তি, কলকাতায় ব্যবসা, লেখাপড়াও শিখছি। তাই হয়তো অভিভাবকদের মনের কোণে শিবরাত্রির সলতের মতো সব সময়ই দপ দপ করতাম। কিন্তু এত নজর সত্ত্বেও প্রেম করলাম। নাঃ চুটিয়ে নয়, লুকিয়ে। তিন চার বছর নাকি প্রেম করেছিলাম আমরা। হ্যাঁ আমি ও সে। সে অর্থাৎ অনু, কিন্তু মজা কী জানো বৌদি! কবে যে শুরু করলাম আর কবে যে শেষ করলাম কিছুই বুঝলাম না। আঠারোয় শুরু বাইশে সারা। বুঝতেই পারছ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তখন ঘামবার বয়স আমার, কারণ আজকের দিনের অতি সাম্প্রতিক প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো আমাদের সপ্রতিভ সাহস হয়নি তখনও।

আমার থেকে মেয়েটির আগ্রহই যেন বেশী ছিল। তার যে কী ভালো লেগেছিল আমাকে আজকে তা বলা সম্ভব নয়। আজ, তখনকার সব কিছুই প্রায় স্মৃতির বালুকণায় চাপা পড়ে আছে। ক্ষোভের ঝড় দিয়ে বালুকণাগুলোকে উড়িয়ে দিলে পুরানো ব্যথা বড্ড কষ্ট দেবে আমায়, তাই সবটা বলতে না পারলেও ঘটনাটা মোটামুটি জেনে রাখো।

আমি স্কুলে ভালো ছেলে ছিলাম। কিন্তু কলেজে এসে বখে গেলাম। কেন জানো? আজও কেউ জানে না, আজ তোমায় চুপি চুপি বলি শোন, আমার বখে যাওয়ার কারণ হল ঐ অনু। সাধারণ কথায় বখে যাওয়া বলতে যা বোঝায় আমি কিন্তু সেরকম বখে কোনোদিনই যাইনি।

ছাত্র হিসেবে অসাধারণ না হলেও বুদ্ধি ছিল, তাই নিজস্ব সত্ত্বা আমি কোনোদিনই হারাইনি সম্পূর্ণভাবে; অবশ্য যদিও মাঝে মধ্যে অনুকে দেখে নিজেকে হারাতাম। অনু থাকত আমাদের বাড়ির তেতলার ফ্ল্যাটে। আর আমি থাকতাম দোতলায়। ওরা ভাড়া দিত আটচল্লিশ, আমরা ষাট। আমি কলেজে ও স্কুলে।

আমি আঁকতে পারতাম ভালো, দুপুরে প্রায়ই খাতা নিয়ে আসত আর ফরমাস করত এটা ওটা এঁকে দিতে। পড়ত আমারই ছোট বোনের সঙ্গে একই স্কুলে। ও দু-ক্লাস উঁচুতে, আর আমার বোন সেভেনে।

ওর বাবার ব্যবসা ছিল স্টেশনারী, আমার বাবার কাপড়ের। দুপুরে মা ঘরে শুয়ে যখন বিশ্রাম নিতেন ও ঠিক তখনই একটা সুযোগ বুঝে একটা অজুহাত দিয়ে নীচে দোতলায় এসে আমার ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকে, কোনোদিন পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরত, কোনোদিন মুখে লজেন্স ভরে দিত আর তারপর এটা

ওটা আঁকার ফরমাশ! জানো রাঙা বৌদি, অনুটা এত পাজী ছিল, আমাকে দিয়ে আসন বোনা চটে ফুল পর্যন্ত আঁকিয়ে নিয়েছে। দিনের পর দিন ওর সব আবদার সহ্য করেছি আর তার বদলে কী পেয়েছি তা তো দেখতেই পাচ্ছো। হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমি ওর খাতায় আঁকতাম আর ও এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, যখনই খাতা থেকে মুখ তুলে ওর দিকে চাইতে যেতাম দেখতাম ও আগে থেকেই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমি কিন্তু ওর মুখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারতাম না, হয়তো স্বাভাবিক লজ্জাতেই।

হ্যাঁ রাঙা বৌদি, এখানে বলে রাখি আজ কিন্তু আর তোমার এই নষ্ট দেবরটির লজ্জা শরম কিছুই নেই। আজকে হলে অনায়াসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো। বুঝতে পারছো তো, কত অসভ্য হয়েছি? এই রকম করেই দিন চলছিল। হঠাৎ এক ফাল্গুণী পূর্ণিমার দিনে ওদের তেতলায় কেউ নেই আর আমরাও দোতলায় কেউ নেই। সকাল থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে রং খেলে এসে স্নান-টান সেরে ঘরে ঢুকে কাপড় বদলিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি লাল-টকটকে চওড়া পাড় সাদা জমি একখানা সিল্কের শাড়ি পরে ও এসে আস্তে আস্তে আমার ঘরে ঢুকল। আমার চুলের উপর চিরুনী চালানো বন্ধ হয়ে গেল। পিছন দিকে না ফিরে আয়নার মধ্যেই ওকে দেখতে লাগলাম।

ও ততক্ষণে ঠিক আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নির্বাক হতভম্ব। ওকে এতদিন ফ্রক পরা এবং স্কুলের স্কার্ট ব্লাউজ পরা অবস্থাতেই দেখেছি, কিন্তু আজ একি! এ যেন এক পরম বিস্ময় আমার সামনে দাঁড়িয়ে! একে কে আজ এমন করে সাজাল! তবে কি ও নিজেই!

আমি যখন এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি ও তখন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল, "একবার ঘুরুন।" ওর কথায় যন্ত্র চালিতের মতো ঘুরে দাঁড়ালাম আর ও আঁচলের তলা থেকে খানিকটা অভ্রচুর মিশ্রিত সুগন্ধি আতরযুক্ত আবীর আমার দু-পায়ে ঢেলে দিয়ে প্রণাম করল। ঐখানে পায়ের কাছে নীচু হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখে মৃদু হাসি টেনে প্রশ্ন করল, "কী বলে আশীর্বাদ করলেন?"

রাঙা বৌদি আমি তখন বি. এস. সি. পড়ছি, উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়েছি। আর ও তখন পনেরো পেরিয়ে যোলোয় পড়েছে। ও এমনিতেই দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তার উপর ঐ লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে গলায় আঁচল দেওয়া অবস্থায় দেখে আমার মতো ফুটন্ত তরুণের মনে কী আশীর্বাদের কথা আসতে পারে বলতো? আসলে আশীর্বাদ করবো কি। আমি তখন প্রাণপণ আবেগে নিজেকে সামলাচ্ছি, কারণ সম্মুখে জলন্ত প্রদীপ শিখা আর আমি পক্ষোন্মোচিত পতঙ্গ।

নীচু হয়ে ওর দুটি বাহু ধরে দাঁড় করালাম। সেই অবস্থাতেই ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এইভাবে বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর ও হেসে ফেলে ঘাড় নীচু করে বলে উঠল, "কী দেখছেন অমন করে?" যেই বলা

অমনি চমকে উঠে হাত দুটো ছেড়ে দিতেই, "চুলগুলো আঁচড়ে নিন," বলে এক দৌড়ে তেতলায় পালিয়ে গেল।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো চুল আঁচড়ানোটা বাকিই রয়ে গেছে, এবং ডান হাতের আঙুলে তখনও চিরুণীখানা ধরা। তাড়াতাড়ি আবার আয়নার সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিলাম এবং ঘরের একপাশে খাটের উপর বিছানায় শুয়ে পড়লাম হাতে একটা মাসিক পত্রিকা টেনে নিয়ে। পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতেই দেখি লাল পাড় শাড়ি আর গলায় আঁচল জড়ানো একখানা সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

বইটাকে বুকের উপর রেখে চুপ করে শুয়ে ভাবতে লাগলাম তার কথা। এতদিন অনুই হাঁ করে আমাকে দেখত, আর আমি লজ্জা পেতাম, আর আজ কেন বারবার আমারই অনুকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ও চলে গেলে এখন এই বিচিত্র এক ব্যথার অনুভূতি কেন জাগছে, ছিঃ ছিঃ কী অন্যায়ই না করে ফেললাম হাঁ করে অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার হাত দুটো ধরে তুলে, হয়তো অনু কত কীই না ভাবছে আমার সম্বন্ধে।

বিছানায় শুয়ে এই সব যখন ভাবছি তখন ওদিকে অনু আবার আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে কখন যে আমার ঘরে ঢুকেছে বুঝতেই পারিনি। বুঝতে পারলুম তখন যখন একটা রসগোল্লা হঠাৎ আমার দুটো ঠোঁটের মাঝখানে এসে ঠেকল। তাড়াতাড়ি উঠতে যাব, অনুই আমার মাথাটা টিপে ধরে ফের শুইয়ে দিল এবং পরপর গোটা চারেক রসগোল্লা আমার মুখের ভিতর চালান করে দিল। বন্ধুদের সাথে হোলী খেলতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের মিষ্টি খেয়ে পেটটা এমনিতেই তখন জয়ঢাক হয়ে আছে, তবু কিন্তু কেন যেন না করতে পারলাম না। এবার জলের গেলাস এগিয়ে আসতেই উঠতে হল। উঠে বসে একটু জল পান করে অনুর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করতেই, "দাঁড়ান আসছি বলে অনু আবার বের হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখি আবার এসে ঢুকল, এবার কিন্তু পরনে সেই সিল্কের শাড়িটা ছিল না, বুঝলাম শাড়ি বদলে এসেছে!

তুমি তো বুঝতেই পারছ বৌদি, তখন আমার ভিতরকার আমিটার কী অবস্থা চলছে। বিদেশ বিভুঁইয়ে অপরিচিতজনের মাঝখানে হঠাৎ কোনো পরিচিত লোককে আবিষ্কার করতে পারার যে আনন্দ, আমার মধ্যে যেন তখন সেই আনন্দ। অনুকে এতদিন দেখে এসেছি যে চোখ দুটো দিয়ে অতি সাধারণ ভাবে, আজ সেই সাধারণ চোখ দুটো গেল কোথায়! আজ যেন কেন ওকে অতি অসাধারণ লাগছে, কেন যেন আজ বার বার মনে হচ্ছে অনু, অনু ছাড়াও অন্য এক সত্ত্বা, অনু এক নারী-সত্ত্বা। আর আমি! আমি যে তখনকার মতো কী নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি তা, তোমায় বোঝাব কী করে এই এতদিন পরে।

অনু আবার ঘরে ঢুকে সোজা আমার খাটের ধারে এসে দাঁড়াতেই বললাম,

"উঠে বস", সে বসল, কিন্তু আমি তার মুখের দিকে সোজাসুজি চাইতে পারছিলাম না।

হঠাৎ অনু প্রশ্ন করল, "ভাত খেলেন না?" জানো রাঙা বৌদি, অনুর এই কথায় মুখ থেকে প্রায় বেরিয়েই এসেছিল যে, "অনু আজ আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব মিটে গেছে। হ্যাঁ শুধু তোমাকে দেখেই মিটে গেছে।" কিন্তু বলতে পারলাম না। বুঝলাম, এই না-বলতে পারার পিছনে আমার সহজাত লজ্জা। মুখে বললাম, "খিদে নেই।" আমাকে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব তখন লোপ পেয়ে গেছে। আমি যেন তখন অন্য এক জগতে অর্থাৎ দ্বিতীয় জগতে অর্থাৎ প্রেমের জগতের মদির সুবাসে মাতোয়ারা।

আমার পাশে পড়ে থাকা সেই মাসিক পত্রিকাটা নিয়ে অনু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পাতা ওল্টাচ্ছিল। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, "লুডো খেলবেন? লুডো নিয়ে আসব?"

আমি কিছু বলবার আগেই ও উঠে গিয়ে আলমারীর ভিতরে রাখা লুডো ছক ও ঘুঁটিগুলো নিয়ে এল। আমার ঘরে কোথায় কী থাকে ওর সবই প্রায় মুখস্ত থাকত! আমার পেন্সিল হারালে, আমার পেন হারালে ও অনেক সময়েই খুঁজে বের করে ফেলত। তখন আমি ভাবতাম ইচ্ছা করে দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রাখে। এখন এই এতদিন পরে বুঝতে শিখেছি কী করে ও খুঁজে বার করত। আসলে আমার বা আমার কোনো জিনিস সম্বন্ধে ওর আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাই ও খুঁজে ঠিক বের করে ফেলত আর আমি আসলে খোঁজার মতো করে খুঁজতামই না।

যাই হোক সেদিন সেই দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত লুডো খেলে ও আবোল তাবোল গল্প যথা- ওর স্কুলের গল্প, আমার কলেজের গল্প ইত্যাদি নিয়ে বেশ কেটে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হতেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ জুড়ে আন্দোলন জাগিয়ে দিল। আমার ঘরটা ছিল পূর্ব-দুয়ারী, তাই সন্ধ্যাতেই চাঁদের আলো এসে আমার ঘরের মেঝেতে লুটোপুটি করছিল। এর মধ্যেই অনু এক কাপ চা করে খাইয়ে গেছে।

তুমি তো জানোই রাঙা বৌদি, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ-বর্ণ, আকাশের মেঘ-বৃষ্টি, পাখির ডাক, এরা আমার মনে শিহরণ জাগায়। আর এর জন্য তোমাদের কত ঠাট্টাই না শুনতে হয় আমায়।

চাঁদের আলোটা মেঝেতে যখন বেশ ফুটে উঠেছে তখন আর ঘরে থাকতে পারলাম না। তাছাড়া অনুও বহুক্ষণ হ'ল উপরে উঠে গেছে, কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছিলাম না, তাই নীচের ঘর বন্ধ করে তিন-তলায় উঠে গেলাম। সোজা ছাদে গিয়ে ঢালু ছাদের মুখে বসে আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছি, এমন সময় কার যেন কচি কচি আঙুল এসে আমার চোখ দুটো টিপে ধরল। আস্তে আস্তে হাত তুলে তার কব্জির কাছে হাত বুলিয়ে না চিনতে পারার ভান করে বললাম, "কে আপনি চিনতে পারছি না, বলুন না কে আপনি!"

সে তাড়াতাড়ি আমার চোখ ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল, "এমা, কী অসভ্য,

আমাকে 'আপনি', 'বলুন' এসব আবার কী বলা হচ্ছে। দেব এক্ষুণি মাথায় এক কিল বসিয়ে!" এই বলে সে কাঁধে রাখা ভিজে শাড়ি মেলে দিতে গেল ছাদের আলসের ধারে। বুঝলাম সে এতক্ষণ বাথরুমে ছিল এবং স্নান করছিল।

শাড়ি মেলে দিয়ে সে এসে আমার পাশে, প্রায় গা ঘেঁসেই বসে পড়ল। আমি তটস্থ হয়ে প্রায় ফুটখানেক দূরত্ব বজায় রেখে সরে বসলাম। এর পর দুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাঝে মাঝে ফাগুয়ার দিনের পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের দিকে চাই আর কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে চাই। মিথ্যে বলব না বৌদি, আমার মনে সেদিন কিন্তু চাঁদের থেকে ওই-ই বেশী সাড়া জাগিয়েছিল। কেন যে এমন হয়েছিল তা আজ বুঝতে শিখেছি, কিন্তু তখন না বুঝে শুধু বিস্ময়ই মেনেছিলাম।

অনুও মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, জানিনা কী ভেবে ঝট্ করে তার ডান হাতটা দিয়ে আমার বাঁ হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে মুখটা নীচু করে সেই হাতদুটোর উপর রেখেই লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে যেতেই আমার শরীর আধখানা হয়ে গিয়েছিল। ফাল্গুনের দখিনা বাতাসেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছিল। এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই ও চমকে উঠে দরজা খুলে দিতে গেল আর আমি পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলাম। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম ওর মা, দিদি সবাই বাড়ি ফিরলেন। ওঁরা নাকি গিয়েছিলেন ওর মাসির বাড়ি আদিসপ্তগ্রামে গতকাল সন্ধ্যায়।

তোমার মনে নিশ্চয়ই হাজার প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠেছে, এরপর কী হল জানবার জন্য? এবপর আর কিছুই হয়নি। সেদিনের সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতের ঐটুকু পাওয়াই আমার জীবনে অনুর কাছ থেকে চরম পাওয়া। হ্যাঁ বৌদি, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অনুর কাছ থেকে আর কোনোদিন কিছুই পাইনি, আর আমার কাছ থেকে অনু তো নয়ই।

তবে ব্যাপারটা বলি শোন, আসলে সেদিন ওর মা, বাবা, দিদি সকলে মিলে আদিসপ্তগ্রামে যাবার অছিলায় গিয়েছিলেন ওদের ভদ্রেশ্বরের বাড়িতে। ওখানে ওদের একটা বাড়ি ছিল, অবশ্য ভাড়া দেওয়া। সেই ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ওর বাবা বাড়িটা খালি করবার ব্যবস্থা করেছিলেন নাকি অনেকদিন থেকেই। একথা অবশ্য শুনেছি ওর বড় বোন বৈশালীর কাছ থেকে। ঐ মেয়েটি অর্থাৎ বৈশালী, বোধহয় যে কোনও স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে আমায় দেখে থাকবে, তাই মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে ওর কাছ থেকে নানারকম প্রেজেন্টেশন পেতাম এবং কিছু না ভেবেই সেগুলো সাতিশয় আনন্দে গ্রহণ করে আসছিলাম, সেই বৈশালী একদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে একেবারে দরজায় ছিট্‌কিনি তুলে দিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় কান্নাভেজা সুরে বলে উঠল, "বিধুদা আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।" দরজা আটকানো এবং ছিটকিনি তোলার শব্দে প্রথমটায় চমকে

গেলেও কথাটায় অর্থাৎ চলে যাওয়ার কথাটায় আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। আমি হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে আছি, হঠাৎ সে দৌড়ে এসে আমার কোলে মুখটা গুঁজে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি হতভম্বের মতো বসে বসে তার কান্নার প্রত্যুত্তরে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কাটাবার পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, "দরজাটা খুলে দাও!" যদিও আমার বাড়িতে তখন কেউ ছিলেন না, কারণ পূজার সময় আমাদের গ্রামের বাড়িতে সকলে যেতেন এবং একেবারে লক্ষ্মীপূজার পর ফিরতেন, আর আমায় দোকান খোলবার জন্য নবমীর দিনই বিকেলে কিংবা বিজয়া দশমীর দিন খুব ভোরে উঠে চলে আসতে হত।

আমার কথা শুনে সে বলল, "উপরে অনু ছাড়া আর কেউ নেই, সবাই সিনেমায় গেছে।" এবার সে চোখ মুছে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। তার এবারের কান্না যেন বাঁধ-ভাঙা বন্যার জলের মতো। তার দুচোখের উত্তপ্ত লবণাক্ত জল আমার হৃদয়েও যেন এক নৈসর্গিক স্নেহের উত্তাপ ভরে দিল। তখন মনে মনে বুঝেছিলাম এতদিন এই একই বাড়িতে নিজের লোকের মতো বাস করার পর ছেড়ে চলে যাবার সময় বোধহয় এ অশ্রু ঝরেই, কিন্তু পরে বুঝেছি অন্যরকম। যখন বিদায়ের সময় এল তখন প্রণাম করে আমায়, "তুমি পাষাণ, তুমি পাষাণ," বলেই আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাড়াতাড়ি আমার চোখের আড়ালে চলে গেল কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। তখন না বুঝলেও এখন বেশ বুঝি, সেদিনের ঘরের দরজায় ছিটকিনি তুলে কান্নার কী কারণ, আর যাবাব সময়, "তুমি পাষাণ, তুমি পাষাণ," বলারই বা কী কারণ ছিল। সত্যি তখন অনুর কাছে ছাড়া আর সবারই কাছে আমি পাষাণই ছিলাম।

অনুও বিদায় নিতে এসে কেঁদে ফেলল এবং বলল, "দিদি নীচে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাকে ডাকছে।" ধীরে ধীরে নীচে গেলাম, নীচে যেতেই এক টুকরো কাগজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বৈশালী বলল, "এতে বাড়ির ঠিকানা রইল, যাবে তো?"

ব্যস্ এইটুকু, মালপত্র তো আগেই চলে গিয়েছিল, এবার ওরা গিয়ে ট্যাক্সিতে বসল। একটুখানি আওয়াজ, গাড়ির চাবি ঘোরানোর শব্দ, একটু ধুলো, একটু ধোঁয়া তারপর ট্যাক্সিটা ছোট হতে হতে দূরে ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ বৌদি, এমনি করেই অনু আমার জীবন থেকে মিলিয়ে গেল, সে কিন্তু মিলিয়ে যেতে চায়নি, আমিই তাকে মিলিয়ে যেতে দিয়েছি।

বৈশালী যেতে বললেও আমি যেতে পারিনি. কারণ ওর বাবা, মা, দাদা কেউই আমায় যেতে বলেননি আর তাছাড়া পরে শুনেছি আমার জন্যেই নাকি ওঁদের চলে যেতে হয়েছে। তাহলে তোমাকে খুলেই বলি ব্যাপারটা।

আমি যখন বি.এস.সি পড়ি তখনই ঐ বাড়িটা যেটায় আমরা ভাড়া থাকতাম সেটা আমার বাবা কিনে নিয়েছেন। তারই ফলে অন্যান্য ভাড়াটেদের কিছুটা ঈর্ষার পাত্র হতে হয়েছিল বাবাকে, অবশ্য যদিও আমার বাবা অত্যন্ত উদার এবং সহৃদয় স্বভাবের লোক ছিলেন। বুঝতেই পারছো রাঙা বৌদি আমাদের বাঙালিদের সহজাত পরশ্রী-কাতরতা এক্ষেত্রে কতখানি কাজ করেছে।

হ্যাঁ বৌদি, পরে সব শুনেছি, আমাদের বাড়িরই তিনতলার আর এক ভাড়াটিয়া সত্যহরি ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতি সুভদ্রা ঘোষের কাছে। ঐ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নিঃসন্তান ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আমাকে দারুণ স্নেহ করতেন। ভদ্রলোককে আমি দাদু এবং ভদ্রমহিলাকে দিদিমা বলতাম। ঐ দিদিমা আমায় পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। তাই আমার ভালোমন্দের দিকে তাঁরও খানিকটা দুর্বলতা ছিল। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনুরা চলে যাবার পর আমার মানসিক ভারসাম্য কতখানি ব্যাহত হচ্ছিল। তাই এক নির্জন দুপুরে শীতের রোদ পিঠে করে তিনি আমায় সব খুলে বললেন।

তিনি যা বললেন তার অর্থ হল, অনুর ও আমার ব্যাপারটা বাড়ির প্রায় সকলেরই নজরে পড়েছিল। আমরা না বুঝলেও বয়স্কদের বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয়নি। তাঁরা নাকি ক্ষণে-ক্ষণে, কারণে-অকারণে আমাদের দুজনেব চোখমুখেব রং বদলে যেতে লক্ষ্য করতেন আর ঐটুকু নিরীক্ষণ করেই গুরুজনেবা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা চলছে।

হ্যাঁ বৌদি, দিদিমার কথায় তখন ঠিক বিশ্বাস না করলেও এখন বেশ বুঝতে পারি ওরকম হলে মানুষের চোখমুখের রং সত্যিই ঘন ঘন বদলে যায়।

ব্যাপারটা যখন ধরাই পড়ে গেল, তখন অনুর বাবা মা'র তরফ থেকে তাকে বোঝানো হল, আমার কীইবা আছে? না আছে সুন্দর সুঠাম চেহারা, না আছে চিত্ত-বিমোহন বিত্ত, অর্থাৎ গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি কিছুই তো আমার নেই। বাপ একটা বাড়ি কিনেছেন তাও আমার বিমাতার নামে। সুতরাং আমার থেকে অনেক যোগ্য পাত্র কলকাতায় তথা বাংলাদেশের পথেঘাটে ছড়ানো রয়েছে। অতএব অনুকে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হল, শুধু বলাই হল না, মাঝে মধ্যে তার উপর খুচরো নির্যাতন শুরু হল।

একথাগুলো যখন জেনেছি তখন অনু আমার থেকে অনেক দূরে, নাগালের প্রায় বাইরে বললেই চলে। এর মধ্যে তারও স্কুল ছাড়ান হয়েছে এবং প্রায় গৃহবন্দী অবস্থা চলছে। কিছুই জানতাম না এক বাড়িতে থেকেও। আমার কাছ থেকে রক্ষা করবার এবং তার মা-বাবার মান-ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যেই নাকি তাকে নিয়ে দূরে সরে যেতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে কিন্তু জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। জল গড়িয়ে গড়িয়ে আমার বুকের অববাহিকায় যখন প্রায় খাল হয়ে এসেছে তখন সদ্য কেনা আমাদের কারখানায়

বসে হঠাৎ আমার বন্ধু শ্যামলের টেলিফোনে জানতে পারলাম অনু নাকি কলকাতায় এসেছে এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মতো টেলিফোন ছেড়ে উঠে ট্যাক্সি নিয়ে শ্যামল ও আমি দৌড় দিলাম পূর্ব নির্ধারিত স্থান· অর্থাৎ হাজরা পার্কের বাস স্ট্যান্ডে।

জানো রাঙা বৌদি, কলকাতা তখনও কিন্তু এত অভব্য হয়নি। তাই ঐ দুপুরের রৌদ্রের মধ্যে ঐ বাস স্ট্যান্ডে তিন চারজন প্রাণী ছাড়া আর কোনো সুরসিকের দেখা মেলেনি, যেমন আজকাল যত্রতত্র দেখা মেলে, সেই সব ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাদের, যারা বাসে উঠবার অছিলা নিয়ে শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে এবং একাকীত্বের অবসর বিনোদনের সময় চর্বিত চর্বনের নিমিত্ত স্থূল মানসিক খোরাক জোগাড় করে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছেই দেখি শুধু অনু নয়, সঙ্গে আছে ওর দিদি বৈশালী আর ওর মামাতো দিদি বন্যা, বন্যার হাতে একটা ছোট চামড়ার সুটকেস, মনে হল নতুন কেনা। সামান্য টুকিটাকি কুশল বিনিময়ের পর বৈশালী বলল, "কথা আছে।" শ্যামলের অনুরোধেই তখন 'বসুশ্রী রেষ্টুরেন্টে' ঢুকে একটা কেবিনের মধ্যে সবাই বসলাম। চারখানা চেয়ার ছিল। রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজার শ্যামলের চেনা লোক ছিলেন। শ্যামল গিয়ে বলতেই আর একখানা চেয়ার দিয়ে গেল বেয়ারা এবং সবাই বসলাম।

বিশ্বাস কর রাঙা বৌদি, এতক্ষণ অনুর মুখের দিকে ভালো করে চাইতেই পারিনি, এবার চাইলাম এবং দেখলাম সেখানে বর্ষণক্লান্ত বৈশাখী মেঘের ভীড়, সে যেন হিম গিরিমালায় শ্রাবণী মেঘের ঘনঘটা। মুখ খুলে প্রশ্ন করলাম, "তোমার কী হয়েছে?"

অনুর জবাব দেবার আগেই বৈশালী বন্যার হাতের সুটকেশটা নিয়ে খট্‌খট্ করে তার ক্লিপগুলো খুলে ফেলল এবং ঢাকনা তুলল। সুটকেসের ঢাকনা খুলতেই হঠাৎ যেন আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বৈশালীর হাতের স্পর্শে ঝংকার দিয়ে উঠল একগাদা ঝক্‌ঝকে সোনার গয়না এবং তার সঙ্গে উঁকি দিয়ে উঠল একশ টাকা নোটের দুটো বান্ডিল। এরপর আর কিছু না বলে একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণের কার্ড হাতে ধরিয়ে দিল। ভাবলাম বুঝি বৈশালীর বিয়ে তাই আগ্রহ সহকারে কার্ড পড়তে লাগলাম। কিন্তু কার্ডটা পড়তে পড়তে আমার সমস্ত আগ্রহ যেন চুপ্‌সে গেল, গনগনে কয়লার আগুনে কে যেন এক পীপে জল ঢেলে দিয়ে গেল।

ওরা যা বলল, তার অর্থ হল অনু একবারেই বেঁকে বসেছিল তাই আরও সাত তাড়াতাড়ি করে এই ব্যবস্থা করেছেন বাবা-মা। কিন্তু ওরাও এতে রাজী নয় তাই অনুকে নিয়ে চলে এসেছে। পরের দিনই বিয়ে, তাই আর সময় নেই মোটেই। কিছু টুকিটাকি বাজার করবার অছিলায় ওরা কলকাতায় এসেছে।

বন্যা বলল, "অনুকে নিয়ে পালান, না হলে অনুকে হারাবেন।" বৈশালী বলল, "এই সুটকেশটাতে যা আছে তাতে করে তোমাদের বেশ কয়েকটা বছর কেটে যাবে।"

বৈশালীর একথায় বজ্রাহতের মতো চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রশ্ন করলাম, "তার মানে?" বৈশালী বলল, "এগুলো অনুর জন্যেই তৈরি করানো হয়েছিল এবং আমার কাছে রাখা ছিল। এতে মোট সত্তর ভরি সোনার গয়না এবং নগদ কুড়ি হাজার টাকা আছে।"

আমি বললাম, "নিতে হলে শুধু অনুকেই নিতে পারি, আর কিছুই নয়।" আমার কথায় ওরা বেশ খুশী হল না এবং বারবার ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। এমনকি বন্ধু শ্যামলও ওদের দলে ভিড়ে আমাকে ওগুলো গ্রহণ করবার জন্য অনুনয় করতে লাগল। ওরা যা বলতে লাগল তার অর্থ ওগুলো তো অনুর জন্যই রাখা ছিল তাই অনুকেই দেওয়া হচ্ছে, এতে কিন্তু করবার কী আছে?

জানো রাঙা বৌদি, ওরা যতই ও কথা বলুক, আমার মনে তখন অন্য জিনিস ঘুরছে। তুমি তো জানোই আমি চিরকালই নির্লোভ এবং অতি সাধারণ, তাই ঐ কথায় আমার মনে হতে লাগল সমস্ত বিশ্বের কাছে আমি আমার অনুকে ছোট করে দেখাব, আর তার সাথে তার দিদিকেও? দিদি আমায় কী চোখে দেখেছেন জানি না কিন্তু আমি যাকে ভগ্নীসমা বলে ভেবে এসেছি এতদিন তাকে ছোট করব!

আমার মাথায় তখন অনুর চিন্তার থেকে অন্য চিন্তা বড় হয়ে উঠল, কেবল মনে হতে লাগল পৃথিবী সুদ্ধু সবাই আমার দিকে ও অনুর দিকে চেয়ে বলছে, "চোর, চোর, চোর, ঠগ্, ঠগ্, ঠগ্......" আমি আর ভাবতে পারিছলাম না। তাই মাথাটা ধরে আবার চেয়ারে বসে পড়লাম এবং হাতদুটো ভাঁজ করে মুখটা গুঁজে দিয়েছিলাম। সেই ভাঁজের ভিতর, বোধহয় সামলাতে না পেরে একটু কেঁদেও ফেলেছিলাম।

টেবিলের উপর শ্যামলের অর্ডার অনুযায়ী বেয়ারা চিকেন কারী, টোষ্ট ও চা দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর দিকে নজর দেবার মতো মনের অবস্থা কারোরই ছিল না।

হঠাৎ বৈশালী উঠে বলল, "আমরা তবে যাই।" তার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার মুখ তুললাম। আমি আর কিছুই ভাবতে পারছিলাম না তখন, তাই ওরা তিনজনে মিলে বসে যুক্তি করে কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে দিশেহারা হয়ে বন্যা আবার বলল, "আমরা এবার যাই?"

এবার আমি বললাম, "আজকের দিনটা সময় দাও আমায় তোমরা"। আমার কথা শুনে বৈশালী একটা তীব্র হাসি দিয়ে ভর্ৎসনা করল, বলল, "এখনও সময়?" আমি বললাম, হ্যাঁ নিজেকে একটু ঠিক করে নিতে শুধু আজকের রাতটা সময় চাইছি। আগামীকাল বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ শ্যামল ও আমি একটা গাড়ি নিয়ে ভদ্রেশ্বরের জি.টি. রোডে তোমাদের বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়াব। ঐ সময়ে যেন অনু চলে আসে।"

হ্যাঁ বৌদি, প্ল্যান হয়েছিল ঐভাবেই। শ্যামলই জায়গা দেবে বলেছিল আমাদের

বেশ কিছুদিনের জন্য, কারণ আমিও জানতাম যে আমার বাবা এই অসম বিবাহে মোটেই সম্মতি দিতেন না।

বন্যা যাবার সময় আবার বলল, "ঐ গয়না কখানা আর টাকাটা নিলে নাকি তার পিসেমশাইয়ের কোনো ক্ষতিই হবে না, তাঁর নাকি অনেক আছে। একথা বন্যা কেন বলতে পেরেছিল জানো বৌদি? তখনও সংসারের বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র সম্বন্ধে বন্যার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না।

ঐ গহনা এবং টাকা নিলে যে তার পিসেমশাইয়ের মতো লোক থানা পুলিশ পর্যন্ত করতে পারেন এবং তার ফলে যে কতখানি তলার পাঁক উঠতে পারে সে জ্ঞান হবার মতো বয়স তখনও বন্যার হয়নি, কিন্তু আমার চোখ তখন আগেই ফুটেছিল, হ্যাঁ, অনুই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম যখন আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা ধরা পড়ে তখনই ওকে বাড়ি ছাড়া করে বছর খানেকের জন্য দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার একটি বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দিয়েছিল ওর বাড়ির লোকেরা। আমিও তখন নদীয়া জেলার কাছে কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে আমার এক ধনী আত্মীয়ের কারখানায় সিকি অংশের মালিক হয়ে কর্মভার গ্রহণ করেছি। অবশ্য এক বছরের মধ্যেই ঐ ধনী ব্যক্তিটির কাছ থেকে কারণে-অকারণে বিভিন্ন গ্লানিকর ব্যবহার পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে আমি চলে আসতে বাধ্য হই। তুমি তো জানোই বৌদি, আমার মর্যাদাবোধ এবং অভিমান বড্ড বেশি। রেগে গেলে ওঁরা যে কী বলতেন তা বোধহয় ওঁরা আদৌ ভেবে বলতেন না। আর আমাকে ছেড়ে কথায় কথায় প্রায়ই আমার বাপ তোলাটা আমিও সহ্য করতে পারতাম না, তাই পালিয়ে এসেছিলাম। পরে শুনেছি আমার বাবার সহযোগিতাতেই নাকি ওঁরা কলকাতার মুখ দেখেছিলেন। যাক্ ও সমস্ত কথা লিখতে গেলে ঐ নিয়েই একখানা বই হয়ে যাবে।

ঐ কারখানাতেই আমার কাছে প্রায়ই অনুর চিঠি আসত এবং সেই সমস্ত চিঠি পড়ে ধীরে ধীরে পৃথিবী সম্বন্ধে আমার অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মনে হত, ও এত জানল কী করে? হয়তো ওর বয়স কম কিন্তু ব্রেন ম্যাচিওরড্ ছিল তাই।

যাই হোক- বসুশ্রী রেস্টুরেন্ট থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে ওদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার শরীরে যেন কিছুই নেই। মনে হচ্ছিল আমি যেন তিনমাস টাইফয়েডে ভুগে উঠেছি। সেদিন সন্ধ্যাটা এবং রাতটা যে কী যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তা কি তোমায় বলতে হবে রাঙা বৌদি?

পরের দিন অর্থাৎ অনুর বিয়ের দিন সকাল থেকেই মনের জোর নিয়ে সংকল্পে স্থির হয়ে আছি, কারণ আগের দিন সারারাত ভেবে এটা বেশ বুঝতে পেরেছি একটু গাফিলতি করলে অনুকে চির জীবনের মতো হারাতে হবে, তাই সেদিন আর কারখানায় গেলাম না। বেলা যত বাড়তে লাগল আমার অন্তরের অস্থিরতা ততই

বাড়তে লাগল। কেবল মনে হতে লাগল আমি অনুকে চুরি করে আনতে যাব, তার বাবা-মার সম্মানের হানি ঘটিয়ে। পাঁচজন আত্মীয়স্বজনের সামনে অপদস্থ করে তাদের চোখের জল বইয়ে দিয়ে অনুকে চুরি করে আনব! এতে কি আমরা সুখী হব! এতে কি আমাদেরও অভিসম্পাৎ লাগবে না! তার চেয়ে যা হচ্ছে এই তো ভালো। অনুর দিদি তো বলেই গেল, যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ছেলেটির নাকি ফিল্মস্টারের মতো চেহারা, নিজের বিরাট ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি সবই আছে। অনুতো তাহলে সুখেই থাকবে, মিছিমিছি আমার জীবনের দুঃখের নীল চাঁদোয়ার তলায় অনুকে টেনে আনব!

বেলা কিন্তু বসে নেই। আমি উথাল-পাতাল চিন্তা করে চলেছি, ওদিকে বেলা যেন তার থেকেও দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। ঘড়িতে দু'টো বেজ গেল অথচ এতক্ষণ আমার ভদ্রেশ্বরে পৌঁছে যাবার কথা। শ্যামল হাওড়া স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে। জানো রাঙাবৌদি এরকম পরিস্থিতিতে যারা পড়েছে একমাত্র তারাই কেবল বুঝবে আমার মুখের চেহারাটা তখন কী রকম, আর বুকের ভিতরটায় কী হচ্ছিল।

আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে সূর্যের রং লাল হল। বৈশালী বলেছিল সন্ধ্যা লগ্নে আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বিয়ে শেষ হয়ে যাবে। চট্ করে ঘড়িটার দিকে চেয়ে নিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। এখনও সময় আছে। এখনও বড় বাজারে গিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে হয়তো ভদ্রেশ্বরে পৌঁছানো যায়। কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্তই।

আস্তে আস্তে সময় বয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো চিন্তায় চিন্তায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম হঠাৎ বাবার ঘরের ওয়াল ক্লকে ঢং ঢং করে আটটা বাজার শব্দ হতেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠল, কারা যেন আমার চারিদিকে দাঁড়িয়ে হো হো, হি হি করে হেসে বলতে লাগল, "পারলে না, পারলে না, তুমি হেরে গেলে। কাপুরুষ কোথাকার!" হ্যাঁ রাঙা বৌদি সেদিন সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে যাদের মুখ ভেসে উঠেছিল তাদের মধ্যে শ্যামল, বৈশালী, বন্যা ছাড়াও আমার আরও দু-চারজন হিতাকাঙ্ক্ষীর মুখ ভেসে উঠেছিল, বাইরে বাবার ভয়ে যারা কিছু বলত না কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমার যে কোনো কাজেতেই যাদের সায় ছিল। হ্যাঁ, রাঙাবৌদি, ওরা সবাই তখন আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলছেন "এই যে সেই বীরপুরুষ, এই যে সেই বীরপুরুষ!" জানো বৌদি, কি তীব্র ঘৃণা আর শ্লেষ তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল তখন।

ওদিকে আস্তে আস্তে ঐ মুখগুলো যখন আমার আকাশ-বাতাস আন্দোলিত করে দিয়ে গেল ঠিক তখনই আর একখানা শান্ত সুন্দর মুখশ্রী লাল চেলী পরে ওড়নার আড়াল থেকে বলতে শুরু করেছে যেন কত কথা — আমার যেন মনে হল সেই লাবণ্যময়ী হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠে বলে চলেছে, "দ্যাখ দ্যাখ, ওরা কেমন করে আমায় পিঁড়িতে বসিয়ে ঘোরাচ্ছে, দ্যাখ দ্যাখ আমার কেমন শুভদৃষ্টি হচ্ছে? দ্যাখ দ্যাখ আমার দক্ষিণ হাতটা আজ কার হাতের উপর?"

কে যে ঐ কথাগুলো বলছিল আমার কানের কাছে তা বুঝতে পারছিলাম না। অন্ধকারে বিছানায় একধারে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছিলাম কিন্তু তার ঐ শেষের কথাটায় অর্থাৎ, "কার হাত তার দক্ষিণ হাতের উপর," যেন আমার কানে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দিল, তীব্র আর্তনাদে "নাঃ নাঃ" বলে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটা পাজামা পরনে ছিল, আলনা ·থেকে একটা পাঞ্জাবি তুলে নিয়ে গায়ে গলিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লাম। মনে ঘুরতে লাগল আমার অনুর হাতে অন্য এক ছেলের হাত! হ্যাঁ রাঙাবৌদি, তুমিই বলনা, একথা কি ভাব যায়! নিজের প্রতি তীব্র ধিক্কারে অবচেতন মন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল আর তৎক্ষণাৎ স্মৃতির দরজা খুলে হঠাৎ বছর তিন আগেকার এক জ্যোৎস্নাস্নাত ফাল্গুনী সন্ধ্যা এসে উঁকি মেরে গেল, আমি যেন বিবশ হয়ে গেলাম। সেদিনের সেই ফাল্গুণী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় কয়েক মিনিটের জন্য অনু আমার বাঁ হাতখানা তার দু-হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে, তাতে মুখ লুকিয়েছিল। হয়তো তার অন্তরের আনন্দের ঢেউ জ্যোৎস্নার আলোতে আমার চোখে ধরা পড়ে যাবে, তাই, নিজেকে আড়াল করবার জন্যেই সলজ্জ রক্তিম মুখখানাকে নিজেরই কোলে আমার হাতের তালুতে আড়াল করেছিল কিন্তু সেদিন সেই সন্ধ্যায় আমার হৃদয়ের পরতে পরতে, দেহের তন্তুতে তন্তুতে শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে যে ঝংকার, অনুরণন, যে অনাস্বাদিত অনুভূতি তুলে দিয়েছিল আজও তা অমলিনভাবে আমার মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। আচ্ছা রাঙাবৌদি বলতে পারো কেন এমন হয়?

আগের দিনের বিকেল থেকে অনুর বিয়ের দিন অর্থাৎ পরের দিন সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় অনাহারে কেটেছিল এবং তার উপর রাত্রে চোখের পাতা এক হয়নি, সুতরাং আমার শারীরিক অবস্থা তখন কেমন তা বুঝতেই পারছ। পথ চলতে চলতে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল।

অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পথ চলতে চলতে বড়বাজার ছাড়িয়ে কখন যে ডালহৌসি পাড়ায় এসে পড়েছিলাম তা নিজেই বুঝতে পারিনি। এক জায়গায় মার্কারী আলোর ঘটা আর গাড়ির পার্কিং দেখে একটু উপর দিকে মুখ তুলতেই দেখলাম লেখা আছে 'সাগর', বার কাম রেষ্টুরেন্ট। সাইন বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে মনে হল জায়গাটা খুবই চেনা তাই সুইং-ডোরটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। অন্য কিছু চিন্তা করবার আগেই দেখি আমি একটা টেবিলের উপর বসে আছি। ব্যস্‌ ঐ পর্যন্তই তারপর কী ঘটেছিল আর আমার মনে নেই, মনে পড়ছিল সব পরের দিন, সকালে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে।

পরের দিন সকালে বেলা প্রায় নটা নাগাদ আমার জ্ঞান ফিরেছিল, এবং জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমার মাথার কাছে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডাঃ বিমলেন্দু সেনগুপ্ত, যিনি আমার বাবার বন্ধু এবং আমার মামার কলেজ লাইফের ক্লাস-মেট। হ্যাঁ রাঙাবৌদি দুদিনের ঐ টানাপোড়েন আর অনশনের ধকলটা আমার এই দুর্বল

শরীরটা সইতে পারেনি। তাই 'সাগরে' ঢুকে টেবিলে বসে হাত দুটো আড় করে দুই হাতের ফাঁকে মাথাটা গুঁজে দিয়েছিলাম আর তারপরেই নাকি আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

অনেকদিন থেকেই 'সাগরে' যাতায়াত ছিল। তাই সাগরের ম্যানেজার থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সবাই আমাকে চিনতেন। আমি রেষ্টুরেন্টে ঢুকে বসতেই গোপাল আমার টেবিলের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল সেটাও দেখেছিলাম তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না। পরে গোপালের কাছে শুনেছি ঐ রেষ্টুরেন্টের ম্যানেজারের সহযোগিতায় অন্য এক খদ্দেরের গাড়ি করে ম্যানেজার ও গোপাল আমার সেই অচেতন দেহটাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। গোপাল তার আগে কয়েকবারই আমার জন্য রেষ্টুরেন্ট থেকে আমার বাড়িতে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। তাই সে আমার বাড়িটাও চিনত।

আমার জ্ঞান ফিরলে প্রথমেই ডাক্তার মামা সামনে এসে বললেন, "একদম উঠিস না, চুপ করে কটা দিন শুয়ে থাক্, তোর প্রেসারটা বড্ড লো হয়ে গেছে, ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর দিনকতক" ইত্যাদি। তারপরই হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছিল গতকাল তোর? হঠাৎ রেষ্টুরেন্টে বসে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন?"

না রাঙাবৌদি, ডাক্তার মামার একথার কোনো জবাবই দিতে পারিনি, একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন কী হয়েছিল আমার সেদিন, আর আজ তুমি জানলে, আর কেউই জানে না।

যাই হোক, দু-এক দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম এবং আবার কাজ-কর্ম করতে লাগলাম। এবার মনে মনে বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই কাজে লাগলাম, যে আমায় টাকা রোজগার করতে হবে। ঐ টাকার আভিজাত্য, গাড়িবাড়ির আভিজাত্য নেই বলেই আমায় অনুকে হারাতে হল। তাই আমার যেন জেদ চেপে গেল, আর দিনরাত ধরে শুধু টাকা-টাকা আর টাকা। অক্লান্ত পরিশ্রম করে কারখানাটাকে দাঁড় করালাম। যদিও কারখানাটা ছিল পার্টনারশিপের তবু কারখানাব মোট আয় বাড়লে আমার লাভের অংশ বাড়বে তাই প্রাণপাত করতে লাগলাম। কোথা দিয়ে যে দু-দুটো বছর কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।

একদিন, সেদিনটা ছিল শনিবার, কী কারণে কারখানায় ছুটি ছিল। আমি বড়বাজারেই ছিলাম। বেলা প্রায় একটা নাগাদ মাঝারি চেহারার এক ভদ্রলোক এসে আমার বাবার নাম ধরে খুঁজতে লাগলেন। ভদ্রলোককে খরিদ্দার মনে করে, "কী চাই বলুন" বলে এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন। ভদ্রলোকের সৌম্যদর্শন চেহারার সঙ্গে হাসিটি এমন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল যে আমি বেশ কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে না চেয়ে পারিনি। ভদ্রলোকের চোখেমুখে যেন অযুত স্নেহের রাশি ঝরে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।

আমার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে ভদ্রলোক বাবার টেবিলের কাছে গিয়ে কী

যেন বললেন, তাঁকে বসতে বলে বাবা আমাকে ডালহৌসিতে গিয়ে অ্যাম্বাসাডার গাড়ির দাম দেখে আসতে বললেন ইন্ডিয়া অটোমোবাইলস্-এর অফিস থেকে।

হ্যাঁ বৌদি, গাড়ি কেনার কথাটা বেশ কিছুদিন ধরে আমি বাবার কানের কাছে গুনগুন করে গেয়ে চলছিলাম, কারণ, গাড়ি আমার চাই ই। এতদিন বাবা মত দেননি, তাই আজ হঠাৎ গাড়ির দাম দেখতে যেতে বলায় এক লাফে দোকান থেকে বের হয়ে সোজা ডালহৌসির দিকে ছুটলাম। আমার মনে বড্ড শখ ছিল ভুল চিকিৎসায় পঙ্গু আমার বাবাকে গাড়ি চাপিয়ে নিজে ড্রাইভ করে ঘুরব ফিরব। হ্যাঁ বৌদি আমার বাবা প্রথম জীবনে চলচ্ছক্তিহীন ছিলেন না, চিরকালই ওরকম ছিলেন না, আমার বাবা অত্যন্ত সুন্দর সৌম্য এবং বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। এককথায় যাকে বলে পুরুষের মতো পুরুষ। কিন্তু সেই বাবাই রোগে ভুগে ভুগে কীরকম যেন হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে পি.জি. হাসপাতালে অপারেশন হয়। পৃথিবী বিখ্যাত সার্জেন অস্ট্রিয়ার ডাক্তার ক্রাউজ বাবার অপারেশন করেছিলেন। কিন্তু অপারেশন ব্যর্থ হয়েছিল। বাবার পিঠের কাছে কি যেন একটা নার্ভ কেটে যাওয়ার ফলে বাবার পা দুটো প্যারালাইজড্ হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ ক্রাউজ তাঁর ভুল স্বীকার করে নিজে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এজন্যে। তাই অত বড় একজন ডাক্তার ভুল করলেও আমাদের পরিবারের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জানিনা আজও তিনি বেঁচে আছেন কিনা, বেঁচে না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ জীবনে মরণে সবসময়েই তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র আর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় বাংলার মহামনীষী, তিনিও আমার পরিবারের সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্র কারণ তাঁর সহৃদয় সহমর্মিতা ছাড়া ঐ ডাঃ ক্রাউজকে দিয়ে বাবার অপারেশন করানোই যেত না। বাবার কী করে যে কোথা থেকে কী রোগ এসেছিল তা বাবাই জানতেন। আমাদের এক ধনী আত্মীয় যার কথা আগেই একবার বলেছি। পরবর্তী জীবনে পিসিমার কাছে গল্প শুনেছি যে ঐ ধনী আত্মীয়ের বাবার সেবা করতে গিয়েই নির্ধন আমার বাবাকে তাঁর কাছ থেকে ঐ রোগ জীবাণু নিজের শরীরে পুষ্ট করতে হয়েছিল দিনের পর দিন। শুনেছি আমার বাবার হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে ঐ ধনী আত্মীয়টি নাকি আমার বাবারও অনেক সেবা করেছিলেন এবং তার জন্যে তিনি আজও আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আর অই তাঁর মুখে যে কোনো কটু কথাতেই আমাদের কৃতজ্ঞতাকে কোনো সময়েই হারিয়ে যেতে দিইনি।

আমার বাবার অসুস্থতার সুযোগ পেয়ে বাবারই আর এক বন্ধু যিনি আমার বাবার গুরুভাইও এবং আমাদের বড়বাজারের পূর্ববর্তী দোকানের অংশীদার ছিলেন, তিনি করলেন চরম বেইমানি, ফলে লাখ দুয়েক টাকার অংশকে চাপ দিয়ে মাত্র তিরিশ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে তিনি স্বত্ব ভোগ করতে লাগলেন আর আমার বাবা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। একে নিজে রোগশয্যায় তার উপর ব্যবসাটা হাতছাড়া হয়ে গেল, কিন্তু ভগবান নামক অপদেবতাটি বোধহয় কোনো কোনো সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন, তাই হাতছাড়া হয়ে যাওয়া দোকানের ঠিক সামনের

একটা দোকানের অর্থাৎ যে দোকানটা মালিকানা স্বত্ব এখন তোমার এই হতভাগ্য দেবর উপভোগ করছে সেই দোকানের মালিক নিজে যেচে বাবাকে অংশীদার করে নিলেন এবং বাবার অনুরোধে আমাদের পূর্বোক্ত ধনী আত্মীয়টিকেও ঐ দোকানের অংশীদার করা হল। পরে অবশ্য এই দুই অংশীদার মিলেই অসুস্থতার সুযোগ নিয়েই বাবার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছিলেন। এক এক সময় তাঁরা অযৌক্তিক সমস্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে অর্ধশক্ত বাবার নিকট অদ্ভুত অদ্ভুত সুযোগ আদায় করতেন। যাক সে সমস্ত প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াই ভালো। সে সমস্ত শুনলে তুমি আঁতকে উঠবে, ভাববে একজন অসহায় পঙ্গু মানুষের মনকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে এমন নির্লজ্জভাবে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে তাঁদের বাধতো না! তাছাড়া সে সমস্ত কলঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ এখানে লিখলে তাঁদের হাতে পড়বে কারণ, তাঁরা এখনো জীবিত এবং বাবার সঙ্গে যাই করে থাকুক আমার বাবা তাঁদের ক্ষমা করে গেছেন আর তাই তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধার আসনে আমরা আজও বসিয়ে রেখেছি।

যাক্ যা বলছিলাম, বাবার গাড়ি কেনার কথায় আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাড়ির ক্যাটলগ লিটারেচার প্রাইস ইত্যাদি নিয়ে যখন দোকানে ফিরলাম, বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। শনিবার বেলা আড়াইটায় এপাড়ায় সব দোকান বন্ধ হয়ে যেত। বাবা কিন্তু একটু দেরী করেই বন্ধ করতেন দোকান, কারণ একদিন ঐ দোকানেই বাবা চাকরি করেছিলেন তিরিশের দশকে, তাই দোকানটার প্রতি বাবার একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। বাবার এই দেরী করা নিয়ে আমরা কত অনুযোগ করতাম। আমরা বলতে আমি ও আমার ছোট কাকা যিনি একসময় ঐ দোকানেরই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাবার অনুপস্থিতিতে। বাবা কিন্তু শুনতেন না। না রাঙাবৌদি, তখন মোটেই বুঝতাম না কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারি কেন বাবা উঠতে দেরী করতেন।

পরে ভেবে দেখেছি একটা মানুষের মনের জোরটা কত প্রবল হলে তবেই যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন সে বাড়িটা কিনতে পারেন, যে দোকানে কর্মচারী থাকেন সেই দোকানটা কিনে তার মালিক হতে পারেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় বড় গৌরবময় কাহিনী লেখা থাকে কিন্তু আমার বাবার মতো একজন অসহায় পঙ্গু মানুষের জীবনের ইতিহাসে এর চেয়ে গৌরবময় ঘটনা আর কী হতে পারে। যে লোককে কোলে করে রিক্সায় বসিয়ে দোকানে নিয়ে আসতে নিয়ে যেতে হত সে লোকের মানসিক ভারসাম্য কত কঠিন, নৈতিক বল কত বেশি থাকলে যে একাজ করা সম্ভব তা বোধ হয় আমার বাবাকে যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

পরবর্তী জীবনে একা থাকার অবসরে যখনই এই সমস্ত কথা চিন্তা করি তখনই মনে হয় ঈশ্বরের অসীম করুণা আর তাঁর প্রতি চরম বিশ্বাস না থাকলে বুঝি এরকম মনোবল হওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ রাঙাবৌদি, এইটাই আমার স্থির ধারণা।

আমি আসতেই কাগজগুলো আমার কাছ থেকে নিয়ে ব্যাগে ভরে বাবা দোকান

বন্ধ করবার নির্দেশ দিলেন। কাগজ উল্টে পাল্টে দেখলেন না। দেখলেন না বলে আমার অভিমান হল একটু, কিন্তু নিজের উৎসাহে নিজেই বলে গেলাম গাড়ির দাম ইত্যাদির কথা। কিন্তু তখনও বুঝিনি যে গাড়ি কেনাটা বাবার আসল উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দোকান থেকে সরিয়ে দেবার। জেনেছিলাম অনেক পরে, আমাদের কর্মচারী আমারই দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই অজিতের কথায়।

ঐ দিনই নাকি প্ল্যান আঁটা হয়েছিল আমাকে সাতপাকের প্যাঁচে ফেলবার। আমার বাবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চ রুচির লোক ছিলেন। পাছে আমার মনে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাই আমায় কোনো কিছুই জানতে দেননি, কারণ বাবা ভালোই জানতেন যে অনুর স্মৃতি আমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না মন থেকে। ওদিকে ভিতরে ভিতরে পরের শনিবারে মেয়েও দেখা হয়ে গেল আমার জন্যে এবং সে শনিবারেও যথারীতি আমাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়ে মেয়ে দেখা পাট চোকানো হল এবং বেলা দুটো নাগাদ দোকানে এসে বাবা আমায় সোজাসুজি বললেন তোমার জন্যে মেয়ে দেখেছি এবং আজ আশীর্বাদের দিনও ধার্য করে এসেছি।

বাবার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে আমার কি যেন হল, কোনো কথা না বলে স্রেফ দোকান থেকে বের হয়ে ডালহৌসি মুখো হয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে দুহাতের জামায় টান পড়তে ঘুরে দেখি অজিত ও রাম, দোকানের দুই কর্মচারী দুদিক থেকে আমার জামা ধরে টানছে, আমি চোখে তীব্র দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেই ওরা থতমত খেয়ে আমায় ছেড়ে নিচু করে বলতে শুরু করল বাবা নাকি আমায় ডাকছেন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কি চিন্তা করে বললাম, "তোরা যা আমি পরে আসছি।" বাইরে বাবার স্নেহ প্রদর্শন যতই না থাক অন্তরে যে স্নেহের ফল্গু বয়ে যেত সেটা মর্মে মর্মে কয়েকবারই উপলব্ধি করেছি। বৃথা আর বাবার মনে আঘাত দিতে ইচ্ছা হল না, রাস্তাতেই একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে এলাম দোকানে। বাবা জানতেন আমি ভীষণ অভিমানী তাই আমাকে জিজ্ঞাসা না করে বিয়ের ঠিক করায় হয়তো আমার অভিমান হয়েছে, ভেবে দোকানে ঢোকামাত্র বাবা আমায় হঠাৎ বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, তোর যখন মত নেই তখন ভদ্রলোককে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব যে আমরা আশীর্বাদ করতে যাচ্ছি না। এতে আর রাগ করার কী আছে, তুই বলতেই তো পারতিস।"

জানো বৌদি বাবার কটা কথার মধ্যে যে কী ছিল জানি না কিন্তু আমার যেন তখন মনে হল আমার বাবার মধ্যেও আমার থেকেও এক দারুণ অভিমানী হৃদয় বসে আছে, যে হৃদয় ঐ সামান্য কটা কথা দিয়ে যেন তার অন্তরের কান্নাকে আমার শ্রবণে ঢেলে দিচ্ছে। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। শুধু মুখ নীচু করে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

দিন কয়েক পরে একদিন আমায় খুব হাসিখুশি দেখে বাবা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "হ্যারে বিধু সেই ভদ্রলোককে চিঠিটাতো লিখতে ভুলে গেছি! দেখেছিস্! একখানা খাম এনে দেতো চিঠিটা লিখে ফেলি!" আমি অচল, অনড়। বাবাও তখনকার মতো চুপ করে গেলেন। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন বাবা, মা, আমার ছোট কাকা ও জামাইবাবু সবাই মিলে বর্ধমানে চলে গেলেন সেই ভদ্রলোকের মেয়েটিকে আশীর্বাদ করতে। না রাঙাবৌদি আমি আর অমত করিনি, কারণ তখন বিত্ত জমাতে গিয়ে দিনের পর দিন চিত্তটাকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলাম, ভেবেই নিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে বিয়ে করাও যা না করাও তাই, তবু বাবা যখন বলছেন তখন যা ভালো বোঝেন তাঁরা করুন।

জানো রাঙাবৌদি, আমার এই মনোভাব কিন্তু পরে আমার স্ত্রীকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। যাক পরে সে কথায় আসছি।

বাবার একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার শিক্ষিত ছেলে, অবশ্য শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তখনও তা পাইনি, পেয়েছিলাম শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সাধারণ স্নাতকের ডিগ্রী। কিন্তু খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম বাবার মুখ থেকে শুনে যে আমাদের বিরাট রাবণের মতো গোষ্ঠীতে এর আগে কেউ নাকি কখনো স্নাতকই হয়নি। সুতরাং সেদিক দিয়ে নাকি আমি রেকর্ড করেছি। ভাবতে পাঁরো রাঙাবৌদি, সেটা আমার কাছে কত বড় লজ্জা, কিন্তু সেইটাকে কেন্দ্র করেই নাকি আমার বিয়েতে খুব ধুমধাম করা হল। দশ-বারো দিন ধরে শুধু লোকই খেল কয়েকশ আর এই লোকেদের মধ্যে তথাকথিত ভদ্রলোকের সংখ্যার থেকে দীন-দুঃখী উলঙ্গ ফকিরের দলই বেশী, কারণ আমার বাবা গরীবের ছেলে ছিলেন বলে গরিব দুঃখীর উপর তাঁর দুর্বলতা বরাবরই একটু বেশীই ছিল। হ্যাঁ রাঙাবৌদি, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলাম ঘরে বিয়ের পরের দিন। সেদিনটা কাটল। তারপরের দিন ফুলশয্যার রাত। শুনেছি সে রাত নাকি জীবনের এক চরম আনন্দ এবং পবিত্রতার রাত। কিন্তু সে রাতের পরম আনন্দময় মুহূর্তগুলো আমার কেটে গেল চরম বিষাদে ও বেদনাসিক্ত ঘন অশ্রুধারায় ভেসে।

তুমি হয়তো ভাবছ সবই আমার অদ্ভুত। সত্যিই রাঙাবৌদি আমার সবটাই অত্যন্ত অদ্ভুত। খুলেই বলি, শোন তাহলে, প্রীতি-অনুষ্ঠানের পর সবাই চলে গেলে আমাকে বাবার ঘরে যেতে বলা হল। ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। বাবার ঘরটাই বাড়ির মধ্যে সবথেকে সুন্দর তাই বাবার আদেশেই ঐ ঘরে আমার ফুলশয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুরুদুরু বুক নিয়ে বাবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি বাবা নেই। সে ঘরে তার বদলে খাটের চারদিকে রজনীগন্ধার মালার ঘেরাটোপের মাঝখানে বসে আছে আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সুস্মিতা। হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই দেখি রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

আমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমার স্ত্রী নেমে এসে আমার

হাতটা ধরে খাটের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে সেইখানেই নতজানু হয়ে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মিনিট দুয়েক কেটে যাবার পর সে নিজে থেকেই উঠল এবং কী যেন একটা বলল। তার কথা তখন আমার কানে ঢোকেনি, ঢোকেনি কেন জানো? ঢুকবে কী করে, তার সেই প্রণাম করার ভঙ্গিটা দেখে বছর চারেক আগেকার হোলির দিনের দুপুরবেলায় আর একটা ঘটনার ছবি তখন আমার দুচোখের পর্দায় দুলছে আর সে ছবির রঙের বৈচিত্র্যের মধ্যে আমার ফুলশয্যার রাতের এই বৈচিত্র তখন কোথায় তলিয়ে গেছে।

আমাকে স্তব্ধ থাকতে দেখে আমার স্ত্রী আবার যেন কী বলল, এবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "কী বলছিলে?" সুস্মিতা বলল, "মায়ের ছবি নেই?"

জানো রাঙা বৌদি, মুহূর্তের মধ্যে আমার যেন কী হয়ে গেল। এই বিয়ে বাড়ির প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে একমাত্র আমার দুই পিসিমা ও মামা ছাড়া আমার মায়ের কথা একবারও কেউ তোলেননি, তাই নববিবাহিতা স্ত্রীর মুখে ফুলশয্যার রাতে মায়ের কথা শুনে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। পাশেই আমার ঘরে একটা সুটকেশের মধ্যে মায়ের ছবি রাখা ছিল, সেটা বের করে আনবার আর তখন আমার ধৈর্য্যে কুলোল না, তাই পুরো সুটকেশটাই এনে তার হাতে চাবিটা ছুড়ে দিয়ে আমি বিছানার একপাশে মুখ গুঁজে কঁকিয়ে কেঁদে উঠলাম। ছবিটা নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার স্ত্রী এসে আমার পাশে দাঁড়াল এবং আমার ডান হাতটা টেনে ধরে বলল, "প্রণাম করবে না?" তার কথা বলার ভঙ্গী শুনেই বুঝলাম সেও ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। কোনোরকমে মুখ তুলে ছবিটা তার হাত থেকে নিয়ে সেই ছবির পায়ের উপর পড়ে সারাটা রাত প্রায় কেঁদে কেঁদেই কাটিয়েছিলাম দুজনে। হ্যাঁ বৌদি আমাদের মধুযামিনীটা রোদন যামিনীতে পরিণত হয়েছিল। তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, অচেনা-অজানা একটা মেয়ে যে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আমার স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে আমার তিরোহিতা মায়ের জন্য তার আকুলতা ও কান্নার বেগ দেখে সে রাতে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি। শুধু শ্রদ্ধা নয় শুধু এই দিয়েই বোধহয় সে খানিকটা ভালোবাসাও আমার কেড়ে নিয়েছিল।

মনে মনে ভেবেছিলাম বিয়ে করতে হয় তাই করছি, খানিকটা বাবার মান ও মন রাখার জন্যেই। কিন্তু পরবর্তী জীবনে দেখেছি যাকে অন্তরে স্থান দিতে পারব না বলে সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম সে যে কখন অন্তরের নিভৃতে গিয়ে বাসা বেঁধেছে টেরও পাইনি।

জানো বৌদি, দিন এগিয়ে চলেছিল আর আমিও ঘোরতর সংসারী হয়ে যাচ্ছিলাম দিন দিন, মেয়েটির অর্থাৎ সুস্মিতার সংস্পর্শে এসে আমারও যেন পরিবর্তন শুরু হল ধীরে ধীরে। এদিকে ভগবানও দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য ভিতরে তৈরি হয়েই বসেছিলেন।

বিয়ে হল পঁয়ষট্টির মার্চে, বাবা মারা গেলেন ছেশট্টির আগস্টে। সেদিন তারিখটা

ছিল আগষ্টের প্রথম দিন। একত্রিশে জুলাই রাতে বাবার থ্রম্বসিস অ্যাটাক হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ঘুড়ির সুতো কেটে গেল আর ওপার থেকে ভগবান লাটাই গুটিয়ে নিলেন।

বাবা চলে গেলেন কিন্তু যাবার কয়েক মাস আগে দোকানটাকে নিজস্ব করে গিয়েছিলেন। আত্মীয়দের পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পুইয়ে শেষে এটুকু করতে পেরেছিলেন।

জানো রাঙাবৌদি, মাঝে মাঝেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবি একজন মানুষ কী নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েও অসহায় পঙ্গু অবস্থায় জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ধীরে ধীরে যেইমাত্র জয়লাভ করলেন, ঠিক তখনই কি ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর অভাব বোধ হল? এই নিয়ে তোমাদের ঐ ভগবানটির উপর আমার কিন্তু ক্ষোভের সীমা নেই। যিনি সারাটি জীবন ধমনীর প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দিয়ে সব করে গেলেন, কী ক্ষতি হতো আরও কয়েকটা দিন তাঁকে পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস নিতে দিলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে বৌদি? এর কি কোনো উত্তর হয়? না হয় না। আমি ভালোভাবেই জানি, যে এ প্রশ্ন ভগবান নামক দেবাধমটির কাছে প্রতিনিয়ত তুমিও করে চলেছ।

বাবা তো চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর কষ্টোপর্জিত সমস্ত স্বত্ব ভোগ করবার জন্য আমাদের রেখে গেলেন। তুমি তো জানোই তাঁরই সব ভোগ করছি এবং কেমন সুন্দর হাসি ফুটিযে লোককে বলে বেড়াচ্ছি আমার, আমার, আমার!

বাবা চলে যাবার পর তদারকী ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় কারখানাটা বিক্রী করে দিয়ে পুরোপুরি দোকানের হাল ধরে বসলাম। দোকানে এসে দেখলাম বছর খানেক আগে অংশীদারদের পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিতে গিয়ে দোকানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল এবং দোকানে মালের স্টকও বিশেষ কিছু নেই। চিন্তা হতে লাগল, কিন্তু মনে বল সংগ্রহ করে কাজে লেগে গেলাম।

এখানেই চুপি চুপি বলে রাখি, দোকানে বসবার আগে আর দোকান থেকে ওঠবার আগে আজও আমি বাবার ছবিতে প্রণাম করি এবং প্রণাম করবার সময় আমার মনের মধ্যে অদৃশ্যালোক হতে কেউ যেন বল সঞ্চার করেন। যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে সে সমস্যা আমার দূর হয়ে গেছে।

জানো বৌদি, অনেকদিন এর অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার সব সময়ই মনে হয় ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরে বাবা উত্তর দিকের ঘরে বসে একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন কিংবা 'সঞ্চয়িতা' থেকে আবৃত্তি করছেন। হ্যাঁ বৌদি বাবা দারুণ কাব্যরসিক এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। তাঁর নিজের নামও পৃথিবী বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের নামে ছিল। হয়তো সেইজন্যেই তিনি আরও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। সবাই না মানতে পারেন কিন্তু এ আমার মনের বিশ্বাস।

জানো বৌদি, আজ যখন এই চিঠিটা তোমায় লিখছি তখন আমি শুধু ব্যবসাদারই

নই, পশ্চিমবাংলার কবি-সাহিত্যিক মহলেও আমার একটা সামান্য পরিচিতি প্রকাশ হয়েছে। তুমি তো জানোই, আমার দুখানা কবিতার বই ইতিমধ্যেই বাজারে বেরিয়েছে। আরও একখানা কবিতার বই ও একখানা উপন্যাসের ছাপার কাজ এগুচ্ছে। কিন্তু আজ আর এসব দেখতে বা পড়তে আমার বাবা নেই, মা নেই, ঠাকুর্দা নেই, মেজকাকাও নেই। অথচ সবাই ছিলেন এই কয়েক বছর আগে পর্যন্তও। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় কি হবে ছাইভস্ম লিখে? ব্যথায় মনটা টনটনিয়ে ওঠে। এক এক সময়, আর বেশ কয়েকদিনের জন্য আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি, যেমন হয়ে পড়েছিলাম এই গত কয়েকটা দিন যে জন্য তোমাকে কোনো লেখা পাঠানো হয়নি।

ভেবেছিলাম আর কলম ধরব না, কিন্তু তোমার অনুযোগ আর উপদ্রবে পড়ে আবার কলম ধরতে হল। এ পৃথিবীর সকলকে এড়িয়ে চলতে পারি কিন্তু তোমাকে কী করে এড়াই বলত! তুমি যে আমার মুখ দেখলেই মনের ভিতরটা পড়ে ফেল তাই তোমার কাছে থেকে এ পোড়া মুখটাকে দূরে দূরেই সরিয়ে রাখি।

জানো বৌদি, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমি যেন 'পুলিশ', আর আমি যেন কোনো 'দাগী আসামী' সব সময়ে তাই তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি।

অনেকদিন থেকেই তুমি আমার সম্বন্ধে জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে আসছ। এ উৎসুক্য হয়তো এই দাগী আসামীটি, তোমার দেবরটি লেখক বলে? ভেবেছিলে হয়তো লেখকদের জীবনের বহু রস-সমৃদ্ধ ঘটনার বৈচিত্র্যে বিমোহিত হয়ে যাবে কিন্তু এখন পড়তে পড়তে আদৌ হয়তো তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু আমার যে আর উপায় নেই। মাঝপথে এসে এখন থামি কী করে বলত! কাজ অর্ধসমাপ্ত রাখলে নাকি আধকপালে ধরে! এসব তো তোমাদেরই উক্তি। অন্তত আধ কপালের হাত থেকে বাঁচবার জন্যও আমার এ কাহিনী শেষ করতেই হবে।

হ্যাঁ এবার আবার শোন, দোকান নামক ছোট্ট ডিঙিটির হাল ধরে টলমল করতে করতে যখন একটু একটু করে এগোচ্ছি তখন আমার বাবারই অতি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব মহল থেকে আমার সম্বন্ধে নানা কথা আসতে লাগল কানে। যথা, আমার নাকি ব্যবসায় কোনো যোগ্যতাই নেই, আমি নাকি লোকসান করে মাল বিক্রি করি দিনের পর দিন, ইত্যাদি। কথাগুলো যে মহল থেকে আসতে লাগল সে মহলটাকে আমি কোনো দিনই ভালো চোখে দেখতাম না। কেন যে দেখতে পারতাম না তার একটা কারণ বলি শোন। বাবা মারা যাবার তিনদিন পর যখন কাচা গলায় দিয়ে দোকানে বসি তখন অনুভব করতে থাকি বড়বাজারের কোনো কোনো মহল বাবা গত হওয়াতে বেশ খুশী এবং চাঙ্গা। আমাদের দোকান নিয়ে নাকি দু-চারজন তখন বাজী ধরতেও আরম্ভ করেছে, যারা শেষপর্যন্ত নিজেদের ব্যবসাই লাটে উঠিয়ে ফেলেছে।

দোকানে বসেই সেদিন দেখলাম একেবারে সামনের একটি দোকান থেকে আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাস্যরসালাপ সহযোগে রসগোল্লা সেবন চলছে।

পরে শুনেছি গত তিনদিন ধরে প্রায় লোক ধরে ধরে ডেকে ডেকে ঐ দোকানটিতে রসগোল্লা বিতরণ চলছে। যাইহোক, সেদিন ঘটনাটা নিজেই দেখলাম। বুঝলাম যে আমার ব্যবসায়ের ভাবী অপমৃত্যুর শ্রাদ্ধপর্বের অগ্রিম ভোজনোৎসব চলছে দোকানে, তাই আমার চেয়ারে বসে আমার চোয়াল যেন আপনা থেকেই শক্ত হয়ে উঠল। কিসের যেন এক শপথ নিয়ে ফেললাম মনে মনে। সব দেখলাম, বুঝলাম এবং মনের ভিতর রেখে দিলাম। তোমার শুনতে খারাপ লাগছে কিন্তু জানো রাঙাবৌদি, আমি ওতে মোটেই অবাক হইনি, কারণ আমি যে পুরুষ মানুষ। যত কোমলই হোক আমার হৃদয়, আমি নিজের স্বাতন্ত্র্য বা মর্যাদাবোধ হারাইনি কোনো সময়।

আমার বয়সটা তখন মাত্র চব্বিশ, কিন্তু বাবা মারা যেতেই তিনদিন তিনরাত্রি কেঁদে কেঁদে আমি তখন প্রায় চল্লিশে পৌঁছেছি। কোনোদিন যদি আমার মতো কারও দেখা পাও প্রশ্ন করে দেখো শুনতে পাবে তারও বয়সটা রাতারাতি এরকম করেই বেড়ে গিয়েছে।

যাই হোক, ওদের অভিশাপ এবং হিংসাতুর নয়নের অমঙ্গল-প্রত্যাশী দৃষ্টি আমার জীবনে চরম আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ালো। বড়বাজারের আকাশে তোমার এই বিধু ঠাকুরপোটি দপ দপ করে জ্বলতে জ্বলতে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকল।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটলো। কংগ্রেস সরকারের মৌরসি পাট্টা ঘুচে গিয়ে এল যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার। ঐ সরকারের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের এম. এল. এ. ললিত হাজরা আমার আপন মেসোমশায় ছিলেন। হঠাৎ বিধানসভার লবিতে তাঁর স্ট্রোক হয় এবং তাঁর বুকপকেটের ডায়ারিতে আমার দোকানের টেলিফোন নম্বর থাকায় বিধানসভা থেকে আমায় ফোন করা হল তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য, কারণ মেসোমশায়কে হস্‌পিটালাইজ করতে হবে।

টেলিফোন পেয়ে আমার মনের অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। আমার নিজের গাড়ি না থাকায় হাতের কাছেই আমার সেই ধনী আত্মীয়টির অফিসে ফোন করে অবস্থাটা বুঝিয়ে ওঁদের একখানা গাড়ি চাইলাম। একখানা বললাম, মা লক্ষ্মীর কৃপায় ওঁদের তখন খান তিনেক গাড়ি। আমার টেলিফোন পেয়ে ওঁদের এক ভগ্নীপতি একটু রসিকতাই করলেন। হয়তো ভাবলেন আমি রসিকতাই করছি কিংবা গাড়ি চাইবার যোগ্যতা তখনও আমার হয়নি। একথাটা হয়তো তুমি বুঝলে না। সচরাচর যাদের গাড়ি থাকে তাদেরই নাকি অপর গাড়ির মালিকদের কাছে গাড়ি চাইবার যোগ্যতা থাকে, কারণ দাতারও তাহলে প্রয়োজনের সময় গাড়ি পাবার আশা থাকে। যার গাড়ি নেই তাকে, চাইলেই যে গাড়ি দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তাতে যে চেয়েছে তার যত প্রয়োজনই থাকুক না কেন, যত বিপদই ঘটুক না কেন! অবশ্য এ সমস্ত বুঝেছি আরও অনেক পরে। ওঁদের কাছে রূঢ় প্রত্যাখান পেয়ে ভাড়া গাড়ি করে নিয়ে বিধানসভায় গিয়ে দেখি ততক্ষণে পুলিশের গাড়ি করে মেসোমশায়কে পি.জি. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অক্সিজেন চলছে।

আমি বাইরে থেকেই খবর নিয়ে চলে এলাম, কারণ ডাক্তারের নিষেধ ভিতরে ঢুকতে।

যাইহোক, মেসোমশায় তো দিন পনেরর মধ্যে সুস্থ হয়ে আবার বিধানসভায় যোগ দিলেন, কিন্তু এই বিপদটি ঘটিয়ে আমার জীবনে একটা চরম শিক্ষাও দিলেন। শিক্ষাটা হল এই যে, আমি এখনও, "ধনে-জনে-মানে এক নহি"।

পরের মাস সেপ্টেম্বর। পানাগড় মিলিটারী নীলামে গিয়ে একখানা জীপ কিনে আনলাম। জীপটা কেনার মাস ছয়েকের মধ্যেই আমার সেই ধনী আত্মীয়ের ভাইয়ের হঠাৎ প্রয়োজন পড়ল বেনারস যাবার, কারণ তখন নাকি তাঁদের বেনারসে এক বিরাট কেবল্ ইন্ডাষ্ট্রি বসছিল। নির্দ্বিধায় জীপটা দিলাম, ড্রাইভার চাইলেন, তাও দিলাম। গাড়িটা নিয়ে পথে অ্যাক্সিডেন্ট করে মাস তিনেক বাদে ফিরে এলেন এবং সেই দোমড়ানো অবস্থাতেই আমায় গাড়িটা ফেরত দিলেন, তাও নিলাম। মাসের শেষে ড্রাইভার বলল বাবু আমার মাইনেটা দিন, তাকে এক মাসের মাইনে দিতে গেলাম সে বলল, "আগের দুমাসের মাইনে চাই", আমি এবার অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইতে সে বুঝতে পেরে বলল, "বড়বাবুরা মাইনে দেননি।" তথাকথিত বড় বাবুদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে বা কিছু বলতে আর রুচি হল না। তিনমাসের মাইনে দিয়ে দিলাম। বুঝলে বৌদি, এই হল দুনিয়া! এই দুনিয়ার বড় মানুষরা বুঝি এইরকম চালেই চলে!

তুমি হয়তো ভাবছ আমিও তো এতদিনে বড় মানুষ হয়ে গেছি। তাহলে হযতো আর কিছুদিন পরে আমিও আর তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। না রাঙা বৌদি, সে ভয় করো না, কারণ তার প্রয়োজন নেই। আমি বড় মানুষ হলেও অন্যান্য অনেক বড় মানুষদের মতো শুধু এক ঝুড়ি "মান" নিয়ে ঘুরে বেড়াব না, "হুঁশ" টাও সব সময় সঙ্গে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াব। সুতরাং, সেদিক থেকে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আর এই হুঁশটা প্রতিনিয়ত সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘোরে বলেই তো আমি আরও বড় হতে পারলাম না। না হলে তো এতদিন ঐশ্বর্য লোলুপতার আরও কয়েকটা ধাপ টপটপ করে উঠে যেতে পারতাম।

তুমি ভেবো না, আমার কিন্তু এর জন্য মোটেই দুঃখ নেই। বাবা মারা যাবার পর এই বিগত এগারো বছরে অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সার্থকতা কতটুকু পেয়েছি জানি না, সফলতা কতটুকু ধরা দিয়েছে জানি না তবে এটুকু শুধু জানি আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট আর আমার এই সন্তুষ্টির মূলে যে আরও দু-এক জনেরও যথেষ্ট অবদান আছে সে কথা অনস্বীকার্য। এই দু-এক জনের মধ্যে একজন হলেন আমার বড় ভগ্নীপতি অরূপেশবাবু আর একজন আমার স্ত্রী সুস্মিতা।

আমার জামাইবাবুর স্বচ্ছ, উদার ও পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে ঔদার্য্যে দীক্ষা দিয়েছে, যেটা বাবা মারা যাবার পর আমার প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিল। সুস্মিতার সহিষ্ণুতা

ও ধৈর্য্য আমার উপর ব্যক্তিগত বন্ধন রচনা না করে আমায় নিজের পথে এগিয়ে যেতে দিয়েছে। কোনোদিন কোনো অছিলাতেই সে তার ব্যক্তিগত ভোগসুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আপন দৃষ্টিকে কলুষিত করেনি। আজকের দিনে একটা সাধারণ ঘরের মেয়ের কাছে এই পাওয়াটা বড় কম পাওয়া নয়, কারণ সাধারণ ঘরের মেয়েরা বিবাহের পরেই স্বামীকে ভাবতে শুরু করে তার পৈতৃক অর্থে ক্রীত একেবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর স্বামীরাও স্ত্রীদের ভাবতে আরম্ভ করে যেহেতু বিয়ে করে এনেছে সেহেতু মেয়েটি তার হাতের খেলার পুতুল। আর এই চিন্তাধারার জন্য সংসারে নানা বিপত্তির উৎপত্তি হয়।

জানি রাঙাবৌদি, তুমি হয়তো বলবে, চাইবার আগেই পেয়ে যাচ্ছে তাই আর চাইতে হয় না। কিন্তু এও ঠিক যে, চাওয়া যাদের নেশা, যতই দাও তারা চাইবেই। সুস্মিতা কিন্তু সে ধরনের মেয়ে নয়। তুমি হয়তো জানো না, সুস্মিতাকে আমি সব সময় সঙ্গসুখটুকুও দিতে পারি না তবু তার মুখের হাসি কখনও ম্লান হতে দেখিনি। বল, একি আমার কম পাওয়া? ওর মতো সঙ্গিনী পাশে না থাকলে কি এই চৌত্রিশেই আমি এতখানি এগোতে পারতাম! তুমি হয়তো বলবে, জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে তাই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু একটা কথা আছে জানো তো 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস' আর 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

জানো রাঙাবৌদি, এখন রাত কটা বাজে? এখন রাত পৌনে তিনটে কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। কেন বলতো? তোমার তাগাদা এসেছে বলে। অনেকদিন লিখিনি তো তাই এই লেখাটা শেষ না করে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তুমি ভাবছ রাত জেগে শেষে শরীর খারাপ হবে, কিন্তু না, সে ভয় নেই, কারণ এ আমার বহুদিনের অভ্যাস। দিনের বেলায় দোকানের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, অথচ লেখার বাতিক, তাই রাত্রির এই নির্জন ঘন নিস্তব্ধ প্রহরগুলো বেছে না নিলে যে লেখাপড়া হয়ই না, তাই কী করি বল!

এই দেখ না আমি তোমাকে লিখছি আর আমার স্ত্রী সুস্মিতা পাশের ঘরের খাটে কেমন শান্তভাবে তার দুই শিশুপুত্রের মাঝখানটিতে শুয়ে আছে। হ্যাঁ রাঙাবৌদি, লেখকদের, কবিদের, সাহিত্যিকদের, শিল্পীদের স্ত্রীদের নাকি এইরকমই হতে হয়, না হলে নাকি সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটে, তা স্ত্রীদের মনে না পাবার বেদনাটা যতই ব্যথা দিক না কেন! হ্যাঁ সুস্মিতাকে আমার এই জন্যই আরও ভালো লাগে। অথচ ও খুবই প্রাণচঞ্চল, এখনও একেবারে হরিণ শিশুটির মতো। জানিনা ওর আসনে অনু থাকলে সে এখন কী করত।

হ্যাঁ বৌদি, এই ফাঁকে আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, সুস্মিতার প্রতি কৃতজ্ঞতামাখা ভালোবাসার দান হিসেবে ইতিমধ্যেই তাকে একখানা খুব ভালো বাড়ি উপহার দিয়েছি। অবশ্য সেটা শহর কলকাতায় দিতে পারিনি, কলকাতা থেকে পনেরো

কিলোমিটার দূরে কলকাতারই এক শহরতলীতে, এখন সুস্মিতা তার নিজের বাড়িরই একখানা ঘরে খাটে শুয়ে আছে।

তুমি তো জানো বৌদি, আমি একটু স্বাধীনচেতা, তাই কারও কথায় বিশেষ কান দিই না; যে যা বলে চুপ করে শুনি, কিন্তু করি যেটা নিজে ভালো বুঝি, সেটা। কিছুদিন আগে আমার বাবার আমলের এক অতি পুরাতন কর্মচারী আমার এগারো হাজার টাকা আর আমার কাকার প্রায় উনচল্লিশ হাজার টাকা সই জাল করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে পালায়, তারপর থেকে তার জায়গায় আর কোনো ছেলে কর্মচারী রাখিনি। রেখেছিলাম এক লেডি-টাইপিস্ট আর আমার পুরানো টাইপিস্টকে ঐ ভেগে পড়া কর্মচারীর স্থলাভিষিক্ত করেছি।

যে মেয়েটিকে প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম সে হল সুপ্রিয়া প্রাইস্ একজন অ্যাংলো মেয়ে। তখন কলকাতায় থাকতাম। যে পাড়ায় থাকতাম সে পাড়ায় দিনরাত বোমাবাজি হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে, তাই ভয়ে মেয়েটি কাজে জবাব দিয়ে গেল আর তার জায়গায় রাখলাম শ্রীরামপুরের কৃষ্ণা বিশ্বাসকে। মেয়েটি কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করেছিল। কাজেকর্মে ও মধুর ব্যবহারে আমার কাছ থেকে অগ্রজসুলভ স্নেহ ও প্রীতি আদায় করে নিয়েছিল। এই কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়ে গেল, নেমন্তন্ন করেছিল। সুস্মিতা ও আমি গিয়েছিলাম। আমাদের পেয়ে কৃষ্ণার মা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণার মায়ের ব্যবহারে আমার চোখে আনন্দের অশ্রু এসে গিয়েছিল, কেন এসেছিল বলতো? কৃষ্ণার মা যখন আমার আর সুস্মিতার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আদর করেছিলেন তখন আবার আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আচ্ছা রাঙাবৌদি, বলতে পারো সব মায়েরাই কি একরকম হন?

সেদিন কৃষ্ণাদের বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় ওর মাও যত কেঁদেছিল সুস্মিতাও তত কেঁদেছিল, আর আমি চোরের মতো বাইরে পালিয়ে এসে চোখের জলটা আর একবার মুছেছিলাম।

কৃষ্ণা চলে যাবার পর এল পূর্ণিমা। কিছুদিন কাজ করবার পর ভালো চাকরি পেয়ে সেও চলে গেল, কিন্তু যাবার আগে তার কর্মকুশলতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আমার স্ত্রী সুস্মিতার মনের গভীরে সে দাগ কেটে গেল। সুস্মিতা ও আমি তার মধুর ব্যবহারের জন্য আজও তাকে ভুলতে পারিনি।

এই পৃথিবীতে এক যায় আর এক আসে, এই তো নিয়ম, নাকি বলনা! তাই পূর্ণিমা চলে যেতে আবার টাইপিস্টের খোঁজ পড়ল আমার। আমার রিকোয়েস্ট অনুযায়ী লেক কমার্শিয়াল কলেজ যাকে ইন্টারভিউতে পাঠাল তাকে সামনে দেখেই আমার সপ্ত-আকাশ কেঁপে উঠল। মনের ভাব প্রকাশ না করে মেয়েটিকে বললাম, "বসুন, কী নাম আপনার?" উত্তরে বলল, "উর্বী বোস"। আমি আরও অবাক কৌতুহলী হলো, ভালো করে মেয়েটির দিকে চাইতেই মেয়েটি মুখ নীচু করে নিল।

দু-চারটে জরুরী কথা বলে নিয়ে মেয়েটিকে চলে যেতে অনুমতি দিয়ে বললাম,

"তাহলে আজ বুধবার, পরশু অর্থাৎ শুক্রবার থেকে কাজে লেগে যান।" মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে এবং সামান্য হেসে চলে গেল। এই হাসিটা হয়তো চাকরি পাবার আনন্দে। জানি না কিসের হাসি সে হেসেছিল, তবে সেই হাসিটা আমার কাছে খুবই সরল ও পবিত্র মনে হয়েছিল।

মেয়েটি চলে যাবার পর মেয়েটির মুখ ও আরও দুটি মুখের ছবি আমার চোখের পর্দায় দুলে উঠল। তার একটি হল, অনুর ও অপরটি আমার মায়ের। মেয়েটির কপাল, চুল, কথাবলার ভঙ্গী ও দাঁড়ানোর ভঙ্গীর সঙ্গে হুবহু অনুর। ঐ সমস্ত ভঙ্গীগুলোর মিল আর মেয়েটির চোখ দুটি, গালদুটো ও গায়ের রং আমার মায়ের মতো। অবশ্য মাকে আমি এমন করে দেখিনি কোনোদিন, সে সুযোগই হয়নি। কারণ দেড় বছর বয়সেই তো মা ওপারের দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। আত্মীয়-মহলে শুনে এবং মায়ের ছবি দেখেই আমার যেটুকু ধারণা হয়েছিল তাই দিয়েই মেয়েটির সঙ্গে মায়ের তুলনা করে ফেললাম। বার বার একটা জায়গায় মনটা ঘুরতে লাগল, সেটা হল মেয়েটির দীঘল দুটি চোখ, শুধু চোখ দিয়েই যেন ও বহু কথা বলে দিতে পারে।

পরের দিনটা বাদ দিয়ে ও শুক্রবারে এসে কাজে জয়েন করল। কাজের সময় হল সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা এগারটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত। প্রথমদিন এটা ওটা সেটা বুঝিয়ে দিতে দিতেই প্রায় সময় কেটে গেল আর ও উঠে পড়ল। ওর বের হয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে হাঁটার ভঙ্গীটা ভালো করে দেখে নিলাম। দেখে মনে হল এতদিন পরে আমার সেতারের ছেঁড়া তারগুলো কে যেন লাগিয়ে দিয়ে গেল।

চাকরির জন্য পাঠানো এ্যাপ্লিকেশন ফর্মে সে তার অধিক পারদর্শিতার ঘরে বসিয়েছিল আবৃত্তি ও নাটকাভিনয়ে পারদর্শিনী। সেটা দেখে এবং জেনে থেকে আমার মনটা ছট্‌ফট্ করছিল। তাই প্রথম দিনেই ইন্টারভিউর সময় তাকে আবৃত্তি করতে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল কারণ আমিও যে ঐ পথেরই পথিক।

মেয়েটির আলাপ এবং মিষ্টি ব্যবহারে ও তার মধুর কণ্ঠস্বরের মাদকতায় দুদিনেই আমার যেন নেশা ধরে গিয়েছিল। আলমারী থেকে নিজেরই লেখা একখানা কবিতার বই বের করে তার হাতে দিয়ে বলে বসলাম, "একটা আবৃত্তি করুন তো শুনি।" মেয়েটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মাত্র দুদিনের আলাপেই যে কোনো বস্ তাঁর টাইপিস্টকে আবৃত্তি করতে বলতে পারেন, এ কথা হয়তো স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি, তাই বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে বারকয়েক দেখে নিল এবং মনে মনে হয়তো ভেবে নিল যে, 'আবৃত্তি করতে পারি লিখে কি বিপদেই না পড়েছি, এমন জানলে কি লিখতাম।'

ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে আমি আর অনুরোধ করলাম না, কারণ আমি ভালোই জানতাম জড়তা ও লজ্জা না কাটলে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে ও আবৃত্তি করতে

পারবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবৃত্তি করতে গেলে আবৃত্তির ভাব ও বাচনভঙ্গীতে পূর্ণতা আসবে না আর পূর্ণতা না এলে আবৃত্তি শোনবার আনন্দটা মাঠে মারা যাবে। তাই সেদিনের মতো সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলাম।

ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু শিবনাথ অর্থাৎ আমাদের শিবু ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল তাই তাকে নিয়ে কয়েকদিন ধরে আমি মামা, মামা অর্থাৎ সদানন্দ দাস আমাদেরই এক বন্ধু লোকনাথ মণ্ডলের মামা, সেই সুবাদে সকলেরই মামা এবং শক্তি তিনজনে মিলে ডাক্তার, হাসপাতাল, এক্সরে, ব্লাড রিপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা তো দূরে থাক নিজে বসে তাকে কোনো কাজই দিতে পারছিলাম না; তাই কয়েকদিন চারঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে থেকে তাকে চলে যেতে হচ্ছিল।

সেদিনটা ছিল সোমবার, গ্রামের বাড়ি থেকে সোজা দোকানে ফিরেছি, নিজের শরীরাটাও বড় ক্লান্ত তাই আর সকালেই হাসপাতালে না গিয়ে ঠিক করলাম বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে শিবুকে দেখতে যাব। দোকানে ঢুকে চেম্বারের মধ্যে গিয়ে কোট্টা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে বসেছি, এমন সময় মেয়েটি ঘরে ঢুকল, ঘরে ঢুকেই ব্যাগ ও স্কার্ফটা রেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আপনার শরীর কি খারাপ? এত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

আমি জবাবে বললাম, "ও কিছু না দেশ থেকে এসেছি তো, সেইজন্যেই হয়তো ওরকম দেখাচ্ছে!" ও বলল, "আপনি ঠিক জবাব দিচ্ছেন না।"

জানো বৌদি, ওর এই স্পষ্ট-সপ্রতিভ কৈফিয়তের ভঙ্গী দেখে একটু চমকে গিয়েছিলাম এবং বলতে বাধ্য হয়েছিলাম সত্যি কী জন্যে এরকম চেহারার বা মুখ-চোখের হাল হয়েছে। চঞ্চলকে ভেতরে ডেকে হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে কিছু খাবার আনতে নির্দেশ দিয়ে তারপর একে একে সব তার কাছে বললাম। আসলে শিবুর জন্যেই যে মনটা ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং কদিন থেকে ভীষণ মানসিক চাপে ভুগছি সে কথা বুঝিয়ে বলতে ও বলে উঠল, "বুঝলাম।"

ওর এইরকম নির্বিকার 'বুঝলাম' বলার মধ্যেই যেন কিছু না বুঝতে পারার ইশারা ছিল। তাই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, "কী বুঝলেন?"

উত্তরে ও কি বলল জানো বৌদি? ও বলল, "বুঝলাম যে বন্ধুর জন্যে ভেবেই আপনার মুখ-চোখের চেহারা এরকম হয়েছে। কিন্তু এরপর আপনার কিছু হলে ভাববে কে? এইটুকুই শুধু বুঝলাম না।"

ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম এবং বললাম, "ওঃ এই কথা! ভয় নেই, উনচল্লিশ বছর বয়েসের আগে মরব না, সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এই পৃথিবীটাকে জ্বালাবার জন্য আমি আরও পাঁচ-পাঁচটা বছর এখানে আছি।" হ্যাঁ বৌদি, একজন জ্যোতিষী আমার হাত দেখে এরকমই বলেছিল। অবশ্য আমি একথা আদৌ মেনে নিইনি যদিও মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কারণ মানুষের মৃত্যু তো শুধু জীবনটা

শরীরের ভিতর থেকে বের হলেই হয় না, জীবনটা দেহের ভিতর থেকে বের হবার আগেও মানুষের বহুবার মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সে সব অনেক বড় বড় কথা, এ গল্পের সঙ্গে সে সব জুড়লে তুমি ভাববে আমার মাথাটা সত্যি সত্যি বিগড়েছে, এবার আর রাঁচী না পাঠালেই নয়, তাই সে সব তত্ত্ব আলোচনা আপাতত বন্ধ থাক। তার চেয়ে বরং যা বলছিলাম, সেটাই বলি।

আমার এই মৃত্যুর কথা শুনে সে হঠাৎ উঠল, "ওদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত," কারণ ওর হাত দেখে কে নাকি বলেছে ও বিরাশি বছর বাঁচবে। ওর এই কথাগুলি বলার ভঙ্গীটা দেখে মনে হল যেন কোনো সাত-আট বছরের মেয়ে কথা বলছে আমার সামনে। ওর দীর্ঘ জীবনের কথা শুনে বললাম, "তার মানে আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে তাই এত দীর্ঘ জীবন ভোগ করতে হবে।"

আমার কথায় ও হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা করে দৃপ্ত স্বরে বলে উঠল, "জীবন, দুঃখ?" ওর এই দুটি শব্দ উচ্চারণ করার ভঙ্গী শুনেই বুঝলাম কণ্ঠে যেন বিশেষ এক শ্লেষের সুর। চম্‌কে মুখের পানে চেয়ে বললাম, "কেন, মিথ্যে বলেছি!"

সে হঠাৎ সুর বদলিয়ে বলতে শুরু করল, "জীবন কখন শুরু হয়েছে জানি না, তবে জীবন শুরু হতে না হতেই দুঃখ যে দারুণভাবে প্রতি পদক্ষেপকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেঁধে ফেলছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। মনে বল সংগ্রহ করে হাসিমুখে একপা এগিয়ে যেতে চাই তো দুঃখের অকরুণ সেনারা যেন লোহার বেড়ি পড়িয়ে পিছনে টেনে ধরে, দশ পা পিছিয়ে দেয়, কখনও বা তাদের নির্দয় টানে টাল সামলাতে না পেরে শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে হাত-পা ছিঁড়ছে, রক্তে স্নান করে যাচ্ছি।" কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে সে থামল আর আমি মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে চাইতেই কেমন যেন একটা সপ্রতিভ লজ্জায় মুখ নীচু করে নিল। আবার মুখ তুলে নিজেই বলল, "বড্ড বাজে বকি, না?"

তার কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হল যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর হতে অচেনা ও সদ্য আবিষ্কৃত কোনো পাহাড়ি ঝর্না ঝিরঝির করে নৈসর্গিক ছন্দে ঝরে পড়ছে, তাই সে যখন কথা বলছিল তার মুখের উপর থেকে আমার চোখ সরিয়ে নিতে পারিনি। তার চোখে চোখ রেখে আমার হৃদয়ের সমস্ত কোষ অনুকোষকে সজাগ করে তার কথাগুলি গিলছিলাম। তার কথা শেষ হলেও আমার দেখা শেষ হয়নি। আমার সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে অস্বস্তিবোধ করছিল, তাই "কী দেখছেন" বলে মুহূর্তে আমাকে আমার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে শিবুকে নিয়ে বড্ড চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। একজন বড় ডাক্তার তো প্রায় জবাবই দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় শিবু অন্য ডাক্তারের হাতে সুস্থ হয়ে উঠে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এল এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। শিবুর আরোগ্য লাভে আমার মনও বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং দোকানে বেশী করে সময় দিতে লাগলাম সুতরাং মেয়েটির সান্নিধ্যে

বেশ কিছুটা সময়ও কাটতে লাগল। কাজ থাকলে কাজ নয়তো কথা, তো সে সব কথা যে কী কথা তা না বললেও শুধু এইটুকুই তোমাকে বলে রাখি সে যা হোক কিছু বললেই আমার আনন্দ হত তাকে চুপ করে থাকতে বা মুখভার করে বসে থাকতে দেখলে আমার নিজের মনটাও ভারী হয়ে উঠত, অথচ কেন যে এরকমটা হত তার কোনো হদিশই পেতাম না।

কথায় কথায় এটুকু বেশ বুঝেছিলাম মেয়েটি গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্না। তার ব্যবহারে দারিদ্র্যের দীনতা প্রকাশ না পেলেও আত্মমর্যাদার উজ্জ্বল জ্যোতি সব সময় প্রকাশ পেত।

তুমি তো জানোই বৌদি, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা একটু বেশী ভাবপ্রবণ। একে ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে আমি বেশ ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম, বড় হয়ে দিনে দিনে আরও বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম এবং ইদানীং ঐ মেয়েটির সংস্পর্শে এসে ঐ প্রবণতা আরও যেন বেড়ে গেল।

হ্যাঁ এখানে তোমাকে বলে রাখি, মেয়েটির ভালো নাম উর্বী। 'উর্বী' কথাটার শব্দার্থ জানো তো বৌদি? 'উর্বী' কথার শব্দার্থ হল 'পৃথিবী'। আমার নামটা তো তুমি জানোই এবং অর্থটাও তুমি ভালোভাবেই জানো। আমার নাম নিয়ে কত ঠাট্টাই না শুনতে হয়েছে তোমার কাছ থেকে কারণে অকারণে।

আমার নাম 'বিধু' অর্থাৎ চাঁদ। ব্যাপারটা বোঝো। উর্বী পৃথিবী আর আমি চাঁদ অর্থাৎ সৌর জগতের নিয়ম অনুযায়ী আমি পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়ে নিজের কক্ষপথে সব সময় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছি। এতো গেল সৌরলোকের কথা, কিন্তু মাটির উর্বী দিনে দিনে তার মাতৃসুলভ মমতায়, প্রিয়াসুলভ প্রীতিতে, আর ভগ্নীসুলভ স্নেহে আমাকে তার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলো। উর্বী যেন আমার সামনের একটা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু আর আমি সেই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ বৃত্তের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

তোমার বোধহয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে সোজা করেই বলি। উর্বীর কাছাকাছি থাকতে থাকতে আমার সব কবিতায়, গানে তার ছায়া পড়তে লাগল অর্থাৎ তাকে ঘিরেই আমার কবিতা ও গীত রচিত হতে লাগল দিনের পর দিন। এখন আমার কাজই হল রোজ কবিতা লেখা আর তাকে দেখানো ও পড়ানো। তারও যেন নেশা হয়ে গিয়েছিল আমার কবিতার প্রতি। তাই অফিসে ঢুকেই হাতের কাছে কিছু না পেলেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত এবং প্রশ্ন ছুড়ে দিত, "আজ কিছু লেখা আসেনি?" এই 'আসেনি' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, আমার মতো কবি-সাহিত্যিকদের জীবনে। খুলেই বলি শোন তাহলে। যাদের লেখার অভ্যাস আছে চেষ্টা করলে তাঁদের হাতে একটা ভালো প্রবন্ধ বা গল্প বের হয়ে আসে কিন্তু একটা ভালো কবিতা লিখতে গেলে লেখকের অন্তরকে তৈরি থাকতে হয় অত্যন্ত সজাগ হয়ে, কারণ কখন যে দেবী সরস্বতীর দয়া হবে, কখন যে তিনি

হৃদয়ের রক্তকমল আসনে বসে মুখ দিয়ে বাণীর নির্ঝর বইয়ে দেবেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। আর যাঁদের কবি হৃদয় আছে তাঁরা বোঝেন। অনেক সময় এমন হয় শত চেষ্টা করলেও লক্ষ অশ্রুপাত ঘটালেও লেখা আসে না। কবিতা হল সুকোমল অন্তরের উষ্ণপ্রস্রবণ হতে উদগত অগণিত বাণীর বুদবুদ, বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে এই সুকোমল অন্তরই কখনও কখনও হয়ে পড়ে বিদ্রোহী আর তখনই অত্যন্ত সুকোমল মন হতেও নির্গত হয় ফুটন্ত লাভা। তুমি বোধ হয় জানো বৌদি, এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের যত আগুন ঝরানো কবিতা, সুকান্তর যত বিপ্লবাত্মক রচনা।

এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করা ভালো, কারণ আমি কবিতার বিরাট সমালোচক বা বোদ্ধা নই, তাই কবিতা সম্বন্ধে যা লিখেছি ঐটুকুই হয়তো আমার সীমা লঙ্ঘন করা হয়ে গেছে। যাক্ যে প্রসঙ্গ নিয়ে এতক্ষণ চলছিল এবার সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। উর্বীকে ঘিরে অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল সৌধ রচনা। কী অদ্ভুত ব্যাপার জানো, উর্বীর প্রত্যেকটি কথাই আমার অন্তরে কবিতার ঝঙ্কার তুলতে লাগল। মাঝে মাঝে মনে হত উর্বীই যেন আমার অন্তরের আসনে বীণা হাতে নিয়ে বসে আছে। চোখ খুললে উর্বী, চোখ বুজলেও উর্বী। আচ্ছা রাঙা বৌদি বলতে পারো, কেন এমন হয়?

এতদিন শুধু বইতে গল্পই পড়েছিলাম কালিদাসের মালিনী ছিল, চণ্ডিদাসের রামী ছিল, ভাবতাম এসব আবার কী, কবিতা তো নিজস্ব অন্তরের ভাবের পরিস্ফুটন। কাউকে দেখে কি এমন ভাব জাগে, যে ভাবের বন্যায় কবির কাব্যের অমরলোকে ঘটে যায় সৃষ্টির অমৃতময়ী প্লাবন? না বৌদি তোমার কাছে লুকোব না, উর্বীর সঙ্গে রোজকার এই কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎকার আমার কবি-জীবনে নিঃশব্দে এক দারুণ পরিবর্তন এনে দিল। তুমি তো জানো বৌদি, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রেসে দিয়ে থেকে আমার মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল, আর যে কারণে শূন্য হয়ে গিয়েছিল তাও তোমার অজানা নয়, তাই সে কথা উর্বীর সংস্পর্শে না এলে এতদিনে আমি সব হারিয়ে বসে থাকতাম। তুমি তো জানোই, আমার জীবনে কয়েকটা দিনের কৃষ্ণপক্ষকে কেন্দ্র করে আমি গোটা সংসারটার উপর বিদ্রোহ করে নিজেকে সর্বনাশের শেষ ধাপে নিয়ে যাবার জন্য যখন তৈরি হচ্ছিলাম ঠিক সেই সময়েই আকাশে ভোরের শুকতারার মতো আমার জীবন মঞ্চে উর্বীর আবির্ভাব ঘটল।

না বৌদি আজ আর লিখতে বসে মিথ্যা বলব না, উর্বীকে দেখে আমি যেন হারানো মনের জোরটা আবার মাঝে মাঝে ফিরে পেতে লাগলাম, আমি আবার সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠলাম। অন্ধকারে অতলের দিকে ঝুঁকে পড়া আমার মাথাটা আবার যেন ধীরে ধীরে আলোর দিকে উঠতে লাগল। দিশাহারা নাবিকের সামনে হঠাৎ সবুজের সীমা ভেসে উঠলে সে যেমন অধীর আগ্রহে আবার হাতে হাল তুলে নেয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হল। আমার খেয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ বিক্ষোভের

মাঝখান থেকে পুনরায় ছায়া নিবিড় তীরে ভিড়ল। সমুদ্রের বালুতটে নেমে আমি যেন আবার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করলাম।

তুমি তো বুঝতেই পারছ, আমার মনের গতি কবির মনের গতি, এ গতি কোন বাধা মানে না, ভয় জানে না, লজ্জা জানে না, শুধু জানে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে। তাই আমার কবিতার গতি যত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হল, আমার মনের গতিও ততই উর্বীর দিকে দ্রুত ধাবিত হতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে নিজেকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলাম, ভয়, পাছে আবার আমার অন্তরের উষ্ণ প্রবাহ যদি হঠাৎ থেমে যায়! ফল হল উল্টো, উর্বী দুলতে লাগল সন্দেহের দোলায়।

হ্যাঁ ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে, প্রেস থেকে যেদিন আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হাতে এল, সেদিন বাবার ছবিতে মালা দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে ছবির কাছে কয়েকখানা বই নামিয়ে রেখে প্রণাম করলাম, কারণ বইখানা স্বর্গত বাবাকেই উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করেছিলাম। বাবা আজ নাগালের বাইরে বলে আমাকে ঐ ভাবেই সান্ত্বনা পেতে হল। সকাল থেকেই সেদিন মনটা ভারী হয়েছিল তাই বইগুলো বাবার ছবির কাছে নামিয়ে প্রণাম করে আর মুখ তুলতে পারলাম না, সেইখানেই কেঁদে ফেললাম। উর্বীও ছিল ঘরের ভিতর, দেখেশুনে ও খুবই ঘাবড়ে গেল। একে পুরুষ মানুষ তারপর অকারণে ঐ কান্না। ও প্রথমটায় মোটেই বুঝতে পারেনি, পবে আমাকে প্রশ্ন করে জেনেছিল ব্যাপারটা কী হয়েছিল।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। মন ছুটছিল দুরন্ত গতিতে উর্বীর দিকে সব সীমানা লঙঘন করে, কিন্তু আগেই বলেছি উর্বী অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না বাস্তবানুগা, তাই আমার গতি যত দ্রুত হতে লাগল ওর চোখে মুখে ঝরে পড়তে লাগল তত করুণা মাখা মমতা। যদিও আমার মা নেই তবুও আমি অনেক সময়েই অনেক মায়ের চোখ মুখ থেকে ঐরকম সর্বদ্রাবী করুণামাখা মমতা ঝরে পড়তে দেখেছি। অনেক আগেই বলেছি যে উর্বীর মুখ হতে প্রথম থেকেই ঐরকম একটা আলোর রেখা এসে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দেউলকে আলোকিত করেছিল তাই সেই সর্বদ্রাবী আলোয় আমার মনের সুপ্ত কামনা বাসনারা সব গলে যেতে লাগল। আমি দিনে দিনে মানুষ হতে লাগলাম।

দেখেছ বলতে ভুলে গেছি, ইতিমধ্যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে একদিন উর্বীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাদের কাছে পেয়ে ওর বাবা, মা, দাদা, বৌদি, সবারই মুখ আনন্দে উচ্ছল হয়ে পড়েছিল আর উর্বীও যে ভিতরে ভিতরে কত খুশী হয়েছিল তা ওর তখনকার মুখখানা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। সকলের দৃষ্টি এড়ালেও আমার দৃষ্টিকে কিন্তু উর্বী ফাঁকি দিতে পারেনি, কারণ ইতিমধ্যে সাত সাতটা মাস উর্বীর পাশে বসে তার মুখের প্রতিটি ভঙ্গী, তার ভ্রূর প্রতিটি কুঞ্চন, তার হাসির প্রতিটি ছন্দ আমার অত্যন্ত চেনা হয়ে গিয়েছিল।

সুস্মিতাও খুব প্রাণোচ্ছল। তাই সেদিন আষাঢ়ের বিকেলে দুই ছন্দময়ী ঝর্নার মাঝখানে

পড়ে আমার অবস্থা বেশ অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাদের দুজনের প্রাণ-চাঞ্চল্য ও হুড়োহুড়ি দেখে মনে হয়েছিল পাশাপাশি বয়ে যাওয়া দুটি নদীর মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেছে, কে বেশী প্রাণচঞ্চলা সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য। জানো বৌদি আমার কিন্তু বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি যে, তরঙ্গের ধারা দুটি হলেও গতি এক। বিশ্বাস কর বৌদি অনেকদিন এমনটি দেখিনি, তাই কয়েক মিনিটের জন্য প্রাণভরে ওদের দেখে নিয়েছিলাম। ওদের দেখে তখন মনে ইচ্ছে জাগছিল আমিও ওদের হুড়োহুড়িতে যোগ দিই। কিন্তু বয়সটা চৌত্রিশ তাই চিন্তাটা চিন্তাই থেকে গিয়েছিল।

যেদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিনটা ছিল রবিবার। তার পরের দিন অর্থাৎ সোমবার সকালে উর্বী অফিসে এসে হাতের কাজগুলো সেরে নিয়ে ইন্টারকমে আমায় ডাকলে ভিতরে গেলাম। আমি যেতেই হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে নিল যে আগের দিন ফিরতে রাত হয়েছিল বা রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়েছিল কিনা। আমি জবাবে বললাম, অনেকদিনের জমে থাকা অনেক কষ্ট গতকাল সন্ধ্যায় বালীগঞ্জে রেখে এসেছি। অর্থাৎ তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, কোনো কষ্টতো হয়ইনি বরং গতকাল সন্ধ্যাটা আমাদের বেশ ভালোই কেটেছে। আমার কথা শুনে উর্বী হাসতে হাসতে মুখ নীচু করল।

এবার আমার প্রশ্নের পালা, আমি প্রশ্ন করলাম, "খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পড়ায় আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো?"

সে বলল "অসুবিধে কিসের? বা.....রে, অসুবিধা হতে যাবে কেন?" বলেই আরও বলল, "জানেন বাবার আপনাকে খুব ভালো লেগেছে, আর বৌদিকে সব্বার", অর্থাৎ বুঝতেই পারছ বৌদি, সুস্মিতার কাছে আমি হেরে গেলাম। কিন্তু এই হেরে যাওয়াটা যেহেতু পরোক্ষে আমাব জিতে যাওয়া তাই উর্বীর কথায় হেসে ফেললাম, কারণ এই হেরে যাওয়াটায় দুঃখের কিছু নেই, যে জিতেছে সে সুস্মিতা অর্থাৎ আমারই স্ত্রী। উর্বীর ঐ কথা শুনে দুঃখের বদলে ভিতরে ভিতরে বরং গর্বই অনুভব করলাম। এরপর আরও কিছু টুকিটাকি কথার পর তিনটে বাজতেই উর্বী উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য আর আমি দরজাটা আগলে তাকে বাধা দিলাম, বললাম, "আর একটু বসুন না?" সে বলল "বাঃ রে, আমার বুঝি দেরি হয়ে যাবে না?" আমার চোখে কিন্তু তখন আগের দিনের সন্ধ্যার ছবিখানা পুরোপুরি ভাসছে তাই তক্ষুণি উর্বীকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না, কিন্তু ওর ওই কথার সঙ্গে দীঘল দুটি চোখ থেকে এমন করুণামাখা মিনতি ঝরে পড়ল যে আমি আর না বলতে পারলাম না, উর্বী চলে গেল।

প্রত্যেকদিনই উর্বী চলে যাওয়ার সময় আমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়তাম এবং মুখের চেহারাটা পাল্টে যেত। এ নিয়ে উর্বীও অনুযোগ করত, কিন্তু কেন যে এমন হতো তা ওকে ঠিক বোঝাতে পারতাম না। ও সামনে থেকে চলে গেলে আমার মায়ের চোখ দুটো হারিয়ে যেত, কারণ ওর চোখে আমি আমার স্বর্গতা মায়ের চোখ দেখতাম। আমার এভাব লক্ষ্য করে উর্বী একদিন প্রশ্ন করেছিল, "আপনি অমন

করে আমার চোখের দিকে চেয়ে কী দেখেন?" এ প্রশ্নের আমি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারিনি, কারণ মনে ভয় ছিল যে একজন সাধারণ অপ্রতিষ্ঠাতা কোনো মেয়ের চোখে একজন প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ছেলে যদি তার মায়ের চোখ দেখে ও সত্যি কথাটা বলেও তাহলে হয়তো মেয়েটির কাছে কথাটা উপহাসের মতোই শোনাবে, তাই তার ঐ প্রশ্নের জবাবটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কখনও কখনও আমার উর্বীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা হতো কিন্তু অসাবধানতা বশত ওর হাতে হাত ঠেকে গেলে কিংবা গায়ে গা ঠেকে গেলে ও এমন বিচলিত বোধ করত এবং এত অস্থির হয়ে পড়ত যে আর পায়ে হাত ঠেকাবার কল্পনাটা মাথায় এলেও বাইরে তার রূপ দিতে সাহস হতো না।

বলতে পারো রাঙাবৌদি আমার মনের এ কেমন দুর্বোধ্য গতি! আমার মনের মনস্তত্ত্বের একি ধরনের বিস্তার বা প্রসার?

আমি অন্তরে কবি বা কল্পনাপ্রবণ হলেও বাইরের জগত সম্বন্ধে তো উদাসীন নই আস্থাহীনও নই, সুতরাং উর্বীকে নিয়ে আমার এই ভাবপ্রবণতা সম্বন্ধে বাইরের লোক এবং আমার ঘরের লোক অর্থাৎ আমার স্ত্রী কী ভাবছে বা ভাবতে পারে সে সম্বন্ধে আমি নির্লিপ্ত নই, তাই মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার আশপাশের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে উর্বীকে জড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে গল্প করে তাদের মনস্তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করেছি এবং তাদের মুখের হাসি ও কথা বলবার ধরণ দেখে বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয়নি তারা কী বলতে চায়। তারা যাইই বলুক তাদের কথায় আমি আপন মনে শুধু হেসেছি কিন্তু সুস্মিতার কাছে প্রচ্ছন্ন কথার ফাঁকে তার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যা শুনেছি তা খুব স্পষ্ট করেই সে আমায় শুনিয়েছে এবং তার প্রতি কথার আড়ালে আমার একটা কথাই ঘুরপাক খেয়ে মরেছে যে, 'নারী তুমি মহিয়সী, নারী তুমি চিরকালের মনোরমা।'

জানো বৌদি আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি পৃথিবীতে দুটি লোককেই সম্ভ্রমের সঙ্গে ভয় করে চলতাম, তাঁরা হলেন আমার জামাইবাবু অরূপেশবাবু এবং আমার স্ত্রী। এর অনেক কারণ ছিল, জামাইবাবু সম্বন্ধে কিছু বলবার স্পর্ধা আমার কোনো দিনই নেই। শুধু এইটুকুই জেনে রাখো আজকালকার দুনিয়ায় এই রকম সদাশিব, নির্লোভ অথচ প্রাণচঞ্চল মানুষ লাখে একটা দেখা যায় কিনা সন্দেহ আছে। জামাইবাবুর বাইরের চেহারাটাও যত সুন্দর, অন্তরের অন্দরমহলটাও তেমনি কোহিনূরের মতো উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে যে আমার দিদির মতো একজন সাধারণ মেয়ে জামাইবাবুর মতো একজন দেবতুল্য মানুষের হৃদয়ের ময়ূর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হবার মতো যোগ্যতা কোথা থেকে পেল। এ নিশ্চয়ই তোমাদের ঐ ঈশ্বর নামক অপদেবতারই শুভাশিষ। আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো! ঈশ্বর নামক অদৃশ্য ঐ ভদ্রলোকটির যার উপর সুদৃষ্টি থাকে তার বুঝি এইরকমই প্রাপ্তি-যোগ ঘটে। আমার দিদিকে এদিক দিয়ে চরম ভাগ্যবতীও বলতে পারো।

এক কথায় আমার জামাইবাবু আমার হৃদয়েও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে বসে আছেন।

এবার আসি সুস্মিতার কথায়। তোমায় আগেই বলেছি সুস্মিতা খুব প্রাণোচ্ছল। হ্যাঁ রাঙাবৌদি ও সব সময় সুউচ্চ গিরি শৃঙ্গ হতে ঝরে পড়া শ্রাবণ-দিনের ঝর্নার মতো। ওর প্রাণ-প্রবাহের তরঙ্গের মধ্যে আমি উড়ে পড়া শুষ্ক পত্রের মতো সতত ভাসমান। ওর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে আমি কখনও ডুবি আবার কখনও ভাসি। হ্যাঁ, ওইই আমায় বুকে করে ভাসিয়ে তোলে। তুমি তো জানোই, আমি একটু ধীর স্থির প্রকৃতির, কিন্তু আমার প্রাণে যখন কেউ জোয়ারের ঢেউ লাগায় তখন আমিও কিছু কম যাই না। হ্যাঁ, তোমার দেবরটির এই স্বভাবটির এখনও কিন্তু অপমৃত্যু ঘটেনি, তাই মাঝে মাঝে ঐরকম জোয়ারের আশায় আমার অন্তরের প্রবহমান শান্ত শীতল স্রোত উদ্বেলাকুল হয়ে থাকে, বাইরের জোয়ারের ঠেলাব আশায়। ঠিক সময়ে যদি ঠিক স্রোত এসে ধাক্কা দিতে পারে তবে আমি আজও সেই কিশোর বয়সের মতোই দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করে বুঝিয়ে দিই যে আমিও সমান সজীব, সমান, সবুজ ও অবুঝ, আমার এই প্রকৃতির জন্য আমার গুরুজনেরা মাঝে মাঝে বলে বসেন, "তুই কি এখনও ছোট আছিস?" জানো বৌদি তাঁদের কথার টানে টান মিলিয়ে আমার হৃদয় সত্যিই ছোটছেলে হতে চায় কিন্তু জাগতিক নিয়মে মানুষের জীবনে বয়সটাতো আর কমে না বরং ধীরে ধীরে পলে পলে মৃত্যুর দিকে তথা হয়তো অন্য এক জীবনের দিকেই এগিয়ে যায়।

আমি বুঝি সুস্মিতার অন্তরের তারল্য তার বাইরের সারল্য তখন কীরূপে, কী ভাবে আমায় দেখতে চায়, কিন্তু তুমি বলনা সংসারের সকলের সব আব্দার সব আগ্রহ কি আমরা সব সময় মেটাতে পারি? তা আমরা পারি না। আমাদের ইচ্ছা মতো তা যদি আমরা মেটাতে পারতাম তাহলে তো এই বিশ্ব সংসারে অসন্তুষ্টি জনিত কোনো অশান্তিই থাকত না।

এই যাঃ, দেখেছো আবার ভুলে বসে আছি যে তুমি আমার গুরুজন এবং প্রণম্যা, সুতরাং তোমাকে জ্ঞান দেওয়া আমার আদৌ উচিত নয়। কী করব বল লিখতে লিখতে লেখার টানে ওটুকু লিখে ফেলেছি এর জন্য স্বগুণে মার্জনা করে দিও।

আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? মনে হয় ভারতবর্ষের বিশেষ করে এই পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষগুলো দিন দিন জীবনের টানাপোড়েনে পড়ে কেমন হয়ে যাচ্ছে। মজুতদারী ও মুনাফাবাজীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দু-বেলা অন্নের সংস্থান করতে গিয়ে প্রায় সকলেই আজ জীবন হতে আনন্দ-উৎসব হাসি বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। তবে বছরের মধ্যে কয়েকটা দিন যেমন ধর দুর্গাপূজার কয়েকটা দিন বা ঐরকম কোনো সার্বজনীন আনন্দানুষ্ঠানের সময় কয়েকটা দিন এরা শুধু নিজেকে পেষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত ভেবে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলেমিশে হেসে গেয়ে সব ভুলতে চায়, কিন্তু ভুলতে পারে কি? পারে না। দেওয়ালীর রাত কাটলে আবার যে কে সেইই।

কোথায় রংমশালের আলোর বন্যার মত হাসি। কোথায় তুবড়ির আগুনের ফুলকির মতো টুকরো টুকরো সুখের ফুলকি। সব হারিয়ে যায়।

তাছাড়া ইদানীং কয়েকবছর দেখা যাচ্ছে এই পূজা পার্বণের মতো পবিত্র অনুষ্ঠানের নামে চাঁদার বিল হাতে করে দেবদেবীর নামে যা কার্যকলাপ সময়ে সময়ে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে সেগুলো সমাজের পক্ষে এবং প্রতিটি সুস্থ চেতনা সম্পন্ন নাগরিকের কাছেই লজ্জা এবং ন্যক্কারজনক। এই সমস্ত চাঁদা আদায়কারী ভদ্রবেশী কিছু তরুণ দরজায় যখন আঘাত করে, মাসীমা, পিসিমা বা কাকাবাবু, মেসোমশাই বলে ডাকে, তখন এদের গলার স্বর অতি সমধুর এবং প্রায় কোকিলের স্বরের মতোই থাকে কিন্তু যেই তুমি দরজা খুললে আর তোমার হাতে তুলে দেওয়া চাঁদার বিলের পাতায় লেখা টাকার অঙ্ক দেখে আঁতকে উঠে বললে, "এত দিতে পারব না," তখনই আরম্ভ হয়ে যায় কুকুর-কীর্তন, অর্থাৎ তখন তথাকথিত মাসীমা, পিসিমা, কাকাবাবু বা মেসোমশায়দের এমন পর্যায়ে নামানো হয় যে সেইগুলি আলোচনা করবার মতো জায়গা কোনো বইয়ে না হওয়াই শ্রেয়।

জানো বৌদি এই চাঁদা আদায় করতে গিয়ে, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে অক্ষমতা জানানোয় আমার পরিচিতা মাতৃস্থানীয়া কোনো এক সেবিকাকে একদল ছেলে আমার সামনেই যা বলেছিল তা কোনোমতেই বইয়ে লেখা উচিত নয়। তবুও না লিখে পারছি না এই কারণে, যে এতে সমাজের অধোগতিটা আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে বুঝতে তোমার বিশেষ সুবিধা হবে। এই সমাজেই তুমি আমি সকলে বাস করছি। এবার শোন সেই পশুবৎ উরভ্র-কূল মাতৃস্থানীয়া ভদ্রমহিলাকে কী বলেছিল। তারা বলেছিল, "আরে তোমার আবার টাকার ভাবনা কি? তোমার সিন্দুক তো তোমার অঙ্গাবরণের নীচেই রয়েছে। মাঝে মাঝে এক আধবার করে আচ্ছাদন তুললেই তো টাকার তোড়া..." আরও কী কী তারা বলেছিল আমি শুনিনি, কারণ শোনবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না, শুধু এইটুকু শুনেই তাঁর হাতদুটো ধরে তাঁকে ঘরে টেনে এনে ঘরটায় খিল তুলে দিয়েছিলাম আমি, তারপর দরজায় লাথি, ইট না জানি কত কী পড়েছিল এবং যে সমস্ত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলো কোনো অভিধানে আছে কিনা আমার জানা নেই। ঐ বাড়িতে তিনি ছাড়া কিন্তু আরও দশ-বারো ঘর ভাড়াটে ছিল, তারা কেউ কিন্তু টু-শব্দটি করেনি তাঁর ঐ অবস্থা দেখেও। শেষে দরজার বাইরে থেকেই বীরপুরুষের দল অর্থাৎ দেবীর চেলারা বলে গেল শুনলাম, "আচ্ছা কাল সকালে তো বেরোতেই হবে, হাসপাতালে যেতে হবে, তখন দেখা যাবে, তখন এমন দাওয়াই ঝাড়ব যে হাসপাতল থেকে আর ফিরতে হবে না......" ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেবে অবাক হতে হয় এই সমস্ত মেষশাবকগুলি অসুস্থ অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে যখন দেবীসমা এই সেবিকাদের পায়ের নীচে গিয়ে পড়ে তখন এরাই রাতের পর রাত জেগে মায়ের মমতা, ভগ্নীর মতো প্রীতি দিয়ে এই জানোয়ারগুলোকে সুস্থ ও সতেজ করে তোলেন।

এছাড়াও শুনবে বৌদি? আরো একটা ঘটনার কথা বলি শোন। আমার এক বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বন্ধু বছর তিনেক হল কলকাতার নানারকম বিভ্রান্তিকর অশান্ত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে কলকাতার কাছেই সভ্যতার ও সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরপাড়ার শান্তিনগরে চলে গেছেন সামান্য একটু শান্তির আশায়। তাঁর বাড়িতে গত বছর দুর্গাপূজার ঠিক প্রাক্কালে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটার সময় দুটি ছেলে একেবারে তাঁর বেডরুমে যেখানে আমি ও কবি বন্ধুটি এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সভ্য-সভ্যারাও বসে টেলিভিশন দেখছিলাম সেখানে ঢুকে গেছে চাঁদার জন্যে। একেবারে অপরিচিত কেউ বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঢুকে পড়লে স্বভাবতই যে কোনো ভদ্রলোকের মেজাজ বিগড়ে যাবে। কবি বন্ধুও তাই তাদের চলে যেতে বলে বললেন। "আজ আর আপনাদের কাছে কিছু শুনব না, আগামীকাল দিনের বেলায় আসুন।" জানো বৌদি সামান্য এই কটা কথা বলার পর কী অবস্থা? বন্ধুটির লোহার গেটে ইট নিয়ে, ডান্ডা দিয়ে ঠোকাঠুকি, লাথি, ঘুঁষি আর সঙ্গে সঙ্গে অভিধান বহির্ভূত অকথ্য ভাষায় গালাগালি, কেউ বলে, "আমি অমুক কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ অফিসার, কেউ বলে, "আমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র", কেউ বলে, "আমি অমুক কেউকেটা.........." ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের এই সমস্ত কথাবার্তায় কবি বন্ধুটি মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেও আমি বুঝতে পারছিলাম বন্ধুটির সব হুঙ্কারই এক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে, কারণ ঐ সমস্ত অফিসারের তকমা বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তকমাওয়ালারা তখনকার মতো শুধুই চাঁদার ভিখারী এবং অস্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী, তা না হলে নিজেরই এলাকার কোনো গুণী লোককে নিয়ে কেউই এরকম করে না।

যাই হোক এতো গেল দুটো সামান্য ঘটনার কথা। কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে পুজোর নামে আজকাল এরকম কত অজস্র ঘটনা যে সুস্থ সামাজিক জীবনে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে দুষ্ট উপদংশেরই সৃষ্টি করছে সে কথা আজ কে না জানে।

অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যা ছিল বাঙালির একান্ত নিজস্ব, পবিত্র সম্পদ তার দিকে কিছু অবাঙালি নিম্নস্তরের কিশোর ও যুবকেরাও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নেমে পড়েছে আর তাদের ঐ সমস্ত ব্যাপারগুলোকে উৎসাহ দিতে পুজো উদ্বোধন করে বেড়াচ্ছি আমরা বাঙালি মন্ত্রী এম. এল.-এর দল। ফিতে কাটবার আগে আমরা একবারও ভাবছি না, এই কাটা ফিতে অনতিকাল বিলম্বে অতি নির্মমভাবে ...স্থু দেহধারী সর্প হয়ে ছাপোষা বাঙালিগুলোরই পায়ে জড়াবে।

জানো বৌদি, এইসব কারণে আর পুজোর প্রাক্কালে এবং পুজোর সময় লোকের মুখে স্বচ্ছ সবুজ হাসি ফোটে না বরং অন্তরের আকাশে উদয় হয় চিন্তার কালো মেঘ, উৎপাদিত হয় ভয়ের বিদ্যুৎ চমক। তাই আজকের পুজো পার্বণের দিনে সাধারণ গৃহস্থকে বেড়াতে যাবার নাম করে খুঁজে বেড়াতে হয় লুকোবার জায়গা অথবা

সহ্য করতে হয় অকথ্য গালিগালাজ ও অত্যন্ত অপ্রীতিকর অসামাজিক ব্যবহার। আবার এই সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে মাইকের মধ্যে থেকে অনেক সময়েই পল্লীর মাতব্বর জুলপি সম্প্রদায়ভুক্ত যৌবনের বিশেষ কোনো দূতের মারফত ঘন ঘন ঘোষণা করা হয় যে সেই পুজোর কর্মকর্তারা বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতিময় কী সব কাজ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করা হয়, যথা আমরা এত বস্ত্র বিতরণ করেছি, এত দরিদ্র নারায়ণ সেবা করেছি... ইত্যাদি ... ইত্যাদি। কাপড় দেওয়া হয়েছে যেখানে মাত্র বিশখানা সেখানে ঘোষণা করা হয় দুই শত বিশখানার, দরিদ্র নারায়ণ সেবা করানো অর্থাৎ রাস্তার কিছু ভিখারী হয়তো পঞ্চাশ বা একশো জন খাইয়ে তাও কী খাইয়ে না, আধ সিদ্ধ চালে ডালে অথবা ধরাপোড়া চালে-ডালে খাইয়ে ঘোষণা করা হয় আমরা বারশো দরিদ্র সেবা করিয়েছি। আসলে দরিদ্র সেবা বা বস্ত্রদান হবে কী করে? দরিদ্রসেবা বা বস্ত্রদান হলে ঠিক পুজোর পরেই শীতের মরশুমে পাড়ার টেঁপী, বুঁচিদের নিয়ে প্লেজার ট্রিপে যাওয়া হয়ে ওঠে না। তাছাড়া সারাবছরের হাত খরচের টাকার অঙ্কও কম নয়, সুতরাং সবদিক বিবেচনা করেই পুজোগুলো অর্থাৎ পুজোর দ্রব্য সামগ্রী বা আচার অনুষ্ঠানগুলো নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হয়, এমনকি চারদিন ধরে পুরোহিত নামক যে ভদ্রলোককে উপবাসে রেখে কাজ করিয়ে নেওয়া হয় তাদের বেশিরভাগেরই হাতে সর্বসাকুল্যে একশো টাকাও ওঠে কিনা সন্দেহ।

আমি এমন পুজোও জানি যেখানে বাজেট হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কিন্তু পুরোহিত চারদিনের পুজোর জন্য পেয়ে থাকেন মাত্র চারখানা ধুতি, দু-খানি গামছা, আর মোট পঁচাশিটি টাকা। মাঝে বছর দুয়েক আগে পুরোহিত ভদ্রলোক বিদ্রোহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন অন্তত শ-দেড়েক টাকা না দিলে তিনি পূজা করতে পারবেন না কারণ তিনি কলকাতার এক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করতে গিয়ে তাঁর প্রচুর পরিশ্রম এবং শারীরিক ক্লেশও হয় তাই দক্ষিণার অঙ্ক বাড়াতে বলেছিলেন। তার ফল হয়েছিল কী শুনবে? ফল হয়েছিল, সকালে পুরোহিতের বাড়ির কাছাকাছি যে দুধের ডিপো থেকে দুধ আনাতেন সেখানে পালা করে বেশ দিন কয়েক পাড়ার যৌবনের দূতেরা পাহারা দিয়ে পুরোহিতের বাচ্চা চাকরের কাছ থেকে দুধ কেড়ে নিয়ে খেয়ে দিতে লাগল এবং পুরোহিতের বাড়ির মেয়েদের রাস্তায় বেরোন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল টিট্‌কারী, টিপ্পনী আর সিটিবাজীর চোটে। অগত্যা অধ্যাপক পুরোহিতকে ঐ পঁচাশি টাকাতেই ঘাড় নীচু করে আজও পুজো করতে হচ্ছে। মাঝখানে ভদ্রলোকটি ঐ পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় যাবেন বলে স্থির করেছিলেন এবং বেশ উঠে পড়ে বাড়ি খুঁজতেও লেগেছিলেন কিন্তু কলকাতা এমনই একটি আজব শহর যে মধ্যবিত্ত মানুষ চট্ করে মত বা পথ পাল্টে একটু যে ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করবে তার উপায় কোথায়? বাড়ি খুঁজলেই কী আর পাওয়া যায়?

যা-ও-পাওয়া যায় তাও কি আর নাগালের মধ্যে হয়? বাধ্য হয়ে তাই আর যাবার চেষ্টা করেননি। যে চেষ্টা করেছিলেন তার জন্যেই কত হাড়জ্বলানো টীকা-টিপ্পনী যে আজও শুনতে হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। আসলে আজকাল পূজার নামে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের শ্রবণমূলে গলিত সীসা পরিবেশন আর ও পাড়ার সে পাড়ার পূজার প্যাণ্ডেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপড়ের বা অন্য সব জিনিস দিয়ে তৈরি হাইকোর্ট বা আইফেল টাওয়ার বা তাজমহল বানানোর কম্পিটিশিন। অথচ বছরে এই পশ্চিমবাংলায় পূজাবাবদ যে কোটি কোটি টাকা উড়ে যায় সেই টাকাগুলো দিয়ে গঠনমূলক কাজ করলে হয়তো টি.ভি.এস গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্ট্রির মতো বেশ কয়েকটা ইন্ডাষ্ট্রি হয়ে যেত এবং তাতে হাজার হাজার বাঙালি ছেলে চাকরি পেয়ে বর্ত্তে যেত।

আসল ব্যাপার হল যৌথ পরিবারে যখন ভাঙন ধরে তখন এক হাতা দুধ বা এক চামচ ডাল কার পাতে বেশী আর কার পাতে কম পড়ল এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়, হয়তো ঐ জোলো দুধ বা ডালের জন্যেই একটা সোনার সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে ছারখার হয়ে যায় এবং যারা এই সমস্ত কারণে সংসার ছারখার করে নিজে ভালো থাকব বা ভালো খাব এই আশায়, তারা একবারও পিছন দিকে চেয়ে দেখে না যে তাদেরই কত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সংসারটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছিল, কারণ তাদের অন্তরে বাইরে তখন ভাঙনের নেশা, তেমনি আমাদের এবঙ্গের বাঙালি জাতটারও আজ সেই অবস্থা। তাদের যেন আজ কেউ ভাঙনের বা ধ্বংসের উন্মাদনা জাগানো কোনো মদ খাইয়ে দিয়েছে, আর সেই মদের নেশায় সবাই নেশাগ্রস্ত হয়ে নিজের হাতেই ঘরের সামগ্রী অর্থাৎ শান্তি, স্বস্তি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব চুরমার করে ফেলছে। পূজ্যজনের কোনো সদুপোদেশ বা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কোনো ভবিষ্য-বাণীই আজ আর কারও কানে ঢুকছে না। এই রকমই হয়, আফিং খেয়ে যার মৌতাত আসে ধীরে ধীরে সে আফিং-এর পরিমাণ বাড়িয়েই চলে আর ঐ পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতেই একদিন মৃত্যুর কাছে জীবনকে তুলে দেয় নিজের হাতে। আমরা এ বাংলাব বাঙালি সম্প্রদায়ও আজ তাই নিজেদের সবকিছু নিয়েই ছিনিমিন খেলছি। এ বাংলায় পূজার প্যান্ডেলে মাইকে হিন্দি-গানের ছড়াছড়ি আর ও বাংলায় দেখ এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রসংগীত বাজানোর স্বাধীনতার জন্য কত কান্ডই না হয়ে গেল। আসলে আমরা এ বাংলার বাঙালিরা চোখ-কান-নাক সব বন্ধ করে এক একজন এক একটি বিরাট সাধু সেজে বসে আছি শান্তির পরম দূত হয়ে এবং গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি। একবারও ভাবছি না এই বিষাক্ত ঘন নীল শেষ পর্যন্ত অকূল সাগরে নিয়ে গিয়ে যখন ফেলবে তখন ঐ বিষ সলিল পেটে ঢুকে একবার "বাঁচাও" বলে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে কোন অতলে তলিয়ে যাব।

জানো বৌদি, আজকের এই চারদিকের অন্ধতার মধ্যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের

কথা বড্ড মনে পড়ছে, যে জ্যোতিষ্ক পার্থিব সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সুদূর প্রবাসে গিয়েও ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য, ভারতবাসীর সম্মানের জন্য জীবনপণ করেছিলেন। ঐরকম ক্ষাত্রবীর্যে বলীয়ান পুরুষ কি এ বাংলায় আর একটিও জন্মাবে না? কিন্তু না জন্মালে যে আর রেহাই নেই আমাদের। আর কতদিন ভগবান আমাদের অপেক্ষা করতে বলবেন।

মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে নেতাজীর ছবির সামনে একা একা বসে কতদিন আমার বাংলা মায়ের কাছে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো জানিয়েছি ....

মাগো,
আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও মা,
আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও,
আর তা যদি না পার, তবে
জবাব দাও, আজ জবাব দাও—
তুমি শহীদ ক্ষুদিরামের মা,
মাগো তুমিই বল, বোবা ভাষা
নিয়ে কত কাল আর আমরা
ঠোঁট নাড়ব? দুচোখ ভরা
অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে কতকাল আর আমরা
পথের দিকে চেয়ে থাকব?
তুমি বিনয়-বাদল-দিনেশের মা,
তুমিই বল কত যুগ আর এই
ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেব আমরা?
কত কাল আর কত কাল এই
মিঠা বাক্যের শৈত্য-প্রবাহ বইয়ে
দিকে দিগন্তরে আশার কুয়াশা
ছড়াবে ভণ্ড তপস্বীর দল—
ঐ.....ঐ.....ঐ..... ও.....ও.....রা?
কত যুগ তো কেটে গেল মা,
স্বর্ণসিংহাসনে বসে' বাক্যের
ঐ সচল দেবতারা তবুতো অচল
অনড় পাথর কেন হয় না মা?
তুমি সূর্য সেনের মা—
একদিন ঐ সূর্যের তীব্র উজ্জ্বল
আলোকচ্ছটায় তোমার বুক

আলোকিত হয়ে হেসে উঠেছিল ;
আর আজ শত-সহস্র জালিম
সূর্যের দল বস্তু-পৃথিবী হ'তে
বহু যোজন দূরে আরামের
ঘন নীল আকাশ হতে নিয়ত
ছড়িয়ে চলেছে লোভার্ত আবিল
শ্যেন দৃষ্টি, যে-দৃষ্টিতে ঝরে'
পড়ছে তোমারই বুকের রত্নহারের
মণিমুক্তা হরণের তীব্র মদির
ইশারা; বলতে পার মা,
এদের বাঁচবার কি অধিকার আছে,
যারা বাঁচাতে পারে না আমার
মতো ক্ষুধাতুর তৃষাতুর কয়েকটা
মানুষকে ?

মাগো ওদেব গগনচুম্বী লোভের
লেলিহান শিখা যে আজ
তোমারও কেশাগ্র স্পর্শ করেছে।
ঐ অগ্নিশিখার স্পর্শে তুমি
উন্মাদিনী হয়ে ওঠো মা ;
উন্মদিনী হয়ে ওঠো।

মাগো, এইতো কটা বছর আগে
ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল দিনেশ
তাদের তরুণ বুকের তরতাজা
রক্তে তোমার পায়ে আলতা
পরিয়ে দিয়ে গেল। তাদের
হৃদয়কমলের পাপড়ি ছড়িয়ে
তোমার পূজা সমাপন করে' গেল।
এরই মধ্যে কি তুমি তাদের ভুলে'
গেলে মা? ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল,
দিনেশের মতো সন্তান গর্ভে ধরতে
আর কি তোমার সাধ হয় না মা???

আর একবার, মাত্র একটি বার
তুমি রত্নগর্ভা হও মা, আর
একবার তুমি রত্নগর্ভা হও।
আর তা যদি না পার তবে
একবার তুমি ভৈরব ছন্দে নেচে ওঠ মা,
একবার উন্মাদিনী বেশে
তোমার উন্মাদ রব তোল, যে-রবে
ডুবে' যাক এ দেশের ভীরু
মাতৃ-পূজারীদের যত ব্যর্থ কলরব ;
তাও যদি না পার তবে
তোমার দু'নয়নের প্রজ্জ্বলিত লেলিহান
লাল অগ্নিতে দিকে-দিকে আগুন
ছড়াও আর সেই আগুনে পুড়িয়ে
আমাদের ঘুম পাড়াও—
আমাদের ঘুম পাড়াও।

এই যাঃ, দেখেছ কি ভুলো মন? আবার কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। নাঃ আর না। এইসব নানারকম চোখের উপর দেখে-শুনেও আমি কিন্তু একদম এদের অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের বিষাদ সেনাদের আমার হৃদয় রাজ্যের পরিখা অতিক্রম করতে দিই না। বলতে পার খানিকটা অন্তর থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলে উঠি, "তফাৎ যাও, সব ঝুঠ হ্যায়"। বাইরে আমার চারিদিকে যখন অভাবের-অনটনের রৌদ্রতেজে সুখের একবিন্দু বারিকণা নেই, এই অনাবৃষ্টির জন্য যখন চারিদিকে শুধু ধু ধু মরু এই হতভাগাটার মুখে তখনও হাসি লেগে থাকে, হৃদয়ের একপ্রান্তে তখনও খানিকটা সবুজের সমারোহ জেগে থাকে, কারণ ঐ ওয়েসিসটুকু না থাকলে বাঁচব কী করে বল? হ্যাঁ, আর ঐ মরুদ্যানটুকু বাঁচিয়ে রাখবার মূলে কিন্তু সুস্মিতার অক্লান্ত ও প্রাণপাত পরিশ্রম আছে কারণ এই সবুজটুকুকে দেখতে পেলে পৃথিবীতে ও বোধ হয় সবথেকে বেশী সুখী হয়। আমার কোনো রকমে উন্নতি দেখলে ইদানীং আর একজনও সুখী হয় বৌদি। আর সেই একজন হল উর্বী। আমার কবিতা তাকে আত্মহারা করে, আমার আবৃত্তি তাকে তন্ময় করে। এই কয় মাসেই উর্বী আমায় যে মূল্য দিয়েছে সে মূল্য আজ পর্যন্ত আমার কোনো আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কারোর কাছেই পাইনি—অথচ উর্বীর সঙ্গে তো আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই, এমনকি দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়াও নয়। নেহাতই এক অনাত্মীয়া, তাও মাত্র কয়েকদিনের আলাপ। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে আমায় তার হৃদয়ে মর্যাদার যে আসনখানি দিয়েছে সেইটুকু এই মনের মণিকোঠায়

স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ যেন আমার কাছে নৈসর্গিক আলোর রেণু। উর্বীর কাছে এত পেলাম কিন্তু তাকে তো কিছু দিতে পারলাম না। এমনকি সামান্য পার্থিব কোনো বস্তু দিয়েও তাকে প্রীত করতে পারিনি কারণ আগেই বলেছি উর্বীর মর্যাদাবোধ অতি তীক্ষ্ণ তাই সবসময়েই ভয় হয় পাছে তাকে ছোট্ করে ফেলি।

জানো রাঙাবৌদি, মাঝে মাঝে ভাবি, হয়তো এই বিশ্ব সংসারে উর্বীর মতো সর্বংসহা মেয়ে হাজার হাজার রয়েছে, যারা তাদের বুকের টানে সৌরজগতে আমার মতো উপদ্রবকারী উপগ্রহকে ধরে রেখেছে, কিন্তু তাদের টানটা আমাদের চোখের আড়ালে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তাদের চিনতে পারছি না। আর এই চিনতে না পারার জন্য তাদেরকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংসারের যাঁতাকলে অন্যায়, অসংযম ও অত্যাচারে নিষ্পেষিত করে দিন দিন চরম অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পায়ের তলার মাটিও সরিয়ে দিচ্ছি কারণ একথা বহুবিদিত যে মেয়েদের অপর নাম ধরিত্রী।

আজকাল মেয়েদের নিয়ে অনেক সময় আবোল তাবোল লেখা হয়। এক এক সময় দেখা যায় এমন মেয়েদের নিয়ে লেখা হয় যারা হয়তো জীবনের কোন প্রত্যূষ থেকে সেবিকার জীবন শুরু করেছে, যাদের জীবনের বসন্তকালটা কাটে রোগীর সেবায়, পঙ্গুর সেবায়, পীড়িতদের সেবায়। রাতের পর রাত যাদের বিনিদ্র কাটে তোমার আমার মতো আত্মীয় স্বজনের শিয়রে বসে তাদেরও ছোট করে দেখাবার যে কী দারুণ প্রচেষ্টা চলে, মাঝে মাঝে তা দেখলে বা শুনলে সত্যি আমার অবাক লাগে। অথচ আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কেউ অসুস্থ হলে বা পীড়িত বোধ করলে, নিজেরা অপারগ হলে যখন হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ফেলে দিয়ে আসি তখন তাদের সেবা করে কারা? আমরা, "ওঃ ও নার্স", বলে যাদের সম্বন্ধে ভ্রূকুটি করি অবহেলার সঙ্গে কদর্য কত ইঙ্গিতমুখর শব্দ উচ্চারণ করি সেই নার্স অর্থাৎ মাতৃরূপা সেবিকারা। জানো বৌদি, কত শৃঙ্খলাবিহীন মৃত্যুপথ-যাত্রীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস অঙ্গে মেখে কত মিথ্যা কলঙ্কের অলঙ্কারে বরাঙ্গের শোভাবর্ধন করে, কি অপরিসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এরা তোমার আমার মতো অন্যান্য অনাত্মীয় ও অপরের সেবা করে চলেছে। অথচ "ভাত দেবার মুরোদ নেই কিল মারবার গোঁসাইরা" আজকাল এদের নিয়েই কল্পনার কুতুবমিনার রচনা করে মোটা দর্শনী পাবার লোভটুকুকে সংবরণ করতে পারছে না। তাই এই মাতৃরূপা সেবিকাদের এক কলমের খোঁচায় নীচে নামিয়ে সস্তায় বাজার গরম করে বেশ দু-পয়সা করে নিচ্ছেন।

আচ্ছা বৌদি বলতে পারো, কবে আমরা পুরষরা নিজেদের সমালোচনায় মুখর হতে পারব? একজন নারী যদি দুর্বিপাকে পড়ে বা সাময়িক উত্তেজনা বশে দ্বিচারিণী হয় তাহলে তাকে আমরা কত বিশেষণেই না ভূষিতা করি, কিন্তু এই চকরা বকরা জামা প্যান্ট্ পরা, ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরা, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, বড় বড় লেকচার

মারনে ওয়ালারা দিনের পর দিন যখন রাতের অন্ধকারে নারীর পর নারী বদল করে তাদের কী বিশেষণে ভূষিত করবে? এদের ভূষিত করবার মতো উচিত বিশেষণ বোধহয় আজও কোনো অভিধানে লেখা হয়নি। জানি না ভাবীকালের কোন নবী এদের জন্য সঠিক বিশেষণ আমাদের উপহার দিতে পারবেন কিনা। পারুন আর নাই পারুন অন্তত তার জন্য অপেক্ষা করতে দোষ কীসের? ততদিন চলুক না প্রহর গোনা?

দেখেছ মনের কি বিচিত্র গতি? নিজে পুরুষ হয়ে পুরুষকে গালাগালি দিচ্ছি? না বৌদি গালাগালি আমি সত্যিকার পুরুষদের দিচ্ছি না, দিচ্ছি তাদের, যারা কাপুরুষ, যারা ভালোবাসে একজনকে বিয়ে করে আর একজনকে, আর পুজো করে আর একজনের। হ্যাঁ বৌদি, এ জিনিস আজ ঘরে ঘরে। কয়েক বছর আগেও যখন বয়সটা আমার কম ছিল তখনও কিন্তু এসব নিয়ে মগজের ভিতরে কোনো আলোড়নই জাগত না, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই, আজকে বয়সটা পরিণতির দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে তাই ভাবনার ধারণাটাও স্বাভাবিক ভাবেই গতিপথ পরিবর্তিত করছে। এই লেখাটা শুরু করবার পরই তোমায় জানিয়েছিলাম তোমার এই দেবরটির ভিতর এখন কাজ করছে অনেক উন্মত্ত সংক্ষোভ যার পশ্চাদপদটি কী এবং কোথা থেকে এই সংক্ষোভ এসে আমার অন্তরকে আন্দোলিত করে তার হদিস বোধহয় আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারি না তাই মাঝে মাঝেই বিশ্ব সংসারের সঙ্গে বিদ্রোহ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্জন সাগর তীরে ঝাউবনে শীতল ছায়ায়, উদাসীন হওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আপন মনেই বলে উঠি, "কতদিন, আর কতদিন আমায় তোমারই মতো এমনভাবে বয়ে যেতে হবে।"

মাঝে মাঝে মনে হয়, অনু, সুস্মিতা, উর্বী সব মিথ্যা, না হলে জীবন না ফুরোতেই জীবনে অনেক সম্বলই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয় কেন? জীবনের বালুতটে একদিন যারা সফেন তরঙ্গমালার মতো হিল্লোল তোলে, দিন না ফুরোতেই তারা কোথায় তলিয়ে যায়? বসন্তের সমাগমে পলাশে, অশোকে, শিমুলে যে রং ঝরে পড়ে, বসন্ত ফুরোলে তারাই আবার স্মৃতিকে ব্যথিত করে। কেন? কেন? কেন এমন হয়? কালবৈশাখীর সময় কালো মেঘ দেখলে অন্তর ভয়ে ভরে ওঠে কিন্তু যখন ঝড় শুরু হয় এবং তার সঙ্গে বৃষ্টি নামে তখন কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই শীতল পরিণতির জন্য হৃদয়ে খুশীর জোয়ারও বইতে থাকে। কিন্তু জীবনে কালবৈশাখী এলে সব যেন গুঁড়িয়ে যায় সব তছনছ হয়ে যায়, বাবুই এর বাসার মতো ছিঁড়ে ছিটকে কোথায় গিয়ে উড়ে পড়ে বাবুই আর তার হদিসই পায় না।

কোন শৈশবকাল থেকে জীবনের ইমারতটা একটি একটি করে ইট দিয়ে, চুন, সুরকি, সিমেন্ট দিয়ে আমরা গেঁথে তুলি তারপর তার মেঝেতে রং দিয়ে নক্সা করি, তার দেয়ালগুলোকে পছন্দসই রং দিয়ে চিত্ত বিমোহন করে তুলি কিন্তু সেই ইমারত যদি ভূমিকম্প হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে আর তা যদি ঘটে আমাদের চোখের

সামনেই, তবে? না কেঁদে কি থাকতে পারি তাহলে? একমাত্র সিদ্ধ পুরুষ যাঁরা তাঁরা ছাড়া আর কি কেউ তা পারেন? তাই মাতৃশরীরে ধমনীর রক্তোদ্ভুত স্তনদুগ্ধে লালিত শিশু বড় হয়ে যখন দিন দিন অবক্ষয়ের পথে দ্রুত ধাবিত হয় তখন মায়ের সেই মধুর মুখখানার কথা কি তাদের একবারও মনে পড়ে না, যখন স্তন্যপান করাতে করাতে আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে মাতৃআনন আলোকিত হয়ে উঠত। কী করে আর মনে পড়বে বল? শিশু যে দুগ্ধ পান করে অজ্ঞান অবস্থায়। সবাই তো আর দেবকীনন্দন হয়ে জন্মায় না। তাই হয়তো অজ্ঞানের অন্ধকারটা মানবের সারা জীবনেও কাটে না।

জানো বৌদি, একবার, এইরকম ঝাউবনের ঘন ছায়ায় বসে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের দিকে চেয়ে নিজেকে চিনতে চেষ্টা করেছিলাম। অনু, সুস্মিতা, উর্বী ও আরও অনেক আশপাশের লোকদের চিনতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমাকে বলে দিয়েছিল "মিথ্যা, সব মিথ্যা, সত্য শুধু দেহের ভিতর এই হৃদয়, সত্য শুধু ঝাউবনের মাথার ঐ সূর্য, সত্য শুধু অদূরে সমুদ্রের ঐ নীল জল কল্লোল, সত্য শুধু ঝাউ বিথীকার এই শনশন সুরের গান, সত্য শুধু আমার মধ্যেকার মনুষ্যত্বের শক্তি। ব্যস্ ঐ একদিনই, তারপর আর কোনোদিনই ঐভাবে চিন্তা করবার চেষ্টা করিনি। কারণ কী জানো? কারণ ভয়। হ্যাঁ অপরিসীম ভীতি। পাছে আমার ভৌতিক মন বলে বসে মানুষের এই বহু আস্বাদিত জীবনের সবটুকুই মিথ্যা, সত্য শুধু আকাশ, বাতাস, আলো আর স্মৃতি। তাহলে আমিও যে মিথ্যা হয়ে যাব। কিন্তু আমার যে মনে হয় আমি সত্য, অনু সত্য, সুস্মিতা সত্য, উর্বী সত্য। আমি যে তাদের কাউকে পাই প্রেমিকা রূপে, কাউকে পাই প্রিয়া রূপে আর কাউকে পাই প্রতিমা রূপে। এযে আমার জীবনের চরম পরীক্ষিত সত্য। তাহলে আকাশ-বাতাস, আলো ছাড়া আরো সত্য আছে। আর সে সত্য হল প্রেম, সে সত্য হল প্রীতি, সে সত্য হল শ্রদ্ধা। হ্যাঁ রাঙা বৌদি প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা এগুলো যদি আজও না থাকত তাহলে কবে সূর্য, আলো, আকাশ, বাতাস সব মরে যেত, যেমন মাঝে মাঝে মুর্মূষু হয়ে পড়ে আমার মনটা। না....... না...... একেবারে মরে না, কারণ সামনে জ্বলে প্রেমের সোনালী আলো, সামনে থাকে প্রীতি-মুগ্ধ বিধুর সৌরভ, সামনে থাকে শ্রদ্ধার সুবাসিত ধূপের হৃদয় বিহ্বল করা সুরভি।

তাইত মানুষ আমি, যখন তখন মরতে পারি না। সাগরপাড়ে ঝাউবনের ঘন ছায়ায় হারিয়ে যেতে গিয়েও হারিয়ে যেতে পারি না, বার বার ফিরে ফিরে আসি অনু, সুস্মিতা, উর্বী আর তোমার দুয়ারে। জানি না কেন বার বার ফিরে আসি কোন মনুষ্যত্বের তাগিদে? তবে কি তোমাদের হৃদয়ে আমার ছায়াখানি রেখে যাবার জন্যে বার বার ফিরে আসি নাকি, তোমাদের ছায়া যুগে যুগে আমার হৃদয়ে বয়ে বেড়াবার জন্যে ফিরে ফিরে আসি? বোধহয় জীবন সত্য, মৃত্যু সত্য, দুঃখ সত্য, সুখও সত্য, প্রাপ্তিও সত্য, অপ্রাপ্তিও সত্য, প্রেম সত্য আর জীবনকে দূরে সরিয়ে

দিয়ে জীবনের এইসব ফসলকে ঘরে তোলবার চিন্তা করা বাতুলতারই নামান্তর। তাই বোধহয় বাইরে মৃত্যু চেয়েও মনে মনে মানুষ অনেক সময় জীবনের জীর্ণ তরীখানির উপর বসে কালের মহাসমুদ্রে আরও কিছুকাল ভেসে থাকতে চায়।

না রাঙাবৌদি, এ মনুষ্যত্বের কোনো ব্যাখ্যা আজও হৃদয় দিতে পারেনি। আমি জানি, একপ্রান্তে অনু, সুস্মিতা, উর্বী আর তুমি, আর আমি রয়েছি আর এক প্রান্তে। আর এইটাই জীবনের চরম ও পরম সত্য। আমার জীবনে প্রতীক্ষিত বহু সত্যরা এখনো অনাবিষ্কৃত। ভাবীকালের গহ্বরে সেই সত্য এখনো বন্দী। তাই যদি কোনোদিন ঘটনাবহুল এই জীবনে তোমায় জানাবার মতো আরও সত্যের সন্ধান পাই, জেনো কৃপণ হবে না তোমার স্নেহমদাতুর এই দেবর। তোমায় জানাবার মতো ঘটনার স্রোত পুঞ্জীভূত হলেই স্বতোৎসারিত ফেনোচ্ছ্বাসে উচ্ছল হয়ে আপনিই গিয়ে তোমার হৃদয়ের বালুচর সিক্ত করবে। সুতরাং সেই আগামী উপহারের জন্য অপেক্ষা কর আর আজকের এই বর্তমানে আমার লেখনী বন্ধ করবার অনুমতি প্রদান কর।

প্রণামান্তে —
তোমারই
বিধু

শুভম

ডিং ডং ডিং ডং, শুভমের ছোট্ট বাড়ির কলিং বেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। মাত্র গত সন্ধ্যায় জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের এই শেষ রবিবারের বিকেলেও শীতের রেশটা রয়ে গেছে। অনেক দেরীতে খাওয়া দাওয়ার পর একখানি হালকা উপন্যাস হাতে নিয়ে গায়ে একটা খেস চাপা দিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে সবে মাত্র উপন্যাসটির খান পাঁচেক পাতায় শুভম্ চোখ বুলিয়েছে, ঠিক এমনি সময়েই ঐ ডিং ডং আওয়াজ। আওয়াজটা শুনে সামান্য বিরক্তির সঙ্গে তার মুখে অস্ফুট শব্দ, এই অসময়ে আবার কে জ্বালাতে এল! এ সময়ে কে হতে পারে? এই চিন্তার মধ্যেই বেলটা আবার "ডিং ডং ডিং ডং" শব্দে আর্তনাদ করে ওঠে। শুভম বিছানা থেকে উঠতে উঠতে ঘরের ভিতর থেকেই বলে—

"কে? এক মিনিট দাঁড়ান আসছি!"

"আচ্ছা।"

আরে? এ যে নারীকণ্ঠ! শুভম বিস্মিত হয়ে ধীর পায়ে এসে দরজা খুলে সামনে অপেক্ষমানা মহিলাকে দেখে—

"আরে? আপনি?"

"হ্যাঁ আমি, খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?"

"না, না না ঠিক তা নয় তবে এসময়ে এখানে হঠাৎ আপনাকে, আমি ঠিক ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা!"

"আচ্ছা তোমার কী হয়েছে বলতো? দেখার পর থেকেই আপনি আপনি করছ। তারপর এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে কথা বলছ?"

"ও হ্যাঁ, তাইতো? আসুন আসুন ভিতরে আসুন, সরি, আই অ্যাম ভেরি সরি।"

"থাক আর ভদ্রতা করতে হবে না।"

"তা হঠাৎ কি মনে করে এখানে?"

"কেন আসতে নেই নাকি? কই দরজার বাইরে তো নো এ্যাডমিশন বোর্ড নেই?"

"তা সত্যি, তবে আপনি এখানে হঠাৎ আসবেন, এ যে ভাবাই যায় না।"

"জীবনের সব ঘটনাই কী আগে থেকে ভেবে রাখা যায়, না সব কাজ সব সময় ঠিক ঠিক করে ওঠা যায়!

"না তা হয়তো ভেবে রাখা যায় না বা ঠিক ঠিক করা যায় না।"

"তবে?"

"তবে এমন অনেক মানুষ আছেন, পৃথিবীতে, যাঁরা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে নিজের জীবনটাকেও চালাতে চান। যেমন আপনি।"

"আচ্ছা শুভম তোমার কী হয়েছে বলতো? সেই তখন থেকেই আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলছ ঘরের ভিতরে ঢোকা অবধি বসতে পর্যন্ত বললে না। এখানে আমার আসাটা কি অন্যায় হয়ে গেছে?"

"ও তাইতো! হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বসুন বসুন," শুভম একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়।

"তুমি বসবে না?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই," বলে শুভম তার বিছানারই একপাশে বসে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুভমের গোটা শরীরে চোখ বুলিয়ে ভদ্রমহিলা বলেন—

"তুমি ঠিক সেই রকমই আছো, এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

"এতটুকুও না!" বলে শুভম নিজের দুটো আঙুলে সামান্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। তা দেখে ভদ্রমহিলা বলেন, "নাঃ, এতটুকুও না, তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনিই আছো ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি।"

কথাগুলি বলতে বলতে ভদ্রমহিলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, খুব আস্তে হলেও কণ্ঠস্বরের কম্পন থেকে শুভমের সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—দু-এক সেকেন্ড নীরবতার পর সে বলে—

"তা হঠাৎ এতদিন পরে অযাচিতভাবে আপনার এই অধমের উপরে দয়া হল যে! ব্যাপারটা কী বলুন তো!" শুভমের কণ্ঠস্বরে কিছুটা শ্লেষ মিশে যায়, ভদ্রমহিলা চেয়ারটা ঠেলে তীব্র বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, "তখন থেকেই তুমি আমাকে আপনি আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছ, এর চেয়ে ভালো ছিল দরজাটা খুলে দেখে প্রথমেই যদি আমাকে চেনো না বলতে!"

ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে চলে যেতে চান। শুভম অত্যন্ত দ্রুততায় ঘরের দরজার সামনে এসে তাঁর যাবার পথটা আগলে বলে—

"সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি তখন থেকেই খুব সহজ হবার চেষ্টা করছি কিন্তু কেন জানিনা পারছি না!"

"কেন পারছ না। আমাদের সম্পর্ক তো এতদিন সহজই ছিল! তবে কেন পারছ না সহজভাবে কথা বলতে?"

"সেইটাই আশ্চর্য! এতদিন এতবছর এই অখণ্ড একাকীত্বের অবসরে বহুবার ভেবেছি কোনদিন যদি তিনি আসেন আমি অত্যন্ত সহজ হয়ে যাব, অত্যন্ত সহজভাবে কথাবার্তা বলব, অথচ আজ যখন আপনি এলেন তখন..............

"তখন কী..........?"

"না............কিছু না..........," শুভম মুখটা নীচু করে নেয়।

"দরজাটা ছাড়, আমি যাই।"

"না না, যাবেন না প্লিজ, আরও............ .

আরও.........কী?

"আরও কিছুক্ষণ থাকুন আরও কিছুক্ষণ প্লিজ, প্লিজ।"

শুভমের কথায় অশ্রুবেগের ছোঁয়া তার অবনত মুখের দিকে চেয়ে দীপ্ত ভঙ্গিতে মহিলা বলেন—

"তুমি না পুরুষ মানুষ! তুমি না সিভিল ইঞ্জিনিয়ার!" ইঁট পাথর লোহা নিয়ে না তোমার কারবার।"

"কিন্তু আমি তো মানুষ?"

"হ্যাঁ শুভম, তুমি মানুষ বলেই তো একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, কিন্তু............"

"কিন্তু, কিন্তু কী? বসুন প্লিজ, কী হয়েছে বলুন........."

"নাঃ থাক, এতক্ষণ.পরের মতো ব্যবহার করে আমাকে আপনি আজ্ঞে বলে সম্বোধিত করে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়ে তুমি যখন আমার সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখাতে চাওনি, তখন তোমাকে আর বিব্রত করতে চাইনা, প্লিজ আমাকে যেতে দাও।"

"না, তা হয় না, আমাব কাছে আশ্রয় চেয়ে আপনার ফিরে যাওয়া চলবে না, যে কোনো কারণেই হোক, কোথাও একটা অশান্তি বা দুর্ঘটনা যে আপনার জীবনে ঘটেছে তা জেনে বুঝে এ অবস্থায় আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না, অন্তত আজকে তো নয়ই!"

"তার মানে তুমি কি আমাকে এখানে রাত কাটাতে বলছ নাকি?"

আচম্বিতে শুভম চিৎকার করে বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বলছি.......।"

হঠাৎ তার চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সোজাসুজি শুভমের চোখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন—

"তোমার মাথার কোনো অসুখ করেনি তো? গত দশ বছরের মধ্যে আমাদের কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কেউ কারও খবরা খবর নিইনি, এর মধ্যে কি তুমি কোনো মানসিক আরোগ্য-নিকেতন থেকে ঘুরে এসেছ? শুভ সত্যি করে বল।"

"নাঃ শুভম কর-এর মাথাটা অত পলকা নয় ম্যাডাম, আপনি কি জানেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোর আর ফুটবল ম্যাচগুলোর সব কটাতেই এই শুভম্ কর কতগুলো পদক করায়ত্ত করেছে!"

"হ্যাঁ তা তো জানি, কিন্তু তখন থেকে আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলাটা তো বন্ধ করতে পারছ না। সেই জন্যই সন্দেহটা আরও বেশী হচ্ছে, যে, এই গত দশ বছরের মধ্যে কি তুমি কোনো বড় ধরনের মানসিক রোগে ভুগেছ? না শুভম, থাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, এবার আমায় যেতে দাও, প্লিজ, বড্ড দেরী হয়ে যাবে!"

কথাগুলি বলতে বলতে ভদ্রমহিলা নিজের কব্জির ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলে ওঠেন—

"এখন পাঁচটা বাজে, মিনিট দশেকের মধ্যেই ট্রেন আছে, ওটা ধরতে না পারলে সাতটার মধ্যে বর্ধমান পৌঁছানো কোনো রকমেই সম্ভব হবে না, আর তার বেশী

রাত হলে তো আর দত্ত বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকা যাবে না, হয়তো বাড়ির রকেতেই রাত কাটাতে হবে।"

"বলেন কী? অবস্থাটা এত দূর গড়িয়েছে?"

"বলতেই তো এসেছিলাম শুভ, কিন্তু তুমি তো এখনও সেই আপনি আপনি করে সম্বোধন করে চলেছ! তুমি যদি কথা দাও আমি যতক্ষণ থাকব বা যে কটা দিন থাকব তার মধ্যে একবারও আপনি আপনি করে কথা বলবে না। সেই দশ বছর আগের মতো অত্যন্ত সহজভাবে কথা বলবে সহজ ব্যবহার করবে, একমাত্র তাহলেই তোমার কাছে কয়েকটা দিন থাকব, তোমাকে সব কথা বলব।"

"কিন্তু!"

হঠাৎ ডান হাতটা দিয়ে শুভমের ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ভদ্রমহিলা বলেন—

"কোন কিন্তু নয় শুভম্ কোন কিন্তু নয়, প্লিজ.........একবার আমার নাম ধরে তুমি সম্বোধনে আমায় ডাক! না হলে আজ হয়তো আমাকে অন্য আশ্রয় খুঁজতে হবে কিংবা সেই দত্ত বাড়ির নরকেই গিয়ে ঢুকতে হবে! জানো শুভ আজ আমার বিয়ের দিন। বর্ধমানের দত্ত বাড়িতে, আজ খুব ধুম ধাম করে ছেলের দশম বিবাহ বার্ষিকী পালিত হচ্ছে, রাত্রে অন্তত দত্তদের ছেলের শ-দুয়েক ইয়ার-দোস্ত আজ দত্ত বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবে।"

"আর দত্ত বাড়ির ছোট বউ পালিয়ে এসে শুভম করের মতো অসভ্য জানোয়ারের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। হায়রে নিয়তি!" কথাগুলো বলে শুভম ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে সামান্য বাঁকা হাসি হাসে।

"সত্যিই শুভম সত্যিই এ নিয়তি! নিয়তি ছাড়া আর কিই বা বলি বল।"

"এ্যাঁ একি? হঠাৎ আপনার মুখে নিয়তির কথা?"

"হ্যাঁ, শুভম আমার মুখে নিয়তির কথা! এতে অবাক হবার কী আছে!"

দশ বছর আগে এই আপনাকেই বলতে শুনেছি, 'নিয়তি, ভাগ্য' এসব কাপুরুষদের এবং লজ্জাবতী ভীরু রমণীদের কথা। এই পৃথিবীতে পৌরুষ দিয়ে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সব কিছু আদায় করে নেওয়া যায় কিন্তু আজকে আপনার মুখ থেকেই শুনতে হচ্ছে নিয়তির কথা, ভাগ্যের কথা। হায়রে অদৃষ্টের পরিহাস!"

"শুভম্, প্লিজ দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াও, আমায় দেতে দাও, তুমি যখন প্রতিজ্ঞাই করেছ কিছুতেই এখানে আমায় থাকতে দেবে না তখন প্লিজ দরজাটা ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও।"

কথাগুলো বলতে বলতে নিজের ডান হাতটা দিয়ে শুভমকে ঠেলে সরিয়ে ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বের হতে চান কিন্তু শুভম বলে—

"নাঃ নাঃ এই ভর সন্ধ্যায় কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না, আজ কিছুতেই আমি ছাড়ছি না—"

"তাহলে একবার সেই পুরনো নামে, তুমি সম্বোধনে আমায় ডাক!"

"সে কী করে হয়! সে কি সম্ভব! পরের ঘরের বৌকে কী করে আমি ঐভাবে সম্বোধন করি! সে যে বিষম অন্যায়!"

"রাখ তো তোমার নীতিবোধ! এই নীতিজ্ঞান তোমায় সারাজীবন কী দিয়েছে বলতে পার!"

"অনেক দিয়েছে.......কী দেয়নি? অনেক দিয়েছে.......

এক বুক যন্ত্রণা, এক সাগর কান্না, এক মাথা চিন্তা এক ঝুড়ি জ্ঞান।"

"এই সবই শুধু পাওনা ছিল তোমার শুভম!"

"আর কিই-বা থাকতে পারে? জীবনের কাছে মানুষের কাছে, এ পোড়া দেশের এই সমাজের কাছে এর চেয়ে বেশী আর কিই বা চাহিদা থাকতে পারে আমার!"

কথাগুলো বলতে বলতে শুভমের গলার স্বরটা ভারী হয়ে যায়। তার চোখের কোল দুটো চিক চিক করে ওঠে।

"তবু তুমি আমাকে একবার 'তুমি' সম্বোধনে কাছে ডাকবে না!"

একবার হাত দুটো ধরে বলবে না, "এসো ভালো করে বস, আজকে থাক, তোমার সব কথা শুনব!"

"তাতে তো যন্ত্রণাই শুধু বাড়বে বৈশাখী, তাতে কান্নাই শুধু বাড়বে!"

"বৈশাখী! তুমি আমার নাম ধরে ডাকলে শুভম। আর একবার প্লিজ আর একবার, শুভম, আর একটি বার এই নামে ডাক শুভম! প্লিজ প্লিজ প্লিজ!"

কথাগুলো বলতে বলতে আবেগাপ্লুত বৈশাখী দৌড়ে গিয়ে শুভমের বুকে মাথাটা রেখে তার মুখটা ঘষতে থাকে আর দরদর ধারায় প্রবাহিত তার অশ্রুতে শুভমের সার্টটা ভিজতে থাকে। ধীরে ধীরে শুভম বৈশাখীর মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে এবং, "শান্ত হও বৈশাখী, শান্ত হও প্লিজ.....বুঝতে পারছি তোমার বুকে অনেক ব্যথা অনেক কষ্ট জমা হয়ে আছে। আমি সব শুনব, আগে বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে শান্ত হয়ে বসে একটু কিছু মুখে দাও, তার পর ধৈর্য ধরে বসে তোমার সব কথা আমি শুনব। প্লিজ বৈশাখী, যাও বাথরুমে যাও," বলে শুভম তাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দেয়।

মিনিট দশেকের মধ্যে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বৈশাখী দেখে তার জন্য এক প্লেট খাবার এবং চা নিয়ে শুভম অপেক্ষা করছে। শুভমের এই গিন্নিপনা দেখে বৈশাখী হেসে ফেলে, বলে—

"বাবাঃ তুমি দেখছি একেবারে প্রফেশনাল গৃহিণী হয়ে গেছ! এত তাড়াতাড়ি এসব ম্যানেজ করলে কীভাবে?"

"নাঃ এ আর এমন কী! এই তোমার জন্য একটু চা করলাম আর কী!"

"আমি কিন্তু এই মিষ্টি টিষ্টি কিছু খাব না, স্রেফ এই বিস্কিট দুটো আর চা-টুকু খাব।"

"সে কি! তুমি কখন সেই দুপুরে খেয়ে বের হয়েছ! কিছু অন্তত খাও, না খেলে শরীর খারাপ করবে যে!"

"না স্যার, আমার শরীরটা অত কম মজবুত নয় যে একবেলা না খেলেই তা বসন্তবিহীন বৃক্ষের মতো রুক্ষ হয়ে উঠবে, আমি শুধু চা-টাই নিচ্ছি......"

কথাগুলো বলে বৈশাখী চায়ের কাপটা টেবিল থেকে তুলে হাতে নিয়ে শুভমের বিছানার এক পাশে বসে। শুভমও নিজের চা-টা হাতে নিয়ে পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসে, বলে—

"বল এবার তোমার কাহিনী, শুনি আমি।"

" কী করে বলি বলত! এ কাহিনী বড় লজ্জার কাহিনী। কোনো মেয়ের পক্ষে নিজের মুখে তার স্বামীর সম্বন্ধে বলা......অথচ না বললেও উপায় নেই।"

"তবে থাক, তোমার যদি কোনো দ্বিধা থাকে তা হলে থাক ও সমস্ত কথা, আমিও শুনতে চাই না।"

"না শুভম তা হয় না, তুমি আমার একমাত্র প্রিয়জন এবং বন্ধু, তোমাকে না বললে আর কার কাছে এ দুঃখের বোঝা নামাই বল তো! শোন আমি সব বলছি।"

শুভম তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে। সে বুঝতে পারে বৈশাখীর চোখের কোলে আবার মেঘের ছায়া, কথাগুলো বলতে যে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝে সে তাকে বলে, "থাক না, তোমার কষ্ট হয় তো নাই বা বললে?"

"না না আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না..... তাছাড়া কষ্ট হলেও আমায় বলতেই হবে, কারণ আমার জীবনের এই দুর্দৈবের কথা পৃথিবীর একজন মানুষ অন্তত জানুক। একজন অন্তত জানুক যে দত্ত বাড়ির ঘর ভাঙার ব্যাপারে বৈশাখী দত্তের......কোনো দোষ ছিল না। অথচ গত দশ বছর যাবৎ বিনা দোষে সে নির্যাতিতা হয়েছে, রাতের পর রাত পিঠেতে তার চাবুক পড়েছে।"

তার কথায় শুভম চমকে ওঠে, বলে, "এ্যাঁ চাবুক?"

"হ্যাঁ চাবুক, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না, দেখাব তবে!"

বলে বৈশাখী তার বুকের আঁচলটা সরিয়ে ফটাফট তার ব্লাউজের হুকগুলো খুলে সেটা গা থেকে নামিয়ে শুভমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। শুভম্ এক লহমায় তার পিঠের কালসিটে দাগগুলো দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে—

"ইসস্ কি নিষ্ঠুর! জানোয়ার না মানুষ ওরা!"

"জানোয়ারেরও মায়াদয়া থাকে, কিন্তু ওরা জানোয়ারেরও অধম। তুমি আরও দেখতে চাও শুভম্?"

বলে বৈশাখী পায়ের নীচের দিক থেকে শাড়িটা উপর দিকে তুলে তার জানুগুলো দেখায়। জানুতে তার কালো কালো গর্তের মতো অসংখ্য দাগ, ঠিক জলবসন্তের দাগের মতো।

ঐ দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে শুভম্ বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে চলে যেতে যেতে বলে—

"প্লিজ বৈশাখী প্লিজ তুমি যন্ত্রণাকর ঐ ক্ষতের স্থানগুলো আর আমায় দেখিও না, প্লিজ ওগুলো ঢেকে রাখ।"

বৈশাখী শুভমের ডান হাতটা ধরে তাকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে বলে, "না না, আমি আর দেখাব না, দেখাবার মতো শরীরে আর কিছু দাগ নেই আমার। আর যা দাগ আছে, সে সব আছে মনের ভিতর, সে সব দাগ চোখে দেখার নয়।"

"এবার শোন আমার আসল কাহিনী—

বিয়ের পর থেকেই তোমার আমার কৈশোর কালের মেলামেশা নিয়ে ও বাড়ির সবাই সব সময়েই কারণে অকারণে আমায় টিটকারী দিত, প্রথম প্রথম আমি কোনো কথার জবাব দিতাম না, এক এক সময় অসহ্য হয়ে উঠলে সামান্য প্রতিবাদ করে উঠতাম, আর প্রতিবাদ করলেই দত্ত-বাড়ির ছোট বীর ঘরে ঢুকিয়ে দমাদম মার শুরু করে দিত। হাতে মেরেই হত না শুরু হত সিগারেট ধরিয়ে উরুতে ছ্যাঁকা দেওয়া। এই রকমই চলছিল মাঝে মধ্যে।

বিয়ের বছর তিন কাটবার পরে যখন, আমার মধ্যে সন্তানাদি আসার কোনো লক্ষণ দেখতে পেল না তখন ও-বাড়ির সকলে বলতে লাগল, "দেখগে বিয়ের আগেই হয়তো তিনবার পেট খালাস করিয়ে টরিয়ে অপারেশন টপারেশন করিয়ে রেখেছে! আমার সমস্ত রকমের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় বারবার পরীক্ষা করানো চলতে লাগল। এমনিই পরীক্ষা করবার সময় হঠাৎ একজন ডাক্তার আমার সামনেই একদিন আমার স্বামীকে তার চেম্বারের পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—

"কি তুমি ঐ খারাপ জায়গাগুলোয় যাওয়া ছেড়েছ তো? দেখ এখন বিয়ে থা করেছ, আর ঐ সব করো না, আর তুমি তো ভালোই জান তোমার নন-মোটাইল স্পার্ম। তোমার পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া কোনো দিনই সম্ভব নয় তবে শুধু শুধু এ বেচারী ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে টানা হেঁচড়া কেন করছ?"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে আমার স্বামী বললেন, "না, ডাঃ নিয়োগী তবু আপনি একবার ওকে ভালো করে দেখুন, ওর কোনো দোষ আছে কিনা?" ডাক্তারবাবু এবার সামান্য রাগের সঙ্গে বললেন, "ডাক্তারীটা তুমি পড়েছ না আমি? যা বলছি শোন, স্ত্রী-কে নিয়ে বাড়ি যাও; তোমার ঔরসে কোনো নারীর গর্ভেই কোনোদিন সন্তান জন্মাবে না। দ্যাখ আর একটা কথা শোন, আমাকে বেশী বিরক্ত করলে আমি কিন্তু মেয়েটিকে সব বলে দেব এবং আইনত তার প্রটেকশনের ব্যবস্থা করে দেব।"

কথাগুলো খুবই আস্তে বলছিলেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু ঐ কথোপকথন থেকে আমার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে, ডিফেক্টটা তাহলে আমার স্বামীর এবং সেটা এমন ডিফেক্ট, যে তার পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়। তুমি

তো জানো শুভম, লেখাপড়ায় এবং বুদ্ধিতে আমার স্কুলে কলেজে অনেকের উপরেই অবস্থান ছিল।

ডাক্তারবাবুর সব কথা শুনে তৎক্ষণাৎ আমার মাথায় একটা বদবুদ্ধি খেলে গেল, ওঁরা পাশের ঘর থেকে চেম্বারে ঢোকবার আগেই আমি এক্সামিনিং বেডে দাঁত মুখ চেপে অজ্ঞান হবার ভান করে শুয়ে পড়লাম। এ ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ডাক্তারবাবু, "আরে, এ যে অজ্ঞান হয়ে গেছে" বলে ট্যাপ থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আঁ-আঁ করে আমি চোখ খুলে বললাম, "আমি কোথায়? ডাক্তারবাবু বললেন, "তুমি আমার চেম্বারে মা, কোনো ভয় নেই এক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি আর একটু শুয়ে থাক তারপর বাড়ি যাবে।" আমার সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি আমার স্বামীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কিসে এসেছ? রিকশায় না গাড়িতে?' স্বামী বললেন, 'রিকশায়।' ডাঃ নিয়োগী বললেন, "না, না বৌমা এখন এই অবস্থায় কিছুতেই রিকশায় ফিরতে পারবেন না, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে এসো।" ডাক্তারবাবুর কথা শুনে আমার স্বামী হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি আনতে রিকশায় চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। স্বামীর রিকশাটা কিছুটা দূরে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে ডাক্তার নিয়োগীকে, 'আমার কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু, ওঁর কী হয়েছে আমাকে সব খুলে বলুন।' ডাক্তার নিয়োগী বললেন, 'সে সব শুনতে নেই, তাছাড়া ডাক্তার হিসেবে তোমাকে সে সব কথা বলা আমার উচিতও নয়।' তৎক্ষণাৎ নীচু হয়ে ডাক্তারবাবুর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে আমি বললাম, 'আপনি আমার বাবার বয়সী, আমি আপনার মেয়ের মতো, আপনার মেয়ের যদি কোনো ভীষণ বিপদ হত তাহলে কি আপনি না বলে থাকতে পারতেন? জানেন ডাক্তারবাবু সন্তান না হওয়ার জন্য দিনের পর দিন শ্বশুর বাড়িতে আমায় কিভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়, কীভাবে অপমানিত হতে হয়!' একথা বলে ডাক্তারবাবুকে সংক্ষেপে আমার জীবনের সব ঘটনার কথা বললাম। সব শুনে ডাক্তারবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্রুট, রাস্কেল, আমি ওদের জেল খাটাব, আমি ওদের পুলিশে দেব।'

ডাক্তারবাবুর উত্তেজনা দেখে আমি শান্তভাবে তাঁকে বললাম, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না, সব অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করবার শক্তি আমার আছে। আপনি শুধু বলুন আমার কোনো ত্রুটি আছে কিনা, কিংবা ওর কি হয়েছে।' আমার কথায় এবার ডাক্তারবাবুর মন ভিজল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার স্বামী অলকের ছোটবেলা থেকেই খারাপ জায়গায় যাবার অভ্যাস ছিল, ফলে তার সিফিলিস হয়েছিল এবং চেপে যাওয়াতে রোগটা খুবই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বহুদিনের চিকিৎসায় সে বাইরের দিক থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও তার বীর্যে জীবন্ত শুক্রকীট নেই, কারণ এই রোগের ফলে তার শুক্রকীটগুলি পুষ্টিলাভ করবার আগেই মারা যায় এবং তারা নড়তে চড়তে পারে না। শুক্রকীট নড়তে চড়তে না পারলে সেই শুক্রকীট ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে না, ফলে কোনো নারীর গর্ভ ঐ ধরনের বীর্যে নিষিক্ত হলেও

সে নারী সন্তানবতী হতে পারে না, তাই তোমারও সন্তান হচ্ছে না। এতে তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ ঐ রাস্কেলটার।' ডাক্তারবাবুর বলা কথাগুলো শুনে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তাহলে আমার কী হবে? আমি কি কোনোদিনই মা হতে পারব না?' কথাগুলো বলতে বলতেই ডাক্তারবাবুর চেম্বারেই আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার বাঁধভাঙা কান্না দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'চুপ কর মা তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে কান্নায় অত ভেঙে পড়লে কি চলে! শক্ত হও। আইনের ব্যবস্থা নাও। ডিভোর্স কর। তোমার প্রতি অহেতুক নির্যাতনের প্রতিশোধ নাও, আমি তোমায় সাহায্য করব। আমি নিজে দাঁড়িয়ে কোর্টে সাক্ষ্য দেব। ঐ শয়তান অলক দত্তের হাত থেকে মুক্তি পেতে তোমায় আমি নিজে সাহায্য করব।'

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হতে না হতে বাইরে গাড়ির শব্দে বুঝলাম আমার স্বামী গাড়ি নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। চুপ করে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম এবং বাড়ি ফিরলাম। সেই রাত্রেই স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আমার বন্ধু হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট লিপিকাকে চিঠিতে সব জানিয়ে উপদেশ চাইলাম। দিন কয়েক পরেই যে উত্তর এল, তাতে বর্ধমানের নাম-করা উকিল শঙ্কর চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য সে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে একটা চিঠি শঙ্কর বাবুকেও সে লিখে দিয়েছে দেখলাম।

আরও তিন-চারদিন পরে মার্কেটে যাওয়ার অছিলায় বর্ধমান কোর্টের বার লাইব্রেরীতে গিয়ে শঙ্করবাবুর হাতে লিপিকার দেওয়া চিঠিটা দিতেই তিনি সব বুঝে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি সামনের মঙ্গলবার বেলা এগারটা নাগাদ ঠিক এইখানে একবার আসবেন, সমস্ত কাগজপত্র রেডি থাকবে এসে সই করে দিয়ে যাবেন, হ্যাঁ সঙ্গে আপনার স্বামীর রোগের সম্পর্কে ডাঃ নিয়োগীর দেওয়া একটা সার্টিফিকেটও আনবেন। তাঁর কথামত ডাঃ নিয়োগীর সার্টিফিকেট জোগাড় করে মঙ্গলবার গিয়ে সমস্ত কাগজে সই করে দিয়ে এলাম। এতদিন ধরে যে এসব করেছি তা শ্বশুরবাড়ির কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি, জানতে পারল আজ, আজ সকালে এগারটা নাগাদ রেজিস্ট্রি পিয়ন এসে কোর্টের সমনটা দিয়ে যেতে সবার টনক নড়ে উঠল। সমনটা খুলে পড়েই দত্ত বাড়ির ছোট বীর এসে সবার সামনেই চুলের মুঠি ধরে দমাদম পেটাতে পেটাতে বলতে লাগল, 'হারামজাদী, খানকি, তোর এত বড় সাহস? তুই আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিস? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।' রাগের মাথায় মারতে মারতে ছোট বীর আমায় বাড়ির দরজার বাইরে ছুড়ে ফেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এ ঘটনা বাড়ির বাইরে রাস্তায় রিকশাওয়ালারা এবং পথচলতি বহু মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। কেউই ছোট বীরকে কিছু বলল না। মিনিট খানেক পরে আমি নিজেই রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ছি এমন সময় ছোটকু নামের একটা বিহারী রিকশাওয়ালা তার রিকশাটা আমার সামনে এনে বলল, 'ছোটি-ভাবী চলিয়ে আপকো স্টেশন পর পৌঁছাতে হ্যয়, বহিন আপ বাপকা ঘর চলে যাইয়ে

ইয়ে শয়তান লোগকে পাশ ঔর না যাইয়ে, ও-লোক আপকো মার ডালেঙ্গী। আইয়ে জলদি রিকশামে উঠিয়ে।' ছোটকুর কথায় যন্ত্রচালিতের মতো তার রিকশায় উঠে বসলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই খেয়াল হল, সঙ্গে তো একটিও পয়সা নেই! তাড়াতাড়ি ছোটকুকে বললাম, 'ছোটকু আমার কাছে তো পয়সা নেই, আমাকে তুমি নামিয়ে দাও আমি হেঁটেই চলে যাব।' আমার কথা শুনে ছোটকু বলল, 'কই বাত নেই ভাবীজী, আপ হমারা বড়া বহেনকে বরাবর, পয়সা মুঝে নেই চাইয়ে, লেকিন আপকো শান্তিসে ভাগ যানা হ্যায়।' ছোটকুর কথা শেষ হতে না হতেই রিকশা স্টেশনে এসে পৌঁছুল। আমি নামার আগেই সে দৌড়ে কাউন্টারে গিয়ে বৈদ্যবাটীর একটা টিকিট কেটে এনে টিকিটটা আর কুড়ি টাকার একটা নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রিকশা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার এই রকমভাবে চলে যাওয়া দেখে বুঝলাম পাছে আমি তার দেওয়া টিকিট এবং টাকা নিতে অস্বীকার করি সেইজন্য কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই সে চলে গেল।

রিকশা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটকুর পালানো দেখে ভাবলাম হায়রে, বোকা বর্বর অশিক্ষিত বলে প্রতিপদে আমরা যাদের অপমানিত করি তারা কত বুদ্ধিমান। তথাকথিত শিক্ষিত লোকের চেয়েও কত বেশী শিক্ষিত! ছোটকুর ব্যাপারটা দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল নাঃ, আর চোখে জল নয়, যে যুদ্ধে নেমেছি সে যুদ্ধের শেষ না দেখে আর চোখের জল ফেলব না। তাই মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে স্টেশনের ভিতরের এনকোয়ারী থেকে গাড়ির সময় জেনে নিয়ে চারনম্বর প্লাটফর্মে এসে হাওড়ামুখী লোকালে উঠে বসলাম। তারপর বৈদ্যবাটী পৌঁছে সিধে এই তোমার কাছে!"

কান্না জড়ানো আবেগের সঙ্গে এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে বৈশাখী থামতেই কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর তার মুখের দিকে চেয়ে শুভম বলল, "এতক্ষণ যা শুনলাম তাতে তো অনেক আগেই তোমার ডিভোর্স নেওয়া উচিত ছিল, তোমার মতো একটা ব্রাইট এডুকেটেড্ মেয়ে এতদিন মুখ বুজে এসব সহ্য করছিলে কীভাবে!"

"জানো তো শুভম, এখনও এই সব অগ্রগতির যুগেও এ দেশের সাধারণ মেয়েরা খুব অসহ্য কিছু না হলে তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চায় না, কারণ তাদের একটাই ভয় স্বামীর বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বললে স্বামীতো ছোট হবেনই সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি নিজেও সবার উপহাস ও করুণার পাত্র হয়ে উঠবে! এই ভয়ে।"

"তা বলে পড়ে পড়ে এভাবে মার খেয়েও চুপ করে থাকবে মেয়েরা?"

"নাঃ সব সময় ঠিক চুপ করে থাকে না, অন্যায় দেখলে প্রথম প্রথম ঘরের ভিতর ঝগড়াঝাঁটি করে স্বামীকে সংযত করবার চেষ্টা করে মেয়েরা......"

"হঠাৎ বৈশাখীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভম বলে ওঠে, "কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না, এই দেখ না তোমার ব্যাপারটা, ঘরের ভিতর চুপচাপ থেকে তুমি

স্বামীকে সংযত করতে পারলে কি? শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ের ময়দানেই তো নামতে হল!"

"হ্যাঁ হল, কিন্তু এরপর কী হবে জানিনা, কী করে মামলার খরচ চালাব, বর্ধমানে কেসের ডেটে কার সঙ্গেই বা যাতায়াত করব? কে আমায় প্রোটেকশন দেবে? এসব ভেবে এখন কূল কিনারা পাচ্ছিনা.....আসল কথা কী জানো? আসল কথা হল অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকাংশ মেয়েরা এদেশে এমনই পরনির্ভর যে সামান্য কিছু করতে গেলেই তাদের পরের কাছে হাত পাততে হয়, আর যার বা যাদের কাছে হাত পাততে হয়, তারা মেয়েদের এই অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে দু-চার কথা বলে নেয় বা পরোক্ষে ,অপমানটিই উপহার দেয়। এমন কি নিজের বাবা মা পর্যন্ত অনেক সময় কটু ব্যবহার উপহার দেন।"

"হ্যাঁ কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, আচ্ছা দেখা যাক, তোমাব জন্য কী ব্যবস্থা করা যায়।"

"ব্যবস্থা! আমার জন্য তুমি আবার কী ব্যবস্থা করবে?"

অন্য মেয়ে হলে বলতাম, আমার যা আছে সবই তো তোমার, কিন্তু সে মেয়ে তো তুমি নও, তুমি তো বৈশাখী দত্ত? তোমাকে তো জানি, নিজে মরে যাবে তবু অন্যের টাকা হাত পেতে নেবে না......তাই তুমি যাতে স্বচ্ছন্দে কিছু রোজগার করতে পারো তার ব্যবস্থা দু-একদিনের মধ্যেই করতে হবে, তাই না?"

"কিন্তু হঠাৎ করে কী ব্যবস্থা করবে শুভম?" বৈশাখী অবাক হয়ে প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে শুভমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার প্রশ্ন-ব্যাকুল আয়ত চোখের দিকে চেয়ে শুভম উত্তর দেয়—

"আছে আছে অনেক ব্যবস্থা করবার আছে; কী করব সেটা ঠিক সময়ে দেখতে পাবে এখন তুমি চতুষ্পাঠি পাড়ায় মায়ের কাছে যাবে না এখানেই থাকবে?"

"নাঃ এখানে নয়, এখন মায়ের কাছেই যাব, মাকে সব খুলে বলে তারপর যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আমি তবে এখন যাই, পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।" কথাগুলো বলেই বৈশাখী উঠে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে শুভম তাকে এগিয়ে দেয়।

বৈশাখী চলে যেতেই শুভম ভাবতে থাকে বৈশাখীর জন্য স্বাধীন রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা বলা যত সোজা কাজটা করা তত সোজা নয়। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। হঠাৎ তার মাথায় আসে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিটা পাবার আগে তার নিজের রোজগারের যে পদ্ধতিটা ছিল সেটাই বৈশাখীর জন্য চালু করে দিলে কেমন হয়। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঐ ব্যবস্থাটাই মনে মনে ঠিক করে ফেলল। পরের দিন অফিসে যাবার পথে একটা সাইন বোর্ডের দোকানে সাইন বোর্ডের সাইজের মাপজোক এবং লেটারের সাইজ ও কী লেখা হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে সে নিজের কর্মস্থল মেট্রো রেলের দপ্তরে

ঢুকে গেল। অফিসের কাজের শেষে চিৎপুরের সেই সাইন বোর্ডের দোকান থেকে আড়াই ফুট বাই চার ফুট সাইজের সাইনবোর্ড খানা খবরের কাগজে জড়িয়ে ব্র্যাবোর্ন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সিধে হাওড়া বর্ধমান লোকাল ধরে বৈদ্যবাটীতে এসে নামল। জামাপ্যান্ট ছাড়বার আগেই তার বাড়ির গেটের ঠিক মাথায় সাইন বোর্ডটা ফিট করে তবে তার শান্তি হ'ল। মাত্র বছর ছয়েক আগেও এই গেটেতেই ঝুলত, 'কর'স কোচিং সেন্টার', আর আজ সন্ধ্যায় শুভম কর নিজে হাতে সেই একই জায়গায় যে সাইন্‌বোর্ড ঝোলাল তার নাম 'বৈশাখী কোচিং সেন্টার'। সাইনবোর্ডটা লাগানোর পর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সে ভিতরে চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদল করে সোফায় বসতেই তার কুক-কাম বেয়ারা রঘুনাথ এক কাপ চা তার হাতে ধরিয়ে দিল। চায়ে চুমুক দিয়েই সে রাতের রান্নার ব্যাপারে রঘুনাথকে নির্দেশ দিল।

পরের দিন সকালে তার বাড়ির দরজায় কোচিং সেন্টারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখে পাড়ার অনেক ছেলে মেয়ে এবং তাদের অভিভাবকরা এলেন কোচিং-এর ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে। সাইনবোর্ডে সাবজেক্ট লেখাই ছিল, সুতরাং কারও সঙ্গেই শুভমকে বেশী কথা বলতে হল না। সে শুধু কোন কোন সাবজেক্টের কি কি ফিস্‌ লাগবে, এটা জানিয়ে দিল এবং পরের রবিবার থেকে সকলকে মানি-রিসিট দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল। সকাল ন-টার মধ্যে জনা-দশেক ছাত্র-ছাত্রী হবে এটা ধরে নিয়েই মনে মনে হিসেব কষে শুভম বুঝল জনা ত্রিশ ছাত্র-ছাত্রী হলেই বৈশাখীর হাজার তিনেক টাকা রোজগার হয়ে যাবে। তার প্রচেষ্টা যে বৃথা যাবে না এটা বুঝে মনে মনে সে তৃপ্তি পেল কিন্তু সমস্যা একটা রয়েই গেল, সেটা হল, এত সব কিছু করবার পরেও বৈশাখী তার বাড়িতে কোচিং সেন্টার চালাতে রাজী হবে কিনা। এই চিন্তা মাথায় নিয়েই সে অফিস গেল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেই রঘুনাথ বলল, "বাবু দিদিমণি আজ বিকেলে জোর হামলা চালিয়েছে।"

"সে কি রে? হামলা চালিয়েছে মানে?"

"হ্যাঁ বাবু বহুৎ হামলা চালিয়েছে, ঐ যে গেটে আপনি কি একটা বোর্ড টাঙিয়েছেন, এটা নিয়েই ঝামেলা। আপনাকে বাসায় না পেয়ে আমার উপর হামলা চালিয়েছেন।"

"কেন কী বলেছে তোকে?" শুভম প্রশ্নটা করে রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রঘুনাথ বলে, "খারাপ তো কিছু বললেন না, বললেন—তোমার সাহেবের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, "তোমার মতো ভোঁদরের সঙ্গে একা একা থাকতে থাকতে তোমার সাহেবও আরে ছ্যা ছ্যা! আমি সে কথা বলতে পারব না। আরে রাম রাম, না বাবু আমি সে কথা বলতে পারব না।"

"তুই তো পারবি না আমিই বলে দিচ্ছি, দিদিমণি বলেছে তোমার মতো বুদ্ধু

ভোঁদরের সঙ্গে একা একা থাকতে থাকতে তোমার সাহেবও একটা বুদ্ধু ভোঁদর হয়ে গেছে, এই তো?”

“আরে রাম, নাঃ নাঃ নাঃ বাবু, দিদিমণি আমাকে বুদ্ধু তো বললেন না, কই মনে পড়ছে না তো, না না বুদ্ধু বলেন নাই শুধু ভোঁদরই বলেছেন, না না বাবু আপনাকেও দিদিমণি বুদ্ধু বলেন নাই, শুধু ঐ, ঐ ঐটা বলেছেন।”

“ঠিক আছে দিদিমণি কী বলেছেন না বলেছেন সেটা নিয়ে তোমাকে আর গবেষণা করতে হবে না দয়া করে বল দিদিমণি সন্ধেবেলায় আবার আসবেন বলেছেন কিনা?”

“না এসে আর উপায় আছে? ঐ ঐ ঐটা বলা হয়েছে সেই সেই সেইটা যে এখনও বলা হয়নি, সেইটা বলতে তো আসতেই হত, তাই দিদিমণি আর না এসে কী করে?”

আচম্বিতে বারান্দায় দরজার কাছ থেকে বৈশাখীর কণ্ঠস্বরে শুভম ও রঘুনাথ দুজনেই কিছুটা হতচকিতভাবে বাইরে তাকায় এবং দেখে ততক্ষণে বৈশাখী ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে রঘুনাথ “ঐ নেন, উনি এসে গেছেন, আমি তবে চলি,” বলে পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বৈশাখীর দিকে চেয়ে, “কি গো দিদিমণি চা খাবেন নাকি?”

“শুধু চা আর কিছু নয়? দাঁড়াও আগে তোমার বাবুর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করি তারপর ভাবব চা খাব কি খাব না।”

“যা যা তুই চা করে নিয়ে আয়, বলে শুভম রঘুনাথকে চা করে আনতে নির্দেশ দেয়। আর ইতিমধ্যে বৈশাখী এসে শুভমের ঠিক সামনে দাঁড়ায় এবং বলে—

“আচ্ছা তুমি কি বলতো? গত দশ বছর আমি বৈদ্যবাটী ছাড়া তাছাড়া কোথায় চতুষ্পাঠী পাড়া আর কোথায় গাঁতীর মাঠ পাড়া, এখানে কে আমায় চেনে যে সাইনবোর্ড টাঙালেই ডজন ডজন ছাত্র-ছাত্রী জুটবে! শুধু শুধু সাইনবোর্ড করিয়ে কতকগুলো টাকা তোমার জলে না দিলে চলছিল না!”

সামান্য রাগান্বিত কণ্ঠে বলা বৈশাখীর কথাগুলো শুনে শুভম তার হাত দুটো জোড় করে বলল, “তোমাকে আগে না জানিয়ে বোর্ড করিয়েছি বলে মাফ চাইছি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমার রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে গেলে এছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না, প্লিজ তুমি রাগ কোর না, একটু শান্ত হয়ে আমার পাশে এই সোফায় বস, আমি সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।”

“কী আর বলবে? তুমি কি ভাবছ সাইন-বোর্ড টাঙালেই সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী জুটে যাবে? কে আসবে বল তো অজানা অচেনা এই বৈশাখী দত্তের কাছে?”

“ঠিক আছে সে এখন দেখা যাবে। আগে তো মানি রিসিট ছাপাই, ছাত্র-ছাত্রীদের রুটিন তৈরী করি তারপর দেখা যাবে! ও হ্যাঁ তোমাকে বলা হয়নি, আজ সকালেই মোটামুটি জনা দশেক ছাত্র-ছাত্রী ঠিক করে ফেলেছি এবং তাদের সকলকে আগামী

রবিবার সকালে পড়তে আসতে বলে দিয়েছি। তুমি যেন রবিবার সকালে ঠিক সাতটার মধ্যে এখানে এসে যেও।"

"ও বাবাঃ এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এর মধ্যেই আবার ছাত্র-ছাত্রীও ঠিক হয়ে গেছে? ওঃ আচ্ছা জিদ তো তোমার! আমি পড়াতে পারব কি পারব না, কী সাবজেক্ট পড়াব, সে সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তুমি ছাত্র আসতে বলে দিলে? আর আশ্চর্য হয়ে যাই আজকালকার ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের গার্জেনদের ব্যাপার স্যাপার দেখে! কে কোথাকার একটা কোচিং সেন্টার খুলে বসল আর অমনি মৌমাছির চাকের মতো তাতে ভিড় লেগে গেল। পড়াশুনার নাম করে, কোচিং-এ যাবার নাম করে আড্ডাবাজী কবাটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের যেন একটা হুজুগ হয়েছে!"

"উঁহু উঁহু, অতটা বলো না, তোমার বোধ হয় মনে নেই যে, এইখানে এই বাড়িতেই কর'স কোচিং সেন্টার বলে কিছুদিন আগেও একটা কোচিং সেন্টার ছিল, যেখানে তাবড় তাবড় স্কুলের নামকরা মাস্টার মশায়রাও তাঁদের ছেলেদের পড়তে পাঠাতেন! সেটা কি শুধু আড্ডার জন্যে, না ভালো রেজাল্টের জন্যে? জানো তো সেই কর'স কোচিং সেন্টারে পড়ে কত ছেলে কত ভালো ভালো রেজাল্ট করে আজ কেউ ডাক্তার হয়েছে কেউ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে।" এক সময় কর'স কোচিং সেন্টারের এমন নাম হয়ে গিয়েছিল যে কলকাতার বড় বড় স্কুলের ভালো ভালো ছেলেরাও জয়েন্ট এন্ট্রাস দেবার জন্য কলকাতা থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এখানে পড়তে আসতো। তারা কি শুধু আড্ডা মারবার জন্যে আসতো? তাছাড়া তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডা মারার সুযোগ দেবে কেন? এমনভাবে টাস্ক করিয়ে নেবে যাতে তারা আড্ডা মারার সুযোগ না পায়। পুরো ব্যাপারটা তো তোমার উপরেই নির্ভর করছে, তাই না?" কথাগুলো বলে শুভম বৈশাখীর মুখের দিকে তাকায়।

লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে শুভমের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই বৈশাখীও কিরকম যেন হয়ে যায়, তার মনে পড়ে কলেজে পড়তে পড়তে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রী, ম্যাথামেটিক্স, জুলজি, বোটানি যখন যেটাতে তার অসুবিধা হয়েছে সে অমনই দৌড়ে এসে শুভমের কাছ থেকে সে চ্যাপ্টারটা বুঝে নিয়ে গেছে। শুভম পাক্কা প্রফেসরের মতো তাকে প্রাঞ্জলভাবে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে বি. এস. সি. পাশ করার পর শুভম ঢুকেছে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আর সে নিজে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাশ করে পদার্থবিদ্যায় এম. এস. সি. করেছে। পুরোনো দিনের কথা ভাবতে গিয়ে তার খেয়াল পড়ে সত্যি কর'স কোচিং সেন্টারের একসময় খুব নাম ডাক হয়েছিল। ম্যাথামেটিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করবার পর ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাবার জন্য শুভমকে বাধ্য হয়ে ঐ কোচিং সেন্টার খুলতে হয়েছিল কিন্তু শুভমের সাধনা এবং পরিশ্রমের জোরে ঐ কোচিং সেন্টার সে সময়ে খুবই নাম করেছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার বছর খানেকের মধ্যে শুভম সরকারী

চাকরি পেয়ে যাওয়ায় তাকে কোচিং সেন্টার তুলে দিতে হয়েছিল। পাড়ার অনেকেই তাকে কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিল কিন্তু একদিকে সরকারী চাকরি করে বে-আইনীভাবে কোচিং সেন্টার চালাতে সে রাজী হয়নি, তাই সেন্টার তুলে দিয়েছিল। এখন আবার বৈশাখীর জন্য কিছু করতে গিয়ে নতুন করে সে সব প্রথমেই ঐ কোচিং সেন্টারের কথাটা ভেবে নিয়েছে। পুরো ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে শুভমের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বৈশাখী বলল,

"তুমি যা ভেবেছ আমি তাই-ই করব, কিন্তু মাথার উপরে তোমাকে থাকতে হবে, অনেক দিন যাবৎ আমার প্র্যাকটিস নেই সুতরাং আমার কোনো কিছু আটকে গেলে প্রথম প্রথম আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে, কি রাজী তো?"

"নিশ্চয়ই, তোমার অসুবিধা হলে আমি নিশ্চয়ই হেল্প করব। তবে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে, এর মধ্যে এই কদিনে তুমি সায়েন্স সাবজেক্টগুলোর বইপত্রগুলো একটু দেখে নিও। নাও এখন বল এবার চা খাবে তো?"

"না থাক, প্রায় নটা বাজল এত রাত্রে আর চা খাব না, পরে হবে এখন, হ্যাঁ একটা কথা, বৈশাখী কোচিং সেন্টারের যা রোজগার হবে তার অর্ধেক কিন্তু তোমার!"

"তা কেন? আমি কি বৈশাখী কোচিং সেন্টারের পার্টনার নাকি! এটা তো তোমার একেবারে নিজস্ব কোচিং সেন্টার!"

"তা হলেও, মশায়, ঘর ভাড়া বলে একটা কথা আছে, বুঝলে মশায়!"

"তুমি আমায় এতটা ছোট ভাববে তা বিশ্বাস হয় না বৈশাখী, প্লিজ এসব নিয়ে আর একটি কথাও নয়, তুমি রবিবার থেকে কাজ আরম্ভ কর, প্লিজ বৈশাখী প্লিজ।"

"কিন্তু ভাড়া তুমি না নিলে যে আমার মনে হবে তুমি আমায় দয়া করছ!"

"বৈশাখী! কি বলছ যা তা! জীবনে টাকাটাই সব! স্নেহ-ভালোবাসা প্রেম-প্রীতি এগুলো কী কিছুই নয়। তোমার আমার কলেজ জীবনের কথা আমাদের অঙ্গীকারের কথা তোমার কিছুই মনে নেই!"

"সব মনে আছে শুভম কিছুই ভুলিনি, কিন্তু এখন আর সে সব ভেবে লাভ কি? আমি আমি..........."

"কি আমি! বৈশাখী! কী বলতে চাইছ তুমি!" বলে শুভম তার মুখের দিকে চেয়ে দেখে যে সেখানে একটা রক্তিম যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে।

প্রায় কান্না জড়ানো কণ্ঠে বৈশাখী বলে, "বিয়ের আগের সে সব কল্পনা তো কল্পনাই রয়ে গেল, কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কোথায় তোমার কাছে আসব বলে যখন নিজেকে ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত করছিলাম ঠিক সেই সময় বর্ধমানের রণবীর দত্ত মশায় অরবিন্দ স্টেডিয়ামে একটা গানের জলসায় আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রায় বিনা পণে আমায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর ছোট ছেলের জন্য। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল আর আমার বিধবা মা মনে করলেন, যেন

হাতে স্বর্গ পেলেন, আর রণবীর দত্ত ভাবলেন যে এমন সুন্দরী স্ত্রী পেলে তাঁর ছোট ছেলে হয়তো কুপথ বর্জন করবে এবং সংসারী হয়ে ঘর সংসার করবে, কিন্তু হায়, কপাল আমার! মাস দু-য়েক না কাটতেই আমার মা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তুমি তখন দিল্লীর স্কুল অব আর্কিটেকচারে এক বৎসরের ট্রেনিং নিতে গেছ, আর ঠিক তখনই এই সমস্ত ঘটে গেল, তোমাকে যে একটা চিঠি দিয়ে জানাব সে সময়টুকুও কেউ আমায় দিল না, তোমার কাছে আমার লেখা চিঠি পৌঁছবার আগেই আমায় বিয়ে পিঁড়িতে বসতে হল।"

"থাক এসব কথা, অতীতকে পিছন থেকে তুলে সামনে এনে কী লাভ বল! বরং যে কঠিন ভবিষ্যতটা আপনা থেকেই সামনে এসে পড়েছে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কথা চিন্তা কর বৈশাখী। শক্ত হও। অতীতের সব ভাবনা সব চিন্তা সব গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াও, সমাজকে দেখিয়ে দাও যে, তুমি কেবল অন্নভোগী অসহায় কোনো অবলা নারী নও, তুমি একটা চকচকে তরবারী, যে তরবারী শুধু ঝনঝন করতেই জানে না প্রয়োজনে সব কিছু কেটে টুকরো করতে পারে। কী পারবে না বৈশাখী?"

শুভমের কথার শেষে তার মুখে দিকে চেয়ে বৈশাখী দেখে যে সেখানে প্রীতির স্নিগ্ধ ছায়া, স্নেহের সিক্ত আবেগ। তার মনে হয় শুভমের সমস্ত অবয়বেই যেন একটা স্থির প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা শুধুমাত্র পরস্ত্রী বৈশাখী দত্তকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনায় দৃঢ় হয়ে উঠেছে। সোফা ছেড়ে ধীর পায়ে উঠে সে শুভমের কাছে গিয়ে তার ডান হাতটা ধরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে, "পারব শুভম, তুমি পাশে দাঁড়ালে আমি সব পারব! সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে আমি সমাজকে দেখিয়ে দেব যে একটা মেয়ে, কেবলমাত্র মেয়েই নয়, সে একটা মানুষও বটে।" এরপর সে শুভমের হাতটায় সামান্য ঝাঁকানি দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

পরের রবিবার থেকে বৈশাখী কোচিং সেন্টারে পড়াশোনার কাজ চালু হয়ে যায় এবং সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে প্রায় জনা চল্লিশেক ছেলে-মেয়ে অ্যাডমিশন নেয়, অর্থাৎ বৈশাখীর মাসে প্রায় হাজার চারেক টাকা রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। বৈশাখী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের হেল্প করতে থাকে। তার ব্যবহারে এবং পড়াশোনার পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকেরা অত্যন্ত খুশী। বৈশাখী মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন অসুবিধার কথা আলোচনা করে, তাঁদের কথা শোনে এবং প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ ও অনুরোধ করতে থাকে।

ফলত বছরের শেষে গিয়ে দেখা যায় তার সেন্টারের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই অত্যন্ত ভালো ফল করেছে। অভিভাবকরা খুশী হয়ে উপহার হিসাবে তাকে কেউ মিষ্টি, কেউ শাড়ী, কেউ রিস্ট ওয়াচ ইত্যাদি দিতে হাজির হন। বৈশাখী তাঁদের বলে, "আমি আমার ডিউটি করছি এবং তার জন্য যথোচিত বেতন নিয়েছি! আমার ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট করেছে তার জন্য আমিও খুশী, কিন্তু এই সব মিষ্টি টিষ্টি উপহার-

সামগ্রী তো আমি নিতে পারব না!" তার কথা শুনে অনেক অভিভাবক বিমর্ষ হয়ে পড়েন। দু-একজন বলে ওঠেন, "তুমি তো শুধু দিদিমণিই নও। তুমি যে আমাদের পাড়ার মেয়ে! আমাদের ঘরের মেয়ে! আমাদের ঘরের মেয়েকে কি আমরা কিছু দিতে পারি না মা?" এমন ব্যাকুলভাবে তাঁরা কথাগুলো বলেন যে সেগুলো না নিয়ে বৈশাখীর আর কোনো উপায় থাকে না। মিষ্টিগুলো সে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় এবং অন্যান্য উপহার সামগ্রীগুলো একপাশে রেখে দেয়।

সবাই চলে গেলে সমস্ত উপহার-সামগ্রী সমেত বৈশাখী এসে শুভমের পায়ের তলায় নতজানু হয়ে বসে তাকে প্রণাম করে। শুভম তখন অন্য একটা ঘরে সোফায় বসে মেট্রো টানেলের একটা ড্রয়িং দেখছিল। হঠাৎ বৈশাখীকে এইভাবে প্রণাম করতে দেখে চমকে তার ডান হাতখানা ধরে বলে ওঠে, "আরে করছ কি? হঠাৎ প্রণাম কেন?"

বৈশাখী বলে, "সবই তো তোমার জন্যে? তুমি না ব্যবস্থা করলে এসব তো আমি ভাবতেই পারতাম না।" সে যখন এই কথাগুলো বলছিল, তখন জানত না যে তার জীবনের সব থেকে বড় চমকটি তার জন্য অপেক্ষা করছে। ড্রয়িংটা টেবিলের উপর ছেড়ে তার চোখে চোখ রেখে শুভম বলে, "আর একটা খবর তোমাকে দেবার আছে, তুমি শোনবার জন্যে প্রস্তুত তো?"

বৈশাখী কিছুটা বিস্মিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে—

"কী খবর! খারাপ কিছু নয় তো?"

"খারাপ কি ভালো সেটা তোমার ব্যক্তিগত মতামতের বা চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে—"

"আঃ তুমি বড্ড হেঁয়ালী কর, খবরটা কী তাই বলবে তো?"

"খবরটা হল, আজ দুপুরে বর্ধমান থেকে তোমার উকিল শঙ্করবাবু আমার অফিসে টেলিফোন করে জানিয়েছেন তুমি কোর্টের এক তরফা ডিক্রি পেয়ে গেছ, অর্থাৎ ডিভোর্স পেয়ে গেছ। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখে আদালত তোমায় ঐ ডিক্রি দিয়েছেন এবং ওরা কনটেস্ট করতে আসেইনি। এবার তাহলে তুমি মুক্ত!"

"কিন্তু মুক্তি তো আমি চাইনি, আমি মুক্তি চেয়েছি কাঁটায় ভরা ঐ প্রথম খাঁচার জগত থেকে, যেখানে নড়াচড়া করতে গেলেই আমার সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরতো!" এরপর দু-চার সেকেন্ড নীরব থেকে সোজাসুজি শুভমের চোখের দিকে তাকিয়ে বৈশাখী বলে, "শুভম তুমি কি পারো না, যে হাত তুমি ধরে রয়েছ ঐ হাত দুটোকে বাকি জীবনটার জন্যে ধরে রাখতে? পারো না শুভম? আমাকে বাবুই পাখীর মতো ছোট্ট একটা খাঁচার দ্বিতীয় জগত উপহার দিতে?"

তার একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শুভম হাত দুটো ছেড়ে দেয়। তার এই হাত ছেড়ে দেওয়া দেখে বৈশাখীর মুখটা মুহূর্তে আরক্ত হয়ে ওঠে, সে অত্যন্ত দ্রুততায় মাথাটা নীচু করে মনে মনে ভাবতে থাকে 'ইস্‌স্‌ ডিভোর্সের খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে

কাঙালিনীর মতো সে আশ্রয় ভিক্ষা করে ফেলেছে, ইস্‌স্‌ শুভম কিই না ভাবল! মাটির দিকে চোখ রেখেই বৈশাখী অনুভব করে কার যেন দুটো হাত তার পিঠের পাশ দিয়ে জড়িয়ে তাকে ধীরে ধীরে বুকের কাছে টেনে নিচ্ছে! এক অস্থির চঞ্চলতার কম্পমান আবেগে থর থর করে সে ঝরে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে শুভম তাকে সজোরে বুকে জাপটে ধরে, "হ্যাঁ বৈশাখী এখন থেকে তুমি এই বাবুই পাখীর খাঁচার দ্বিতীয় জগতে নিরাপদ আশ্রয়েই থাকবে। কাঁটার আঘাতে আর তোমায় রক্তাক্ত হতে হবে না। কি খুশী তো?" বলে তার চিবুক ধরে শুভম নিজের ঠোঁটের কাছে টেনে নিয়ে আসতে থাকে।

বৈশাখী বলে, "যাঃ কী হচ্ছে কী? দাঁড়াও আগে রেজিস্ট্রিটা হোক! তোমায় একটা প্রণাম করি। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে দু-ফোঁটা অশ্রু শুভমের পায়ের পাতা সিক্ত করে দেয়। শুভম তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে বৈশাখীকে তুলে বলে ওঠে, "একি! সব ফিরে পেয়েও তুমি কাঁদছ যে?" তার বুকে মাথাটা ঘষতে ঘষতে বৈশাখী বলতে থাকে, "নাঃ শুভম এ কান্না নয়, এ যে কত বড় আনন্দের অশ্রু তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, সত্যি শুভম তুমি এত বড়! তুমি এত মহান!"

নিবিড় করে বৈশাখীর মুখটা বুকে চেপে ধরে শুভম বলে ওঠে, "না ম্যাডাম, আমি মহানও নই আর বড়ও নই, আমি শুধু শুভম, এবার থেকে তোমার শুভম।"

দ্বিতীয় জগৎ

অফ পিরিয়ডে 'শিশু নিলয়' স্কুলে টিচার্স-রুমে বসে খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে কাগজটার উপরেই মাথা নামিয়ে সংহিতা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। স্বভাবে হাসিখুশী বাংলার দিদিমণি সংহিতাকে আচম্বিতে ঐভাবে কেঁদে উঠতে দেখে পাশের চেয়ার থেকে অঙ্কের দিদিমণি বেলা উঠে তার পাশে এসে পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, "কী হল ভাই সংহিতা তুমি কেঁদে উঠলে কেন? কী হয়েছে বল প্লীজ! কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ এমনভাবে কেঁদে উঠলে কেন? প্লীজ শান্ত হও, প্লীজ!"

"আমার যে সব শেষ হয়ে গেল বেলাদি, আমার যে সব শেষ হয়ে গেল!" বলে বেলার হাতটা ধরে তার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। সংহিতার কথায় কিছুই বুঝতে না পেরে চট করে তার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বেলা দৌড়ে পাশের ক্লাসরুমে প্রধান শিক্ষয়িত্রী সরিতাদিকে গিয়ে চুপি চুপি খবরটা দিতেই ছাত্রদের চুপ করে একটু পড়াশুনা করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি টিচার্স-রুমে এসে সংহিতার মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে তোর, সংহিতা, আমাকেও বলবি না! বল না বোন কী এমন হয়েছে, যার জন্য তুই স্কুলে বসে এভাবে কাঁদছিস!" বড়দির সস্নেহ স্পর্শে সংহিতা শুধু একবার অশ্রুসজল চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আমার সব শেষ হয়ে গেল বড়দি, আমার সব শেষ হয়ে গেল! আচ্ছা তুমিই বল বড়দি এরপর আমার আর বেঁচে থেকে কী লাভ!"

কথাগুলো বলে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে টলতে টলতে সে দরজার দিকে পা বাড়াল। টলমল পায়ে তার এই চলে যাওয়া দেখে বড়দি প্রশ্ন করলেন, "কী হল এ অবস্থায় তুই চললি কোথায়?" "জানি না কোথায় যাব!" বলে সে প্রায় দৌড়তে লাগল। তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে সচকিত বড়দি বেলাকে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। টেবিল থেকে সংহিতার সাইড-ব্যাগটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেলা সংহিতার পিছনে হাঁটতে লাগল এবং কয়েক পা হাঁটার পর প্রায় দৌড়ে গিয়ে শক্ত করে তার একটা হাত ধরল।

স্কুল থেকে শ-দেড়েক পা হেঁটে রিকশা-স্ট্যান্ডে এসে বেলা সংহিতাকে একটা রিকশায় চাপিয়ে তার শিবপুরের কৈপুকুরের বাড়ির দিকে যেতে নির্দেশ দিলে মিনিট বিশেকের মধ্যে রিকশা এসে সংহিতার বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। ব্যাগটা খুলে বেলা রিকশা ভাড়া মেটাতে মেটাতে সংহিতা এক একদৌড়ে দোতালায় গিয়ে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেলাও সেখানে এসে পড়ল।

অসময়ে তাকে ঐভাবে আসতে দেখে এবং তার সঙ্গে বেলাকে দেখে সংহিতার মা রমলা দেবী এবং ছোটদি সঙ্গীতা এসে তার ঘরে ঢুকে দেখল সংহিতা ভীষণ কাঁদছে। কান্নার বেগে তার গোটা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিস্মিত হয়ে সংহিতার কাছে গিয়ে রমলা প্রশ্ন করলেন, " কী হল তোর মা. তুই অমন করে কাঁদছিস কেন? ছোটদিও তার মুখটা ঘুরিয়ে সোজা করার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করল, "কী রে কী হল তোর, তুই অমন করে কাঁদছিস কেন! কী হয়েছে বল! শরীর খারাপ! কী কষ্ট হচ্ছে বল!"

রমলার এবং সঙ্গীতার কথা শুনে বেলা বলল, স্কুলে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ কি যে হল ওর, ঐখানে বসেই কান্না জুড়ে দিল। আমি, বড়দি কতবার জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কিছুতেই বলল না. শুধু একবার বলল, আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমার সব শেষ হয়ে গেল। বেলার কথা শেষ হতে না হতে রমলা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্কুলে কী কাগজ পড়ছিল?" বেলা বলল, "আনন্দবাজার।" এরপর রমলা সঙ্গীতাকে বললেন, "যা তো মা, আমার ঘর থেকে আনন্দবাজারটা নিয়ে আয় তো দেখি, কী রকম খবর তাতে আছে, যা দেখে ও এমন করছে। বল না মা তোর কী হয়েছে। আনন্দবাজারে কী কোনো খারাপ খবর দেখেছিস? তোর দাদাদের কারও কোনো খবর নেই তো!" বলতে বলতে পুত্রদের অমঙ্গলের আশঙ্কায় রমলা দেবীর চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল।

ইতিমধ্যে সঙ্গীতা আনন্দবাজারটা নিয়ে এ ঘরে ঢুকে সেটা বেলার হাতে দিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বেলা বলল, "এই যে তিনের পাতায় এই জায়গাটায় দেখতে দেখতে ও হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল!" বলে হাত দিয়ে কাগজের বিশেষ একটা জায়গায় নির্দেশ কবল। তাদের কথোপকথনের মাঝখানে সংহিতা একবাব বলে উঠল, "কাগজটা তোমরা এখান থেকে নিয়ে যাও, প্লীজ ঐ কাগজটা আমার কাছে রেখো না, প্লীজ বেলাদি প্লীজ!"

তার কথা শুনে বেলা ও সঙ্গীতা কাগজটা নিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে তিনের পাতাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে রমলাও এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "বেলা! মা, কাগজটা আমায় দাও তো আমি একবার দেখি।" তাঁর হাতে কাগজটা দিতে তিনি চোখ বুলোতে বুলোতে দেখলেন এক জায়গায় ছোট্ট করে 'শোক সংবাদ' শীর্ষক একটি সংবাদ রয়েছে, সেটি পড়তে পড়তে তিনিও কেঁদে ফেললেন।

আচম্বিতে মাকে অঝোরে কাঁদতে দেখে, সঙ্গীতা প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাতেই, মা সংবাদপত্রের ঐ জায়গাটা তাকে দেখিয়ে দিলেন। রমলার নির্দেশিত জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে সে বুঝল বোন সংহিতার কেন এত কান্না! কিন্তু বেলা ব্যাপারটায় বিশেষ গভীরতা খুঁজে না পেয়ে ঘরে ঢুকে সংহিতার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে ফেলল, "উনি কি তোমার বিশেষ পরিচিত কেউ ছিলেন? যদি

তাই-ই হয়, তাহলেও আত্মীয় নয় বন্ধু নয় সামান্য একজন পরিচিত মানুষের জন্য তোমার মতো বুদ্ধিমতী মহিলার এত কান্না কি ঠিক? প্লীজ সংহিতা একটু চুপ কর, নাও ওঠ, নিজেকে শক্ত করে চোখে মুখে জল দাও, নাও ওঠ!"

"আঃ বেলাদি তুমি বুঝবে না, প্লীজ তুমি আমায় একটু কাঁদতে দাও!" মেয়ের কথা শুনে রমলা বেলাকে, "ওকে একটু কাঁদতে দাও মা, তুমি বরং সঙ্গীতার সঙ্গে ওঘরে গিয়ে একটু বোস, ও শান্ত হলে আমি তোমায় ডাকব, বলে তিনি ক্রন্দনরত মেয়ের পাশে বসে তার মাথায় ঘাড়ে পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন। মায়ের সস্নেহ স্পর্শে, মুখটা ঘুরিয়ে তাঁর কোলে গুঁজে দিয়ে নিরাশ্রয় শিশুর মতো সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার আবেগে বলল, "আমার এই চৌত্রিশ বছরের জীবনে ঐ একটিই বন্ধু ছিল, ওকে দেখার আগে আমি কাউকে কোনোদিন ভালবাসতে পর্যন্ত পারিনি, আর ও নিজে এভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আমি একবার চোখের দেখা দেখতে পর্যন্ত পেলাম না। তুমি ছাড়া এ সংসারে আমাকে বুঝত ঐ একটি মানুষ! সেই মানুষটা এত নিষ্ঠুর হতে পারল মা!"

ব্যক্তিগত শোকের আবেগে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে সংহিতা বহু কিছু বলে চলল এবং রমলা তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন।

মর্নিং স্কুল, তাই বেলা এগারটায় স্কুল শেষ করে ততক্ষণে হেড দিদিমণি মিসেস সরিতা দত্ত এসে সংহিতাদের বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে তাকে তখন পর্যন্ত কাঁদতে দেখে সরিতা বললেন, "এ কি সংহিতা, তুমি এখনও কাঁদছ? আচ্ছা মাসীমা কী হয়েছে বলুন তো ওর?" সরিতার কণ্ঠস্বর শুনে ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে, বেলা সঙ্গীতা বের হয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। সরিতার হাত ধরে তাঁকে বাইরে টেনে এনে বেলা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তিনি বললেন, "তাহলে ও নিশ্চয়ই তাঁকে খুব ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত! কিন্তু কই আমরা তো কোনোদিন ওর মুখে তাঁর নামটা পর্যন্ত শুনিনি! অবশ্য এমনিতেই ও খুব চাপা মেয়ে, নিজের দুঃখ কষ্টের কথা কাউকে বলে সহানুভূতি কুড়োবার পাত্রী নয়। তাই বলে এতবড় একটা খবর ওর কাছ থেকে আমরা কোনোদিনই জানতে পারিনি!"

বড়দির কথাগুলো শুনে বেলা বলল, "হ্যাঁ বড়দি, জেনেছি আমরা সবাই, কিন্তু বুঝিনি। দোষটা সংহিতার নয় দোষটা আমাদের, কারণ আমরা উপরে উপরেই ওকে দেখেছি, ওর অন্তরের গভীরতাটার দিকে কোনোদিন চেয়ে দেখিনি। কতবার কতদিন সংহিতা ঐ ভদ্রলোকের লেখা কবিতা গল্প উপন্যাস গানের বই এনে আমাদের দেখিয়েছে পড়িয়েছে, আমরা দিনের পর দিন ওঁর লেখা নিয়ে কত আলাপ আলোচনা করেছি কিন্তু সংহিতার কাছে উনি যে এক অনন্য মানুষ ছিলেন, এটা ভাববার মতো বুদ্ধি আমাদের কারোরই মাথায় আসেনি।"

বেলার কথার উত্তরে সরিতা ছোট্ট করে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু সংহিতা যে ভিতরে ভিতরে ওঁকে এত ভালোবাসত তা তো ও নিজে আকারে ইঙ্গিতে

কোনোদিন বুঝতে দেয়নি। এ সংসারে বন্ধুত্বের সূত্রে, মেলামেশার সূত্রে, আমরা মেয়েরা নিজেদের অনেক কথাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি কিন্তু ও! ও তো কোনোদিন তা করত না, ও বরং কারও সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো আলোচনা হলেই হয় সেখান থেকে দূরে চলে যেত, নয়তো কোনো বই নিয়ে তাতে মুখ গুঁজে পড়তে লেগে যেত। ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোককে যে এত গভীরভাবে ভালোবাসত এবং সেই ভালোবাসাকে একেবারে অন্তরের অন্তরতম স্থানে পোষণ করত তা বোঝবার মতো কোনো অবকাশই কাউকে কোনোদিন দেয়নি।" বেলার সঙ্গে কথাগুলো বলে বারান্দা থেকে সংহিতার ঘরে ঢুকে তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সরিতা বললেন, "সংহিতা তুমি চুপ কর প্লীজ, কাঁদলে তিনি ফিরবেন না বোন, বরং তাঁর আত্মার কষ্টই হবে আর তোমারও শরীর খারাপ হবে, প্লীজ সংহিতা, প্লীজ তুমি শান্ত হও!"

কথাগুলো বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বড়দি দেখলেন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এরপর তাঁরই ইঙ্গিতে বেলা সেখান থেকে বের হয়ে এল এবং রমলা দেবীকে বলল, "আমরা এখন আসছি মাসীমা, বিকেলে আবার আসব। দেখুন, সান্ত্বনা দিয়ে একে যদি একটু চুপ করাতে পারেন।" সরিতার কথায় রমলা দেবী মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতেই সরিতা দেখতে পেল তাঁর চোখেও অজস্র ধারায় অশ্রু বয়ে চলেছে। এ দিকে মা ও বোনের কষ্ট দেখে সঙ্গীতাও আঁচলে চোখ মুছছে।

সবার এই শোকাহত অবস্থা দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সরিতা বেলাকে বলল, "ভদ্রলোক এ বাড়ির সবারই এত স্নেহ ভালোবাসা কুড়িয়েছেন যে তাঁর এই আচম্বিতে চলে যাওয়াটা এ বাড়ির কারোরই সহ্য হচ্ছে না। অথচ আশ্চর্য দেখ সংহিতার সঙ্গে এত গভীর ভাবে মিশেও আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারিনি!" তাঁর কথায় বেলা বলল, "সংহিতা আসলে লেখাপড়া জানা সাধারণ মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। দেখুন না ও গান জানে, নাচ জানে, আবৃত্তি জানে ও নাটক করতে পারে, ইলেকট্রিক অরগ্যান বাজাতে পারে, লেখাপড়াতেও ওর ক্যারিয়ার কত ব্রাইট, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো দিন কোনো অহঙ্কার দেখেছেন? এতটুকু অহঙ্কার! স্কুলের সব ফাংশানেই ও দশভূজা রূপে সব দিক সামাল দেয় কিন্তু কোনোদিন ওর মুখে এতটুকু রাগ অভিমান বা অহঙ্কার দেখেছেন?" বেলার কথার খেই ধরে বড়দি সরিতা বললেন, "সত্যিই ও যেন অনন্যা, ও যেন অপরূপা।" যাক, তুমি চারটে নাগাদ এখানে আবার এসো, আমিও আসব। সংহিতা খুবই ভেঙে পড়েছে, ওকে যতক্ষণ না শান্ত দেখছি ততক্ষণই আমার খুব খারাপ লাগবে! তুমি এসো কিন্তু।" তাঁর কথার উত্তরে বেলা বলল, "আমি হয়তো আগেই এসে যাব," বলে নিজের বাড়ির রাস্তা ধরল এবং বড়দিও একটা রিকশা ধরে মন্দিরতলার দিকে যাত্রা করলেন।

স্কুলের দিদিভাইরা চলে যাবার পর রমলা মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "হ্যাঁরে, খবরের কাগজে তো বিশেষ কিছুই লেখেনি কিন্তু একেবারে হঠাৎ এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, তুই কি কিছুই জানতিস না কী হয়েছিল শ্রীদীপের! এর মধ্যে তোর সঙ্গে কি দেখা হয়নি! কোনো কথা হয়নি!"

মায়ের কথায় তাঁর কোল থেকে মুখটা সামান্য তুলে সংহিতা বলল, "গত প্রায় একমাস ওঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা কিছুই হয়নি, তাছাড়া ওঁর তো সিরিয়াস তেমন কিছু অসুখ বিসুখও ছিল না, কাগজেও দেখ লিখেছে, 'সামান্য রোগ ভোগের পর...' কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না।" কথাগুলো বলে মায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরে সে আবার শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠল। আর কেউ না জানুক রমলা দেবী তো জানতেন তাঁর সংহিতা শ্রীদীপকে কতখানি ভালোবাসত, কতখানি শ্রদ্ধা করত। শুধু রমলা দেবীই বা কেন, তাঁর বিরাট সংসারের সকলেই শ্রীদীপকে চোখের মণির মতো ভালোবাসত। সে একদিন ফোন না করলে বা এক সপ্তাহ ওঁদের বাড়িতে না এলে সবাই সংহিতাকে অস্থির করে তুলত। সেজদি নম্রতা তো অনেক দিন নিজেই ফোন করে শ্রীদীপকে আসার জন্য পীড়াপীড়ি কবত। শ্রীদীপও অনেক দিনই হাতের সব কাজ ফেলে সময়ের হিসেব না করে এ বাড়িতে চলে আসত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁদের সঙ্গে গল্পে মেতে যেত।

বহুক্ষণ কান্নাকাটির পর রমলা এবার মেয়েকে বললেন, "এবার ওঠ মা, এভাবে সারাদিন কাঁদলে তো সে ফিরবে না, সেই কোন সকালে দু-পীস পাউরুটি আর চা খেয়ে স্কুলে গেছিস, এবার ওঠ উঠে মাথায় গায়ে জল ঢেলে দুটো কিছু মুখে দে, না হলে শরীর খারাপ হবে যে! বেলা প্রায় দেড়টা বাজল, এবার ওঠ।" কথাগুলো বলতে বলতে তিনি তাকে ওঠাবার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু সংহিতা পাশ থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে তাতে মুখটা গুঁজে দিয়ে একইভাবে কাঁদতে থাকে। তার অবস্থা দেখে রমলা ও সঙ্গীতা দুজনেই বুঝতে পারেন যে ঠিক এই মুহূর্তে ওকে ওঠানোও যাবে না, আর সান্ত্বনা দিয়ে ওর কান্নাও থামানো যাবে না, স্নান করানো খাওয়ানো তো দূরের কথা। রমলা দেবী ও সঙ্গীতা তাই সংহিতার পাশে চুপচাপ বসেই থাকেন এবং মাঝে মাঝে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

ঘণ্টা তিনেক এভাবে কেটে যাবার পর বেলা প্রায় চারটে নাগাদ নম্রতা অফিস থেকে ফিরে সব শুনে কাঁধের ব্যাগটা মেঝেয় ছুড়ে ফেলে সংহিতাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার কান্না শুনে সংহিতার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ নম্রতা সংহিতাকে ছেড়ে ঘরের চারিদিকে একবার ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে অচেতন হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তার এই অবস্থা দেখে সঙ্গীতা তাড়াতাড়ি ফ্রীজ থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে বার কয়েক ছিটে মারতে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়ে নম্রতা প্রথম কথা যেটা বলল, সেটা শুনে সবাই চমকে উঠল। সংহিতার উদ্দেশ্যে সে বলল, "তুই কেন কাঁদছিস, আয় আমার কাছে আয়, আমার বুকে তোর কান দুটো ঠেকিয়ে দেখ সে কথা বলছে, সে হাসছে, সে আবৃত্তি করছে, ঐ তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে!" বলতে বলতে উঠে সে ঘরের দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে এগোতে লাগল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীতা তাকে না ধরে ফেললে, সে আবার পড়ে যেত। ধরে প্রায় জোর করে সঙ্গীতা

তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। বিছানায় শুয়ে সে আবার সংহিতার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। লবণাক্ত নীরব অশ্রুতে তার মনের দুঃখ যন্ত্রণা গলে গলে পড়তে লাগল। শুধুমাত্র তার শরীরের কম্প দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে অঝোরে কেঁদে চলেছে। দুই বোনে যখন এইভাবে শিশুর মতো কাঁদছে এবং বেলা গড়িয়ে পাঁচটার ঘরে ধাক্কা দিচ্ছে এমন সময় সরিতা ও বেলা এসে প্রবেশ করল। তাদের ঢুকতে দেখে রমলা বলে উঠলেন, "এসো মা এসো, দেখ তো এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেঁদে চললে মানুষ বাঁচে! তোমরা দেখ তো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদের দুই বোনকে ভোলাতে পারো কিনা।" কথাগুলো বলে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে আবার ফিরে এলেন।

তাঁকে দেখে সরিতা বললেন, "আপনাদের কারোরই খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয় এবেলা!" "কী করে আর হবে! ঐ মেয়েরা যদি কিছু মুখে না দেয়...." রমলার কথা শেষ হতে না হতে সরিতা বললেন, "বুঝেছি মাসীমা, কিন্তু এভাবে চললে তো ওদের শরীর খারাপ হবে। আমি বরং ডাক্তার চ্যাটার্জীকে ডেকে এনে ওদের সিডেটিভ দিইয়ে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করি!" কথা শেষ করেই তিনি বেলার উদ্দেশ্যে বললেন, "চলতো বেলা, দেখি ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যায় কিনা!"

সরিতার কথা শুনে, সংহিতা মুখটা ঘুরিয়ে তাঁকে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার মাথাটা ঘুরে গেল এবং সে আবার কাত হয়ে বিছানায় পড়ে গেল। শুধুমাত্র হাতের ইঙ্গিতে সরিতাকে ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করল এবং বিছানার দু-পাশের চাদর খামচে ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসল। সে উঠে বসতেই বেলা তার পিঠে দুটো বালিশ গুঁজে দিতে গেল কিন্তু সে খুব কষ্টের সঙ্গে বেলাকে বলল, "আমার কিছুই লাগবে না, আমি ঠিক আছি।" কথাগুলো যখন সে বলছে তখনও অজস্র ধারায় তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তার দুটো হাত ধরে সরিতা বললেন, "আচ্ছা সংহিতা, তোমরা যে ভদ্রলোককে এত ভালোবাসতে এত শ্রদ্ধা করতে কিন্তু কই কোনোদিন তো আমাদের কাছে বলনি।" একথার উত্তরে, সরিতার দিকে তাকিয়ে সংহিতা খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল, "কাউকে ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা করার কথা কি পাঁচজনকে বলে বেড়াবার কথা! ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা তো অন্তরের সম্পদ, তা নিয়ে হৈ হৈ করার আর কী আছে বলুন!"

সংহিতার কথায় তার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চেয়ে সরিতার খুব মায়া হল, এই মুহূর্তে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে বুঝেও আবার বললেন, "ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়! কী ভাবেই বা হল।" তাঁর এ কথার উত্তরে সে বলল, "জ্ঞান হয়ে অবধি যে রকম মানুষের খোঁজে ঘুরছি, আজ গত ষোল বছর ধরে হাটে মাঠে যে রকম বন্ধুর খোঁজ করছি সে রকম একজন মহাপ্রাণ মানুষের কথা আপনি এক্ষুণি শুনতে চান? মাফ করুন সরিতাদি আজ আমায় মাফ করুন প্লীজ, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! পরে একদিন বলব।" এরূপ উত্তরে সরিতা আর কিছু বলতে

সাহস করেন না, শুধু তার হাত দুটোয় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "আজ তবে থাক। কিন্তু আমার শুনতে আগ্রহ হচ্ছে এই জন্য যে, যে মানুষ তোমার মতো গুণবতী মহিলার ভালোবাসা পেয়েছেন, শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তিনি কত বড় মানুষই না ছিলেন। শুধু তুমিই নও, আমি তো দেখছি ভদ্রলোক এ বাড়ির সকলকেই যেন তাঁর জাদুতে বন্দী করে রেখে গেছেন। সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে যে আজকের এত টানা-পোড়েনের যুগে দ্বিধা দ্বন্দ্বের যুগে, অবিশ্বাস অকর্তব্যের যুগে, এমন মানুষও ছিলেন যিনি আত্মীয় না হয়েও হৃদয় নিঙরে এতগুলি প্রাণীর চোখের জল বের করে নিলেন। সত্যিই আমার খুব ইচ্ছা করছে জানতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসছে।"

সরিতার কথাগুলো শুনে সংহিতা কিছুটা আত্মমগ্ন কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ সরিতাদি আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হলে আপনিও তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, বলব আমি অবশ্যই বলব, তবে আজকে নয়, প্লীজ আজকে আমাকে মাফ করুন!" কথাগুলো বলতে বলতেই সেজদি নম্রতার দিকে ঘুরে তার পিঠে ঠেলা দিয়ে সে বলল, "এ্যাই সেজদি ওঠ, কেঁদে আর কী হবে বল! তিনি তো আর ফিরবেন না। নে ওঠ, অফিস থেকে ফিরেছিস, উঠে হাতমুখে জল দিয়ে একটু চা কর! দেখ আমার জন্য মায়ের ছোটদির কারোরই আজ খাওয়া হল না, ওঠ একটু চা কর।"

সংহিতার এ কথায় বেলা সঙ্গীতার উদ্দেশে বলল, "চল তো ছোট, আমাকে একটু চা চিনিগুলো দেখিয়ে দাও তো, আমি তোমাদের চা করে দিচ্ছি।" বেলার কথায় সঙ্গীতা তাকে কিচেনের দিকে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিল। ইতিমধ্যে সংহিতা উঠে বিছানা থেকে নামতে যেতেই আবার মাথাটা ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে সে মেঝেয় বসে পড়ল। তার অবস্থা দেখে সরিতা হাত দুটো ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করলেন। কয়েক পা হাঁটবার পরেই সে স্বাভাবিক ভাবে বলল, "ছেড়ে দিন, আমি এবার ঠিক চলতে পারব।" কথা শেষ করেই সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল এবং বেশ কয়েক বালতি জল গায়ে মাথায় ঢেলে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে পুনরায় এসে ঘরে ঢুকেই নম্রতাকে ওঠবার জন্য ধমক লাগাল।

তার বকুনিতে নম্রতাও ধীরে ধীরে উঠে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে শাড়ি বদলে, সেও এসে সেখানে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে বেলা সকলের জন্য চা এবং খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। চা পানান্তে আরও কিছু টুকিটাকি কথাবার্তার পর সরিতা ও বেলা বিদায় নিল। যাবার সময় সরিতা ও বেলা দুজনেই আর কান্নাকাটি না করার জন্য ওদের সকলকে বারবার অনুরোধ করে গেল।

ওরা যাবার পর রমলাদেবী সঙ্গীতার উদ্দেশ্যে বললেন, "সারাদিন কারও পেটে কিছু পড়ল না, যা এবার রাতের রান্নার ব্যবস্থা কর।" মায়ের একথায় সংহিতা বলে উঠল, "আমি আজ রাতে কিচ্ছু খাব না, যা করার তোমাদের তিনজনের জন্য কর।"

মেয়ের একথা শুনে কাছে এসে ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে রমলা বললেন, "না খেলে পিত্তি পড়ে শরীর খরাপ হবে মা, তুই কি বাচ্চা মেয়ে, সব বুঝেও তুই কেন এরকম করছিস।" "সত্যি মা, বিশ্বাস কর আমার একেবারে কিচ্ছু ভালো লাগছে না, খাবারের কথা শুনলে এখন গা গুলিয়ে উঠছে, দোহাই মা, আজকের রাতটুকু আমাকে আর কিছু খেতে বোলো না।"

কথাগুলো সংহিতা এমনভাবে বলল, যে, রমলা আর কথা বাড়ালেন না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গীতা রান্নার ব্যবস্থা করার আগে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে নিয়ে মায়ের কাছে এসে প্রশ্ন করল, "রাত্রে কী রান্না হবে মা?" রমলা বললেন, সংহিতা যখন খাবে না বলছে তখন থাক না, আজ না হয় রান্না নাই ই করলি! ওবেলা ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, তরকারীও তো সবই পড়ে আছে, ঐ গরম করে নিয়ে তোরা দুইবোনে খেয়ে নিস আর আমি না হয় দু-চার পীস পাউরুটি খেয়ে নেব!"

মায়ের এ কথায় সঙ্গীতা স্বস্তি পেল, কারণ রাতের জন্য রান্না করতে যেতে তারও ভালো লাগছিল না। শ্রীদীপকে মনে মনে সেও যথেষ্ট ভালোবাসত! তাই, দুঃসংবাদটা জেনে থেকে তারও খুবই কষ্ট হচ্ছিল। বরাবরই সে একটু চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির। নিজের কাজকর্ম ভিন্ন বাইরের কোনো বিষয় নিয়ে বেশী হৈ হৈ করা তাব ভালো লাগে না, তাছাড়া শোক দুঃখ ইত্যাদিতে সে কোনোদিনই একেবারে ভেঙে পড়ে না। বুকের ভিতরে হাজার তুফান বয়ে গেলেও, তার বাইরেটা দেখে অনেক সময়ে বোঝাই যায় না যে, তার বুকের ভিতরে কতখানি উথাল-পাথাল চলছে। এমনই ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মহিলা, সঙ্গীতাও আজ বেশ ভেঙে পড়েছিল। মায়ের কাছ থেকে ঘুরে সে সংহিতার পাশে এসে বসল। এরপর তিন বোনে মিলে শ্রীদীপকে নিয়ে কত কথা হ'তে থাকল। পুরনো দিনের নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সংহিতার চোখ ছাপিয়ে বার বার জল ঝরতে লাগল। এভাবেই কখনো কথা কখনো কান্না মিশিয়ে সে রাত্রিটা কেটে গেল।

পরের দিন ছিল পনেরই আগষ্ট, স্কুল ছুটি, কিন্তু জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং দেশপ্রেমের গান ইত্যাদি নিয়ে সকাল সাতটা থেকে বেলা নটা পর্যন্ত একটি ছোটখাট অনুষ্ঠান আছে। এ কথা মনে হতেই সংহিতা শোকাহত আচ্ছন্ন ভাবটা দূরে সরিয়ে বিছানায় উঠে বসল। একটু আড়মোড়া ভেঙে দু-চার মিনিট পরে খাট থেকে নেমে বাথরুমের উদ্দেশ্যে যাবার জন্য মেঝেয় পা রাখতেই বুঝতে পারল চব্বিশ ঘণ্টায় তার শরীরটা কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোন রকম টলতে টলতে স্কুলে যাবার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী ব্রাউন পাড়ের একটা সাদা শাড়ি পরে সে একটা রিকশা নিয়ে স্কুলে যখন গিয়ে পৌঁছল তখন ঘড়িতে সকাল সাড়ে ছ-টা। ধীরে ধীরে তাকে স্কুলে ঢুকতে দেখে বেলা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তার হাত দুটো ধরল এবং মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর মুখটা ভীষণ

শুকনো শুকনো লাগছে। গতকালের অতবড় একটা ধকলের পর আজকে না এলেই হতো, আমরা না হয় কষ্ট করে চালিয়ে নিতাম।" "তা হয় না বেলাদি! গত একমাস ধরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে রিহার্সাল করিয়েছি আর আজকে যদি না আসি তাহলে ওদের যে মন খারাপ হবে, সব উল্টোপাল্টা করে বসে থাকবে!" বলে সে গিয়ে টিচার্সরুমে প্রবেশ করল।

সংহিতা টিচার্সরুমে ঢুকতেই, হেড দিদিমণি সরিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "ও তুমি এসেছ! আমি তো ভেবেই মরে যাচ্ছিলাম যে, কী করে কি সামলাব। যাক তুমি একটু বসে রেস্ট নিয়ে নাও, তারপর স্কুল কম্পাউন্ডের মঞ্চে গিয়ে ব্যবস্থা ট্যবস্থাগুলো দেখ!" ·

সরিতাদির কথা মতো মিনিট দশেক চেয়ারে বসে সংহিতা অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে হাজির হল। তার সঙ্গে সঙ্গে বেলা এবং আরও জনা তিনেক দিদিমণি সেখানে উপস্থিত হ'ল। অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে দেখল, যে, যারা গান গাইবে এবং নাটক করবে তারাও সকলে যথোচিত পোশাকে সজ্জিতা হয়ে অপেক্ষা করছে। এখন শুধু স্কুলের সেক্রেটারী এবং স্থানীয় কিছু কিছু বিশিষ্ট মানুষের আসার অপেক্ষা। আরও মিনিট দশেক কাটাবার পর সেক্রেটারী অধ্যাপক রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, স্কুল কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য এবং স্থানীয় বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে ঠিক সাতটায় জাতীয়-সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হ'ল। জাতীয় সঙ্গীত শুরু হতেই রঞ্জন-বাবু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। এরপর বেশ কয়েকখানি দেশপ্রেমের গান পরিবেশিত হ'ল। এরপর মঞ্চটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে অভিনীত হল, 'দেশভক্ত' নাটক। সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে সংহিতা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করল। অনুষ্ঠান মঞ্চে, তার গান, তার অভিনয় এবং ছাত্রীদের পরিচালনার ভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে ভেতরে ভেতরে তার অতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে।

অনুষ্ঠান শেষ করে মঞ্চ থেকে যখন সে নেমে এল তখন রঞ্জন-বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশভক্ত' নাটকটি যিনি লিখেছেন সেই 'অরুণাংশু' নামের ভদ্রলোকটি কে? অরুণাংশু নিশ্চয়ই তাঁর ছদ্ম-নাম, আসল নামটি কী? তাঁর প্রশ্নের উত্তরে খুব ধীরে শান্ত ভঙ্গীতে সংহিতা জবাব দিল, "আসল নাম শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।" তার এই উত্তর শুনে রঞ্জনবাবু শুধু একবার বললেন, "বাঃ ভারী সুন্দর লিখেছেন তো ভদ্রলোক! কত সংক্ষেপে কি সুন্দর ভাষায় কত জিনিসকে তিনি তুলে ধরেছেন! সত্যিই খুব ভালো নাটক, আর আপনাদের অভিনয়ও খুব ভালো হয়েছে! চমৎকার, অতি চমৎকার! তা আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের যদি আলাপ থাকে তো আমাদের স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে একবার তাঁকে নিয়ে আসুন না!"

রঞ্জন-বাবুর একথার উত্তরে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মাথাটা নীচু করে সংহিতা জবাব·দিল, "নাঃ, তাঁকে আর কোনোদিনই আনা যাবে না!" কোনো রকমে কথা

কটি উচ্চারণ করে নমস্কার সেরে চোখের জল সামলাবার জন্য সংহিতা দ্রুতপদে টিচার্সরুমে গিয়ে ঢুকল। রঞ্জন-বাবু ও অন্য বিশিষ্ট অতিথিরা তার এই হঠাৎ চলে যাওয়া দেখে সামান্য বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হেড দিদিমণি সরিতার দিকে চাইতে সরিতা বললেন, "শ্রীদীপবাবু গত পরশু মারা গেছেন, তিনি আর নেই।" "কেন কী হয়েছিল, কত বয়স হয়েছিল তাঁর? তিনি কোথাকার মানুষ ছিলেন?" বিভিন্ন অতিথির বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের উত্তরে সরিতা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমরা কেউই ওঁকে চিনতাম না, সুতরাং কিছুই বলতে পারব না, তবে সংহিতা বা ওর বাড়ির সকলের কাছে তিনি খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন এটা জানি।"

সরিতার কথা শুনে রঞ্জন-বাবু হঠাৎ বললেন, "গত কয়েক বছর ধরেই তো অরুণাংশু'র লেখা গান নাটক ইত্যাদি আমাদের স্কুলের অনুষ্ঠানে করা হয়েছে। তাহলে তিনি তো আমাদেরই একজন ছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে আমাদের একদিন শোক পালন করা উচিত এবং শোক সভা করা উচিত! এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?" প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে রঞ্জন-বাবু সরিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সরিতা বলেন, "আমি আর কী বলব, এখানে স্কুল কমিটির সবাই তো প্রায় উপস্থিত রয়েছেন, সবাই মিলে ছোট্ট একটা মিটিং করে ব্যাপারটা ঠিক করে নিলেই হ'ল।" "হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন, চলুন তো অফিসে গিয়ে বসে ওটা ঠিক করে ফেলি। আপনি বরং ছাত্রছাত্রীদের একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলুন, ওরা যেন চলে না যায়! আমরা মিনিট দশেকের মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছি কী করা যায় না যায়!" কথাগুলো বলতে বলতেই রঞ্জন-বাবু এবং সঙ্গের কমিটি সদস্যরা সকলে বিদ্যালয়ের অফিস ঘরে এসে প্রবেশ করেন। ওঁদের অফিস ঘরে ঢুকতে দেখে স্কুলের অশিক্ষক কর্মী অশোক ও মীরা দুজনে তাড়াতাড়ি করে চেয়ার সাজিয়ে তাঁদের বসবার ব্যবস্থা করে দেয়।

মিনিট দশেকের মিটিংয়ে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্থির হয়, সতেরোই আগষ্ট শনিবার 'অরুণাংশু'র মৃত্যুতে সকাল সাতটায় একটি শোক সভা করে ঐ দিনের মতো স্কুল বন্ধ রাখা হবে। প্রস্তাবটি মিনিট বইয়ে লিখে সকলে সই করে সেদিনের মতো স্কুল ত্যাগ করেন। রঞ্জন-বাবু এবং অন্য বিশিষ্ট অতিথিরা স্কুল প্রাঙ্গণ ত্যাগ করবার পর সরিতা ও বেলা দৌড়ে টিচার্স-রুমে এসে খবরটা সংহিতাকে দিতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দুঃখ হয় কিসে জানেন বড়দি! দুঃখ হয় এই ভেবে, আমাদের দেশে কোনো বড় মানুষই যথাসময়ে যথাযোগ্য মর্যাদা পান না! যাক আপনারা তো তবু শ্রীদীপের জন্য তাঁর স্মরণে একটা কিছু করতে যাচ্ছেন। শ্রীদীপের মতো মানুষ, যিনি এত কাজ করেছেন, তাঁকে আমাদের এই দেশের মানুষ কতটুকু দাম দিয়েছে বলুন তো! তাঁর মৃত্যু সংবাদটুকু পর্যন্ত চার লাইনে শেষ করে কর্তব্য সম্পাদন করেছে। হায়রে পোড়া দেশ! আচ্ছা বড়দি আমি এখন চলি!" বলে সে চলে যেতে চায়। সরিতা বলেন, "তোকে দেখে খুবই দুর্বল বলে মনে হচ্ছে, বেলা কি তোর সঙ্গে যাবে?" "না, আজ আর তার দরকার হবে না। শরীরটা দুর্বল হয়েছে বটে তবে মনটা

আজ অনেক শক্ত হয়ে গেছে।" বলে সংহিতা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তার এই চলে যাওয়া দেখে সরিতা আপন মনে বলে ওঠেন, "কি কঠিন মেয়ে! এত সংযত এত কর্তব্যপরায়ণ অথচ ভিতরে কত নরম কোমল।" সরিতার কথার খেই ধরে বেলা বলে, "হ্যাঁ বড়দি, সত্যিই সংহিতা একটু অন্য ধরনের মেয়ে, সাধারণ মেয়েদের থেকে ও অনেক উচ্চস্তরের। ওর কথাবার্তা চলফেরায় সব সময়ে যেন সুন্দর সুকুমার আভিজাত্য জড়িয়ে থাকে। ওর মুখ চোখের দিকে তাকালে মনের মধ্যে কেমন একটা যেন সহজ সম্ভ্রম জেগে ওঠে, কিন্তু কথা বললেই বোঝা যায় ও কত সহজ সরল।" "হ্যাঁ সত্যিই তাই!" সরিতা ছোট্ট জবাব দেন, এবং এরপর অশোককে সমস্ত ঘরে তালা চাবি দিয়ে স্কুলের গেট বন্ধ কবতে নির্দেশ দিয়ে তিনি ও অন্যান্য সব দিদিমণিরা সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

মাঝখানে শুক্রবার বাদ দিয়ে এল শনিবার। সকাল সাতটায় শোকসভা। আজ আর সংহিতার কিছুতেই স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছিল না। স্কুলের কথা ভাবতে গেলেই শোক-সভার কথা মনে আসছিল। যে মানুষটার সঙ্গে এই একমাস আগে পর্যন্ত সে অসঙ্কোচে মেলামেশা করেছে, সিনেমা থিয়েটার দেখেছে, গান কবিতার জলসায় গিয়েছে, নিজে হাতে করে খাবার বানিয়ে সামনে বসে খাইয়েছে, সেই মানুষটার স্মৃতিতে শোকসভা হবে। ব্যাপারটা ভাবতেই তার বুক ফেটে, চোখ ফেটে অঝোর ধারায় অশ্রু বের হয়ে আসছে। তবু কর্তব্যের খাতিরে সে নিজেকে প্রস্তুত করে বাড়ি থেকে বের হতে যাবে এমন সময় দেখল তার পিছনে পিছনে নম্রতা-সঙ্গীতাও স্কুলে যাবে বলে চলেছে। একবার পিছনে চেয়ে, সে দুই দিদির উদ্দেশ্যে বলল, "কাঁদতে তোদের খুব ভালো লাগে?" ছোট বোন কি বলতে চায় বুঝে দু-জনেই কোন জবাব না করে তার পিছনে পিছনে টুকটুক করে হেঁটে স্কুল প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছল।

সকাল থেকেই ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে ছিল। মৃদু মন্দ ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল। প্রকৃতির এই অবস্থা দেখে রঞ্জন-বাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে শোক সভাটিকে স্কুলের অফিসের সামনে দক্ষিণের লম্বা বারান্দায় করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আগে থাকতে সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে অধ্যাপক, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত রুচিবান মানুষ, তাই একখানি বড় তক্তপোষ আনিয়ে তার উপরে সুন্দর করে শ্রীদীপেব একখানি ছবি রজনীগন্ধার মালা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন এবং অসংখ্য ধূপ জ্বেলে দিয়ে সভাস্থলটিকে সুরভিত করে তুলেছিলেন। মঞ্চের সম্মুখে এসে তার উপর শ্রীদীপের অতবড় ছবি দেখে সংহিতা বুঝে উঠতে পারল না, হঠাৎ একদিনের মধ্যে অত বড় ছবিটা রঞ্জন-বাবু কী করে জোগাড় করলেন। ছবিটা দেখে তার বুকে শত সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে পাড় ভাঙতে লাগল, কয়েক মুহূর্তেই সে অস্থির হয়ে পড়ল এবং চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

এদিকে ঠিক সাতটায় রঞ্জন-বাবুর নির্দেশে সভার কাজ শুরু হতেই সরিতা ছোট্ট শোক প্রস্তাব পাঠ করে বললেন, "আমাদের এই বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ, শিল্পী,

সাহিত্যিক শ্রী অরুণাংশুর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে মর্মাহত। ঈশ্বরের পাদপদ্মে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে আজকের দিনটি শোক দিবস হিসাবে পালন করবার জন্য এই বিদ্যালয়ের কর্মবিরতি ঘোষণা করছি।" এবার অরুণাংশুর ছবিতে সরিতা একটি বেল ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। তাঁর মালা দেওয়া শেষ হলেই রঞ্জন-বাবুর অঙ্গুলী সঙ্কেতে একটি মেয়ে গান ধরল, "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু ...." এরপর, "যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে, যে নদী মরুপথে ...."

চোখের সামনে যা যা ঘটছে তা দেখে শুনে সংহিতা প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইল। শুধু মাঝে মাঝে রুমালে চোখ মোছা ছাড়া সে আর কিছুতে অংশগ্রহণ করেনি।

এরপর রঞ্জন-বাবু নিজে 'অরুণাংশু' সম্বন্ধে দু-চার কথা জানিয়ে সংহিতাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করতে, স্থির পদক্ষেপে সে এসে সামনে দাঁড়াল। অত্যন্ত নম্রভঙ্গীতে শ্রীদীপ তথা অরুণাংশুর ছবির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে সে ধীরে ধীরে শুরু করল, "আজ যাঁর স্মরণে এই শোকসভা, তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে আপনারা কেউই জানতেন না। তবু এই সভায় তাঁকে স্মরণ করে আপনারা সকলে আমার ধন্যবাদার্হ। অরুণাংশু তথা শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যদিও তা অল্পদিনের জন্য, তবু সেই অল্প কয়েকটি দিন আমার স্মৃতি-কোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সৎ, বন্ধু-বৎসল, পরদুঃখকাতর সজ্জন একজন মানুষ। এযুগে তাঁর মতো মানুষের সংস্পর্শে আসা এক দুর্লভ সৌভাগ্য। আমি সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী। তাঁর স্বভাবসুলভ পরিমার্জিত ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত অল্পদিনে আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং একজন সৎ বন্ধু হিসাবে আমাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই বন্ধুত্বের আসন দিয়েছিলেন। যেহেতু এই বিদ্যালয় আমার কর্মস্থল তাই এই বিদ্যালয়ের কথাও তিনি খুব গভীর ভাবেই ভাবতেন এবং এই বিদ্যালয়ের বহু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি বহু গান কবিতা নাটক ইত্যাদি রচনা করে দিয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবার জন্য তাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে চাঁদাপত্রও দিতেন তিনি, কিন্তু আমার উপর নিষেধ ছিল, কোনো বিলে বা কাগজে যেন তাঁর নাম লেখা না হয়, তাই সব ক্ষেত্রেই জনৈক শুভানুধ্যায়ী নামে চাঁদাপত্র নেওয়া হত। এছাড়াও তাঁর আঁকা বহু ছবি বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়কে তিনি উপহার দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের অফিস ঘরে টাঙানো রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীর ছবিগুলি তাঁরই দেওয়া। যাঁরা সেই ছবিগুলি দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, শিল্পী হিসাবে তিনি কত বড় দরের মানুষ ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি অত্যন্ত নিরহঙ্কার ও সদালাপী ছিলেন। অর্থে যশে তিনি অনেকের চেয়েই উচ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু অপর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে তাঁর কোনো অভিমান ছিল না। আমি তো তাঁর বন্ধু, তাঁর প্রিয়জন তাই তাঁর গুণের কথা ভিন্ন অন্য কথা

আমার মুখ দিয়ে হয়তো প্রকাশিত হবে না তাই এ বিষয়কে আর না বাড়িয়ে আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে আর একবার তাঁর স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"

সংহিতার কথা শেষ হতে ডাক পড়ল ছাত্রীদের। তারা এসে অরুণাংশুর স্মরণে তাঁরই লেখা 'বিবর্ত-দিন' নামক একখানি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করল। এরপর আবার কয়েকখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হল। এবার আবার ডাক পড়ল সংহিতার রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি আবৃত্তি কববার জন্য। সংহিতা সমস্ত দরদ দিয়ে কবিতাটি আবৃত্তি করল এবং সবশেষে পাপড়ি গাঙ্গুলী নামে এক দিদিমণি, 'এ পরবাসে রবে কে হায়' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন।

সভা শেষে সকলেই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। সংহিতা নম্রতা ও সঙ্গীতাও বাড়ির দিকে যাত্রা করল। সরিতা এবং বেলা এসে সংহিতার হাত ধরে বললেন, "আমরা আজ বিকেলে তোমার কাছে যাচ্ছি শ্রীদীপবাবুর কথা শুনতে, বল না সংহিতা পারমিশান দিচ্ছ তো?" এদের এই সনির্বন্ধ অনুরোধে মঞ্চের দিকে একবার তাকিয়ে সংহিতা বলল, "আচ্ছা আসুন, বিকেল ঠিক পাঁচটায়!" "আচ্ছা ঠিক পাঁচটাতেই যাব," বলে সরিতা ও বেলা অন্য পথ ধরল আর এরা তিন বোনে চুপচাপ নতমস্তকে নিজেদের বাড়ি ফিরল।

বিকেল ঠিক পাঁচটায় সংহিতাদের দোতলায় বড় ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে বসে সংহিতার মুখ থেকে শ্রীদীপের কথা শোনবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সরিতা, বেলা, সঙ্গীতা, নম্রতা ও রমলাদেবী অপেক্ষা করতে লাগলেন। কথাটা শুরু করতে সংহিতার যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে বুঝে সরিতা বললেন, "তোমার যদি খুব কষ্ট হয় তো থাক, অন্য দিন হবে এখন।" "না না কষ্ট আর কি! তাঁর কথা বলা মানেই তাঁকে স্মরণ করা, তাঁকে পূজা করা। কষ্ট হলেও আমি বলছি শুনুন।" বলে ধীরে ধীরে সংহিতা শ্রীদীপের কথা শুরু করল।

"সে দিনটা ছিল চব্বিশে এপ্রিল, চৈত্রমাসের দগ্ধ দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রসদনে একটা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, মঞ্চে অন্যান্য বিশিষ্টদের সঙ্গে আমারও আবৃত্তি ছিল। ববীন্দ্রনাথের একটি আর কবি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা আবৃত্তি করে অন্যদের অনুষ্ঠান শোনবার জন্য মঞ্চ থেকে নেমে সামনের দিকে দ্বিতীয় সারির একটা চেয়ারে বসতেই, পাশের চেয়ার থেকে এক ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনার আবৃত্তি খুব ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে!" অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোকের সঙ্গে দু-একটা টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলতে থাকল। তিনি নিজেই বললেন, তাঁর নাম শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, থাকেন হুগলী জেলার নবগ্রামে। গান কবিতা আবৃত্তি নাটক ছবি ইত্যাদিতে তাঁর আগ্রহ, তাই সময় পেলেই তিনি ঐ সব অনুষ্ঠান দেখেন। কথাবার্তা শুনে, তাঁকে খুবই মার্জিত রুচিবান এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমিও নাম ঠিকানা জানালাম এবং

ফোন নম্বর দিলাম। অনুষ্ঠান শেষে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এসে তিনি আমাকে বাসে তুলে দিলেন।

এরপর দিন সাতেক পরে হঠাৎ একদিন দুপুরে প্রায় দুটোর সময় তাঁর ফোন এল, ফোনটা মা ধরেছিলেন। তিনিই আমাকে ডেকে দিলেন। ফোনটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে হ্যালো করতেই ও পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'কী! আমায় চিনতে পারছেন?' আমি বললাম, 'নাঃ ঠিক ......, 'আরে আমি আপনার নতুন বন্ধু। সেদিন বিকেলে রবীন্দ্রসদনে আবৃত্তির আসরে যিনি যেচে আপনার সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন, আমিই সেই তিনি। এবার বুঝতে পেরেছেন?' বলে তিনি সামান্য থামতেই আমি বললাম, 'ও হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে! 'কই কী নাম বলুন তো আমার!' বলে তিনি আমায় পরীক্ষা করতে চাইলেন, আমি বললাম, 'আপনি তো শ্রীদীপবাবু! তাই না!' 'হ্যাঁ মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন! তবে আমার অন্য আরেকটা নামও আছে, সেটা হল 'অরুণাংশু, কি চেনেন নাকি নামটা?' বলে শ্রীদীপ প্রশ্ন রাখলেন, আমি বললাম, 'নামটা খুবই চেনা চেনা লাগছে কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না, আপনি আমায় মাফ করবেন, কাইন্ডলি যদি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলেন তো ভালো হয়! আমি কেমন ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছি!' আমার কথায় হাঃ হাঃ করে হেসে শ্রীদীপ বললেন, 'আরে না না, এরমধ্যে কোনো ধাঁধা টাঁধা নেই, খুব সিম্প্‌ল ব্যাপার, একটু সময় করে একদিন দুপুরের দিকে দুটো-আড়াইটে নাগাদ আমার অফিসে চলে আসুন, তাহলে আপনার ধাঁধাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।' 'কোথায় আপনার অফিস?' বলে প্রশ্ন করতেই ওপাশের মানুষটি জবাব দিলেন, 'নিন্ টেলিফোন রেখে আগে কাগজ কলম নিয়ে আসুন, তারপর বলছি।' হাতের কাছেই কাগজ কলম ছিল সেটা নিয়ে রেডি হয়ে শ্রীদীপকে বললাম, 'বলুন, কাগজ কলম রেডি হয়ে গেছে।' 'নিন লিখুন, শ্রীদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযত্নে 'দীপ এন্টারপ্রাইজ', ৬৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন নং ২৩৮৪৪৩৯, ২৩৯৭২২৮; তাহলে কবে আসছেন বলুন!' বলে শ্রীদীপ তক্ষুণি আমার যাবার দিনক্ষণ জানতে চান বুঝে আমি বললাম, 'দু-চার দিনের মধ্যে যাওয়া হবে না, কারণ স্কুলের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা আছে। সেগুলি দেখা শেষ করে তবে যাব একদিন। যাবার আগে আপনাকে ফোন করে দেব।' 'আসলে দু-চারদিন অপেক্ষা করে আমাকে বাজিয়ে দেখে নিতে চাইছেন এই তো!' শ্রীদীপের এই কথা শুনে আমি তো একেবারে 'থ। মনে মনে ভাবতে লাগলাম লোকটা কি থটরিডিং জানে নাকি। একজন যুবতী মেয়ে হয়ে একদিনের আলাপে একজন হঠাৎ পরিচিত লোকের কাছে যাওয়া ঠিক হবে কিনা এই চিন্তাই আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাই শ্রীদীপ ওভাবে বলায় মনে হল আমি ধরা পড়ে গেছি, তাই নিজেকে সপ্রতিভ করবার ইচ্ছায় বলে ফেললাম, 'না, একজন ভদ্রলোকের কাছে একজন পূর্ণ বয়স্কা ভদ্রমহিলা দেখা করতে যাবেন এতে আর বাজিয়ে নেওয়ার কী আছে! তাছাড়া আমি তো আর ক্লাস সেভেনে পড়া কিশোরী কন্যা নই! সুতরাং যে কোনোদিন গেলেই

হল!' আমার কথা শেষ হতে না হতেই শ্রীদীপ বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার লোভটা আমারই বেশী, এখানে এলে আপনার কোনো অসম্মান হবে না, কারণ আমিও একজন শিল্পী, একজন শিল্পী হয়ে অন্য আর একজন শিল্পীর সম্মান রাখার যে একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে সে বোধ আমার যথেষ্টই আছে। তাছাড়া আমি বহুদিন আগে থেকেই আপনার পরিচয় কিছুটা জানি। সুতরাং আপনি আমার এখানে এলে আমি মাথায় করে রাখব। আপনার কোনো ভয় নেই, আপনি কালই আসুন!' তাঁর কথায় পরিষ্কার বুঝলাম যে মানুষটি খুবই খোলা মনের এবং ভদ্র ও বিনয়ী, তাই আর অমত না করে বললাম, 'আচ্ছা কালই যাব, কিন্তু প্রথমদিন আপনি হাওড়া স্টেশনে পাঁচ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে এসে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন' 'আচ্ছা তাই হবে, আমি ঠিক দেড়টা থেকে দুটো পর্যন্ত পাঁচ নম্বর বাস চ্যানেলের কাছে সাবওয়ের সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করব।' 'আচ্ছা' বলে সম্মতি জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন যথাসময়ে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক আগে থেকেই নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করছেন। রোদে গরমে ঘেমে তাঁর মুখ চোখ একেবারে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার খুব কষ্ট হল! কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মনে মনে আনন্দিত হলাম। আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, এই দুর্দান্ত রোদে গরমে কথা মতো ভদ্রলোক ঠিক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর এই সিনসিয়ারিটি দেখে আমি খুব খুশী হলাম এবং তন্মুহূর্তেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে ফেললাম। খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'চলুন কোথায় আপনার অফিস!' 'হ্যাঁ চলুন', বলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ডে এসে হাওড়া-লেকরোড মিনিতে উঠলেন। মিনিট পনের, মধ্যে মিনি এসে ব্র্যাবোর্ন রোড ফ্লাইওভারের শেষে নন্দরাম মার্কেটের নিকট থামতেই, ইঙ্গিতে আমায় নামতে বললেন। বাস থেকে নেমে তাঁর পিছনে এসে তাঁর শোরুমে ঢুকলাম। ঘরটায় ঢুকে চারিদিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে যখন দেখছি তখন তিনি বললেন, 'কি? খুব অবাক লাগছে, তাই না! ভাবছেন এ আবার কোথায় এসে পড়লেন, তাই না!' 'হ্যাঁ সত্যিই, চারিদিকে এত হার্ডওয়ার আইটেম এগুলো কি আপনারা বিক্রি করেন!' বলে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ এটাই আমার জীবিকা নির্বাহের উপায়।' এরপর দোকানের এক কর্মচারীকে দিয়ে ডাব আনিয়ে খাইয়ে কিছু টুকিটাকি কথাবার্তার পর বললেন, 'চলুন, এবার আমার অন্দরমহলে চলুন।'

তাঁর নির্দেশে এবার এসে ঢুকলাম ঐ দোকানেরই পিছনের অংশে খুব সুন্দরভাবে সাজানো ছোট্ট একটি অফিস ঘরে। একটা চেয়ারে আমায় বসতে বলে তিনি নিজে অন্য একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনি তো কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসেন, নিশ্চয়ই কবিতা পড়তেও ভালোবাসেন! আপনি কবিতা পড়তে ভালোবাসেন তাই এই বইগুলো আপনার জন্য এনে রেখেছি, দেখুন তো একটু উল্টে-পাল্টে দু-চার পাতা পড়ে, এগুলো ভালো লাগে কিনা!' তাঁর কথা শুনে একটি একটি করে সব

বইগুলোই নেড়েচেড়ে দেখলাম। দু-একটি বইয়ের কিছু কিছু কবিতা পড়েও দেখলাম, বেশ ভালো লাগল। এবার বইগুলি কোলে তুলে নিয়ে বললাম, 'এই এত বই, সব আপনার লেখা' 'কী করে বুঝলেন আমার লেখা!' হাসতে হাসতে শ্রীদীপ প্রশ্ন করলেন, 'ঐ যে ব্যাক কভারে আপনার ছবি রয়েছে! অরুণাংশু সম্ভবত আপনার ছদ্মনাম!' আমার এই উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। অরুণাংশু ছদ্ম নামেই আমি লিখি। আজ বইগুলি আপনাকে দিতে পেরে মনে হচ্ছে আমার কবিতা লেখা এতদিনে সার্থক হল। কারণ সত্যিকারের কবিতাপ্রেমী একজনের হাতে বইগুলি পড়ল।'

এরপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে, প্রত্যেকটি বই খুলে খুলে কিছু কিছু কবিতা শ্রীদীপ তাঁর স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনালেন। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সে সব শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম, কোনোদিন স্বপ্নেও যা ভাবিনি, অর্থাৎ একজন বিখ্যাত কবির একেবারে পাশে বসে তাঁরই রচনা তাঁর নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনব, তাই-ই আমার ভাগ্যে ঘটে চলেছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে পরম ভাগ্যবতী বলে মনে হল। বেশ কয়েকখানি কবিতা আবৃত্তি করে শ্রীদীপ একসময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী খারাপ লাগছে না তো!' উত্তরে আমি বললাম, 'খারাপ তো লাগছেই না, বরং আপনার গলায় রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ শুনতে ইচ্ছে করছে! করবেন দু-একটা আবৃত্তি!' শ্রীদীপ বললেন, 'আজ থাক, পরে একদিন হবে, এরপর আপনি যেদিন আসবেন সেদিন রবীন্দ্র-নজরুল শোনাব এবং আপনাকে আমার লেখা উপন্যাস ও গল্পের বইগুলিও দেব।' তাঁর এ কথায় কিছুটা অভিমানাহত সুরে আমি বললাম, 'ওঃ আমিই কেবল এখানে আসব, আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন না!' 'কেন যাব না, নিশ্চয়ই যাব, আপনি ভালোবেসে ডাকলে কি আমি না গিয়ে পারি! কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো।' শ্রীদীপের এই কথার উত্তরে আমি বললাম, 'বলুন কী আপনার প্রশ্ন।' প্রশ্নটি হল, 'এই যে আপনার আমার হঠাৎ দেখাশুনা, হঠাৎ পরিচয়, এই দেখাসাক্ষাৎ এই পরিচয়টাকে কি বন্ধুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না! আসলে আপনার মতো শিল্পী গুণী একজন মহিলার বন্ধুত্ব পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। কি দেবেন না আপনার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে!' শ্রীদীপের এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠ হতে উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ যেন শ্রবণ বেয়ে মধুর তরঙ্গ হয়ে আমার হৃদয়ের সাগরকে উত্তাল ঢেউ দিয়ে কোন অকূলের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন কেমন অন্য এক আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল এর আগে তো অনেকের সঙ্গেই মিশেছি, কিন্তু তাঁদের কথায় আমার এই মন প্রাণ তো এমন করে উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। আমার এই মন তো এর আগে কোনো দিনই কাউকে হ্যাঁ, 'তুমি আমার বন্ধু, বলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেনি।

শ্রীদীপের শেষের কথাটা শুনে যখন নিঃশব্দে ভীষণভাবে তার দিকে আমার মন ছুটে চলেছে ঠিক তখনই তিনি আবার বললেন, 'কই কিছু বলছেন না যে? দেবেন

তো আপনার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে?' তাঁর এই দ্বিতীয় বারের কথাগুলোর জবাবে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না, শুধু আমার ডান হাতটা এগিয়ে গিয়ে তাঁব ডান হাতটাকে ধরে কাঁপতে থাকল। আমি বুঝতে পারছি যে আমার হাতটা কাঁপছে কিন্তু আমি কিছুতেই সে কম্পন রোধ করতে পারছিলাম না। আমার অবস্থাটা বুঝে শ্রীদীপ বললেন, 'যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আপনি আজ আমার হাত ধরলেন সে বিশ্বাসের কোনোদিন কোনো অমর্যাদা হবে না, আজ থেকে আমি আপনার সত্যিকারের বন্ধু, সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। সুখে-দুঃখে-আনন্দে-বেদনায় আমি সব সময়েই আপনার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখব।' কথাগুলো বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে তিনি আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে আবার বললেন, 'হ্যাঁ আর একটা কথা, আজ থেকে আপনি আমাকে শ্রীদীপবাবু বা অরুণাংশুবাবু নয়, সোজাসুজি শুধু 'দীপ' বলে ডাকবেন এবং ইচ্ছে হলে 'আপনি' সম্বোধন ছেড়ে 'তুমি' সম্বোধন করবেন!'

এতক্ষণ শ্রীদীপের কোনো কথার কোনো উত্তরই দিইনি, এবার আর থাকতে পারলাম না, বললাম, 'তা হয় না, আপনি কত বড় মানুষ, আপনাকে কি তুমি সম্বোধন করতে পারি? ঐটি আমি পারব না, আপনি আজ্ঞে করেই চালিয়ে যাব।' আমার কথায় শ্রীদীপ হেসে বললেন, 'বড় মানুষ যখন নিজে থেকে বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেছে তখন নিশ্চয়ই আপনার তুমি সম্বোধনে সে গৌরবই অনুভব করবে, আপনার কোনো চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে তুমি তুমি করে চালিয়ে যেতে পারেন।' 'আচ্ছা সে এখন পরে দেখা যাবে, আগে তো আপনার সম্বোধনগুলো পালটাক, তারপর না হয় চিন্তা করা যাবে,' বলে শ্রীদীপকে উল্টো চাপ দিতেই তিনি হেসে ফেললেন এবং বললেন, 'আচ্ছা নেক্সট মিটে, অর্থাৎ ঠিক পরের সাক্ষাতেই আমি আপনাকে তুমি করে সম্বোধন করব এবং একটা সুন্দর নাম ঠিক করে সেই নামেই ডাকব, তবে হ্যাঁ আমার সম্বোধনের পর থেকে কিন্তু আপনি আর আমায় আপনি আজ্ঞে করে বলতে পারবেন না!' 'ঠিক আছে তাই হবে. পরের সাক্ষাৎ থেকেই আমি শ্রীদীপকে 'শ্রী'-হীন করে ডাকব এবং চেষ্টা করব, 'তুমি তুমি' করে বলতে!'

আমার একথায় শ্রীদীপ হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ', আচ্ছা এবার বলুন কী খাবেন, আজকে আপনি আমার আমন্ত্রিত অতিথি সুতরাং মিষ্টিমুখ না করিয়ে কিন্তু ছাড়ছি না!' কথাগুলো বলতে বলতে ওখানে বসেই তিনি একটা বেলের সুইচে চাপ দিলেন। বেল শুনে একজন কর্মচারী এলে তাঁকে মিষ্টি আনতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়লেন। চিরকালই আমি বলার চেয়ে শোনার আগ্রহী বেশী, তাই তাঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। শুনতে শুনতে মনে হল কি গভীর জ্ঞান, কত বেশী পড়াশুনা থাকলে তবেই নানা বিষয়ে এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা যায়! তাঁর কথাগুলো শুনতে শুনতে আরও মনে হতে লাগল, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে আদৌ ভুল হয়নি বরং আমি যেন মনে মনে এই রকম বন্ধুত্বই এতদিন কামনা করে এসেছি। আমি যেন সেই বন্ধুত্বই

কামনা করেছি যার মধ্যে থাকবে বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্য কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে যিনি হবেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ। আমি যেন সেই রকম বন্ধুই কামনা করে এসেছি, যে মানুষের মধ্যে থাকবে না কোনো অহঙ্কার। আমি যেন সেই বন্ধুই কামনা করে এসেছি, যাঁর সঙ্গে জীবনে বা সংসারে মিলন না হলেও মিলন ঘটবে একই চেতনার বোধে দীপ্ত আত্মার আত্মীয়তার মধ্যে। শ্রীদীপ নিজের মনে বহু কিছু বলে চলেছেন কিন্তু আমি ততক্ষণে ভেসে যাচ্ছি অন্য এক বাতাসের ভিতর দিয়ে আলোময় অন্য এক জগতের দিকে, যে জগতে গেলে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, সব দীনতা ভুলে যায়। যে জগতে পৌঁছতে পারলে মানুষ হয়ে ওঠে উদার আনন্দময় এক সত্যিকারের মানুষ।

শ্রীদীপের কথার মাঝখানেই খাবার এসে গেল। তিনি নিজ হাতে আমায় অতি যত্নে মিষ্টান্নে আপ্যায়িত করলেন এবং জল দিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি ব্যবহার আমার নিকট অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মনে হতে লাগল। আরও কিছু কথোপকথনের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোবার সময় মনে হল আমার পা দুটো যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে, মনটা যেন বলছে শরীর তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। শ্রীদীপ সঙ্গে সঙ্গে এসে বাসে তুলে দিলেন। বাসের গেট থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম কিন্তু বাসটা যখন হুহু করে হাওড়া ব্রীজ পার হতে লাগল আমার মনটা তখন শ্রীদীপের সেই ছোট্ট অফিস ঘরের কোণায় আবদ্ধ থেকে গেল। অবশেষে এক সময় কেমন যেন নেশাগ্রস্তার মতো বাড়িতে এসে ঢুকলাম।

বাড়িতে ঢুকে দোতলায় উঠতেই মা এসে বললেন, 'কী রে দেখা হল? কেমন মানুষ বুঝলি!' মায়ের কথায়, ব্যাগ থেকে শ্রীদীপের লেখা কবিতার বইগুলো একে একে বের করে দিতেই হাতে নিয়ে মা বললেন, 'বাব্বাঃ এ যে অনেক বই! এত লেখা ভদ্রলোকের! কত বয়স তাঁর?' মায়ের কথার একটি বর্ণও আমার কানে ঢুকছিল না, আমি যেন তখন শ্রীদীপের অফিস ঘরেই বসে ছিলাম। আমার অন্যমনস্ক ভাবটা কিন্তু মায়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে তাঁর মেয়ের মনে শ্রীদীপরূপী মানুষটি গভীর দাগ কেটেছেন। বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মা তাই বলে উঠলেন, শ্রীদীপ যেমন মানুষই হোন, যত বয়সই তাঁর হোক, তোমাকে একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হ'ল, কারও সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করবার আগে বিশবার ভাববে, কিন্তু মেলামেশা করবার পরে কোনোদিন কোনো কারণে যেন তাঁর অসম্মান কোরো না, যেন ছোটবড় কোনো কথা বোলো না। একটা জিনিস আরও জেনে রাখ, সেটা হল ঐ সমস্ত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক মানুষেরা ভীষণ আবেগ-প্রবণ হন এবং আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হন ; সুতরাং তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করবার আগে তুমি বিশবার ভাবো। তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছ অনেক লেখাপড়া শিখেছ, নিজে একটা স্কুলের শত শত ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দান করছ, সুতরাং তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার মতো বিশেষ কিছু নাই, তবু যেহেতু আমি তোমার মা এবং একজন নারী সেহেতু মা ও নারীর মন নিয়ে তোমায় কথাগুলো বলছি। কারও সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা

করবার আগে বিশবার ভেবো। পরে এই নিয়ে যেন কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না দেখি! যদি বন্ধু বলে মেনে থাকো, তাহলে তাঁকে সারাজীবন যেন বন্ধু বলেই মানতে পারো, কোনোদিন যেন অবহেলা বা অসম্মান কোরো না। জেনে রেখো মানিলোককে, অবহেলা বা অসম্মান করলে, সেই লোকটির মান যত না যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী মান যায় অবহেলাকারী বা অসম্মানকারীর। মানী লোককে অসম্মান করলে সেই মানুষটি নন, সাধারণের চোখে ঘৃণিত হয়ে ওঠে অসম্মানকারী বা অবমাননাকারী, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

মা যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন যেন কোনো সুন্দর রহস্য উপাখ্যান শোনার মতো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, এই আমার মা! এত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না এত বুদ্ধিমতী, এত উদার এত সহজ! এত সরলতা এত গুণগ্রাহিতা আমার মার মধ্যে বিরাজ করছে! সেই মুহূর্তে আমার মায়ের শরীরটা যেন কোন দেবীর দেহ বলে মনে হল, মাথা নীচু করে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে করতে বললাম, 'তুমি আমায় আশীর্বাদ কর মা, আমি যেন তোমারই ইচ্ছানুসারে নিজের ইচ্ছাকে চালাতে পারি, আমি যেন আমৃত্যু সমস্ত গুণী জ্ঞানী মানুষদের আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলে রাখতে পারি!' আমার কথা শুনে মা বললেন, 'সে বিশ্বাস আমার আছে, আর তাইতো তুমি যখন শ্রীদীপের অফিসে যেতে চেয়েছ আমি তখনই কৈফিয়ৎ না করে তোমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছিলাম। হ্যাঁ আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, এই পৃথিবীতে জন্মে নিজেকে চেনাটাই হচ্ছে বড় চেনা, নিজেকে জানাটাই হচ্ছে বড় জানা। তুমি শুধু শিক্ষিকা নও তুমি একজন উচ্চস্তরের শিল্পী, তুমি একজন সাধিকা, সুতরাং তোমার মধ্যে যে সুস্থ চেতনা আছে, সেই চেতনার আলোয় তুমি নিজেকে একদিন নিশ্চয়ই জানতে পারবে, নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। যেদিন নিজেকে জানতে বা চিনতে পারবে, সেদিন যেন আজকের এই বন্ধুত্বকে তুচ্ছ বলে মনে না হয়!'

মায়ের কথা শেষ হতেই কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর বুকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে খুব শান্তভাবে বললাম, "না মা তোমার ভয় নেই, যাঁকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছি তাঁকে কোনোদিনই আমি অসম্মান করব না, কোনো কারণেই অশ্রদ্ধা করব না। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর মা, আমি যেন তোমার আশীর্বাদের যোগ্য হতে পারি।'

আমার কথা শেষ হতে না হতে একটি বইয়ের পিছনের মলাটের উপর শ্রীদীপের ছবির উপর হাত বুলিয়ে মা বললেন, 'তুমি এই ছবিটার দিকে চেয়ে ভালো করে খেয়াল কর তো! দেখ কী দারুণ স্বপ্নালু চোখ দুটি! কী সুন্দর মুখের আকৃতি ছেলেটির! ছবিটি দেখে আমি হলফ করে বলতে পারি এই ছেলে দারুণ পরোপকারী, বন্ধু-বৎসল, বিশ্বাসী এবং উদার। ওর দুচোখের মণিতে স্বপ্ন যেন উপচে পড়ছে, তাছাড়া মুখটা দেখে মনে হয় ও একসময় দারুণ কষ্ট পেয়েছে, তাই অপরের কষ্ট বুক পেতে নিতে যেন ও সদাই উৎসুক! এমন ছেলেকে ঠকানো পাপ, এমন ছেলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

নিষ্ঠুরতারই নামান্তর!'

কথাগুলো শেষ হতে না হতে সংহিতা, সঙ্গীতা, নম্রতা, সরিতা ও বেলা ঠিক ঐ সময়েই মা রমলা দেবীকে একটি ট্রেতে ছয় কাপ চা ও বেশ কিছু বিস্কুট নিয়ে এসে তাদের সামনেই হাজির দেখে একটু চমকে ওঠে। উনি যে সংহিতার কথা শুনতে শুনতে কখন সেখান থেকে উঠে চা করতে চলে গিয়েছিলেন তা এতক্ষণ কেউই খেয়াল করেনি। 'খাও, তোমরা সবাই একটু করে চা খাও এখন,' বলে কাপগুলো হাতে হাতে ধরিয়ে দিতে সকলের ধ্যান ভঙ্গ হল, সবাই যেন সংহিতার রচিত স্বপ্নময় জগত থেকে বাস্তব জগতে পা দিল।

মায়ের চা দেওয়া দেখে সঙ্গীতা একবার অনুযোগের সুরে বলে উঠল, 'তুমি আমায় বললে না কেন মা! আমিই তো চা-টা করে এনে দিতে পারতাম, শুধু শুধু তুমি কেন কষ্ট করতে গেলে!' 'এতে আর কষ্ট কি মা! আমার মেয়েরা চা খাবে আব তা করতে আমার কষ্ট হবে!' বলে সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে রমলাদেবী আবার বললেন, 'তাছাড়া সংহিতার কথাগুলো শুনতে শুনতে শ্রীদীপের জন্য মনটা, বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠেছিল তাই অন্যমনস্ক হবার জন্য একটুক্ষণ সরে গিয়েছিলাম। তোরা, তো জানিস না শ্রীদীপ আমার কতখানি ছিল। শৈশবে মাতৃহারা শ্রীদীপ প্রথম দিনই এ বাড়িতে এসে প্রণাম কবে আমায় 'মা' বলে সম্বোধন করেছিল, তোদের বন্ধুরা বা তোর দাদাদের অন্য বন্ধুরা সকলেই তো হয় মাসীমা নয় তো কাকীমা বা জেঠিমা বলে সম্বোধন করে কিন্তু সোজাসুজি ওবকম 'মা' বলে অনাত্মীয় কেউ কোনোদিন আমায় ডাকেনি, তাই শ্রীদীপের প্রতি আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সত্যি, মাত্র সামান্য কয়েকটা মাসের আলাপ, কিন্তু সে যেন তার ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় সম্মানে আমাদের সকলকে কিনে নিয়েছিল! সত্যি! শ্রীদীপ যেন এক দেবদূতরূপে আমাদের সংসারে উদয় হয়েছিল!'

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই চা পান পর্বও শেষ হল। তারপর আবার সকলে প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে সংহিতার দিকে চোখ চুলে চাইতেই, সে শুরু করল।

'শ্রীদীপের কাছ থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তার শেষে সেদিন সন্ধ্যার বাকি সময়টুকু এবং সে রাত্রির পুরোটাই শ্রীদীপের সৃষ্টি আমায় সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছিল। সারারাত জেগে তাঁর দেওয়া কবিতার খান পনেরো বইয়ের মধ্যে খান চারেক আমি পড়ে ফেলেছিলাম। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে বুঝতে পারছিলাম, যে, শ্রীদীপ নামক মানুষটি যতখানি মানবদরদী, ঠিক ততখানিই প্রকৃতপ্রেমী ও মানবতাপ্রেমী। তাঁর বুকের গভীরে যেমন মানবপ্রেমের ফল্গু প্রবাহিত, তেমনি দেশপ্রেমেরও, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেহজ প্রেমকেও তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে তিনি নির্বাসিত হতে দেননি। অনেক সময়েই, অনেক কবিতাতেই তাঁর নারীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা ও দরদের পরিচয় পেয়েছিলাম। কোথাও কোথাও কল্পনায় তিনি তাঁর মানস-প্রতিমাকে গভীর প্রেমে আহ্বান করেছেন। জীবনের অনেক সাধারণ মুহূর্তকে তিনি ভাব ও ছন্দ-নৈপুণ্যে এমন

বিশিষ্টতা দিয়ে ফেলেছেন, যে, সেই সমস্ত রচনাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, যেন, তাঁর রচনার ঠিক মুহূর্তটিতে পাশে কোনো স্বপ্ন-সহচরী তাঁর বাম হাতটি স্পর্শ করে বসেছিল। আজও যখন একা একা বসে ভাবি, তখন মনে হয়, কী করে এটা সম্ভব! শুধুমাত্র কল্পনায় একজন নারীকে মানস-প্রতিমার আসনে বসিয়ে এমন সমস্ত রচনা কি করে সম্ভব! আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্তা অনেক নারীই তো আছেন, কই তাঁরা কেউই তো পারেন না ঠিক ঐভাবে নিজের মনের চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে! ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হত, হ্যাঁ এইটাই তো প্রতিভা, এইটাই তো পরম করুণাময়ের দান! সবাই পাবে না বলেই তো শ্রীদীপের মতো মানুষদের জন্যে এই পৃথিবীতে অন্য .আসন পাতা হয়!

এরপর আমার কয়েকদিন যেন একটা ভাবের ঘোরে কেটে গেল। প্রায় দিন দশেক পরে স্কুল থেকে ফিরে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বের হচ্ছি, এমন সময় মা বললেন, 'দ্যাখ, তোর ফোন এসেছে, শ্রীদীপ ওপাশে লাইন ধরে আছে।' ভিজে কাপড়ে দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরে হ্যালো করতেই প্রথম প্রশ্ন, 'কি শরীর টরীর খারাপ নয় তো! কদিন কোনো সারাশব্দ পাইনি কেন? খুব ব্যস্ত আছেন বুঝি!' শ্রীদীপের কথার জবাব দিতে ভুলে গিয়ে যখন শুধুমাত্র তাঁর কথাগুলো গিলে চলেছি সেই সময় আবার ওপাশ থেকে, 'কি কোন জবাব দিচ্ছেন না যে? কিছু বলবেন তো! কি ভালো আছেন তো?' কী জবাব দেব! এ পাশে সংহিতা নামে যে মেয়েটি ফোন ধরে আছে তার তো গোটা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে, এমনকি জবাব দিতে গেলেই তার কণ্ঠস্বর যে কেঁপে যাবে সেটা বুঝেই সে শুধু একতরফাভাবে শ্রীদীপের ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে যাচ্ছিল। এমন সময় শ্রীদীপ বললেন, 'আপনার বোধ হয় এখন মুড ঠিক নেই, ঠিক আছে মুড ঠিক হলে ফোন করবেন, এখন আমি ছেড়ে দিচ্ছি!' এতক্ষণে আমার বোধহয় হল, কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'না না প্লীজ ফোনটা ছেড়ে দেবেন না বরং এক কাজ করুন, আজ বিকেলে চারটে নাগাদ আমাদের বাড়িতে আসুন। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, মাও আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। আমার মা বই পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন আর আপনার মতো লেখকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে জেনে মা খুব খুশী, মা আপনাকে আসতে বলেছেন। কি, আসবেন তো?' আমার কথার উত্তরে ওপার থেকে স্পষ্ট ভেসে এল, 'ঠিক বলছেন তো? মায়ের নাম করে আপনি বলছেন না তো?' আমি কিন্তু চট করে কারও বাড়ি যাই না, বিশেষ করে কোনো মেয়ে বন্ধুর বাড়ি, কিন্তু আপনার বাড়ি যাবার জন্য আমার অন্তর থেকে কোনো আপত্তি নাই, কারণ আপনাকে দেখে কেমন যেন মনে হয়েছে আপনার হাতে আমার অমর্যাদা হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে চারটেয় নয়, বেলা পাঁচটা নাগাদ আমি যাচ্ছি। গিয়ে যদি আপনাকে দেখতে না পাই, তাহলে কিন্তু দরজার কাছ থেকেই চলে আসব! আচ্ছা এখন ছাড়ছি তাহলে!' এদিকে টেলিফোন হাতে আমার মন তখন বলছে কেন আর দু-মিনিট কথা বললে কি পৃথিবীর অনেক ক্ষতি

হয়ে যেত! কিন্তু টেলিফোনের রিসিভারের কাছাকাছি থাকা কণ্ঠ বলল, 'আচ্ছা আমি থাকব, নিশ্চয়ই আসবেন কিন্তু!' আর কোনো কথা না বলে শ্রীদীপ টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। আমিও টেলিফোন ছেড়ে মাকে গিয়ে বললাম, 'শ্রীদীপবাবু আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আসছেন আমাদের বাড়িতে।' মা বললেন, 'এতো খুবই ভালো কথা, দেখো তিনি এলে তাঁর যেন কোনোরূপ অসম্মান না হয়!'

শ্রীদীপের প্রতীক্ষায় সেদিন সারাটা দুপুর একটা নিঃশব্দ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল। বেলা তিনটে থেকেই একবার ঘর একবার বারান্দা একবার বাইরের বারান্দা এই করতে করতে সময় যেন আর কাটতে চায় না। আমার অস্থিরতা দেখে ছোটদি একবার বলল, 'কি রে কী হয়েছে কী তোর? তুই সারা দুপুর এত ছটপট করছিস কেন? সকাল থেকে স্কুলে পরিশ্রম করে এলি খাওয়া দাওয়া করেছিস এবার একটু বিশ্রাম করগে যা'। ছোটদির কথা শুনে মনে মনে খুব হাসি পেল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, কারণ, আমার মনের অস্থিরতার কথা কীভাবে যে তাকে বোঝানো যেতে পারে সেটা না বুঝতে পারার জন্যেই আমার হাসি পেল। আমার বিশ্রাম, আমার নিদ্রা, আমার তন্দ্রা যে তখন শ্রীদীপবাবুর আগমনের আনন্দে ছুটে গেছে সেটা ছোটদিকে বোঝাতে চেষ্টা না করে তাকে শুধুই বললাম, 'দ্যাখ না, আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু আজ আসবেন, তাঁকে বলে দিলাম চারটের মধ্যে আসতে কিন্তু এখনও এলেন না।' আমার কথা শুনে ছোটদি ঘরের ভিতরে দেওয়াল ঘডিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা এই তো সবে সাড়ে তিনটে! তুই এখন থেকে এত ছটফট করছিস কেন!' 'না তিনি কখনও এখানে আসেননি তো, এ এলাকার পথ-ঘাট জানা নেই, হয়তো রোদে ঘোরাঘুরি করে ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে তাঁর কত কষ্টই না হচ্ছে। আচ্ছা ছোটদি কী করি বলতো? হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গিয়ে একটু দেখে আসব!' আমার কথা শেষ হতে না হতে ছোটদি খুব ভালো করে আমার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো! এতদিন তো কোনো বন্ধুর জন্য তোর এত দরদ দেখিনি, আজ হঠাৎ তুই একেবারে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে চাইছিস বন্ধুকে ওয়েলকাম করবার জন্য, তা বন্ধুটি কে জানতে পারি!' ছোটদির কথার উত্তরে ছোট্ট করে, 'এলেই দেখতে পাবি', বলে টুক করে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোটদি আর কিছু না বলে, নিজের কাজের জায়গায় গিয়ে তার স্টেনোকে ডিক্টেশান দিতে লাগল।

এরপব আরও ঘণ্টাখানেক অননুভূতপূর্ব এক অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে দেখলাম ছোটদি ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে। আর বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীদীপ জিজ্ঞাসা করছেন, 'এটা কি সংহিতাদের বাড়ি?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন, বলে পিছন ফিরে ছোটদি যেই আমাকে ডাকতে যাবে, ঠিক তখনই আমি ছোটদির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি এবং সহাস্যে শ্রীদীপের দিকে তাকিয়ে বলছি, 'যাক বাবা, শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে!' আমাদের কথোপকথন শুনে মা এসে সেখানে দাঁড়াতেই শ্রীদীপ তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি মা

তাই তো!' মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি ভিতরে এসে বস।' এরপর মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই সংহিতা, যা, ছেলেকে নিয়ে ভিতরের ঘরে যা।'

মা বললে কী হবে এ ছেলে যে অন্য ছেলে! ছেলে তখন বলে বসলেন, 'আগে সবার সঙ্গে আলাপ করি, তারপব বসব!' এরপর ছোটদা, ছোটদি সবার সঙ্গে আলাপ করে তবে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঘরে বসার কিছুক্ষণের মধ্যে সেজদিও অফিস থেকে ফিরল। তার সঙ্গেও শ্রীদীপ নিজেই আলাপ করলেন, এরপর মায়ের হাত থেকে সরবৎ নিয়ে খেয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে পরপর সাতখানি উপন্যাস ও দুখানি গল্পের বই ও আরও দুখানা ছবি-ছড়ার বই বের করে মাকে দিয়ে বললেন, 'শুনলাম আপনি গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসেন, তাই এগুলো আপনার জন্য নিয়ে এসেছি!

বইগুলো হাতে নিয়ে মা বললেন, 'সেদিন সংহিতাকে তুমি এতগুলো বই প্রেজেন্ট করেছ, আবার এতগুলো বই! এ যে অনেক টাকার বই বাবা! না বাবা এত বই তোমাকে দিতে হবে না, আমি বরং একটা একটা করে তোমার কাছে চেয়ে চেয়ে নিয়ে পড়ে ফেরত দেব! বাবাঃ! কত লিখেছ তুমি! এত কাজের মাঝে সময় বের করে কীভাবে যে এত লেখাপড়া কর! মা সরস্বতীর অসীম করুণা তোমার উপর!'

কথাগুলো বলতে বলতেই মা আমাকে ইঙ্গিতে শ্রীদীপের জন্য জল-খাবারের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। আমি তো তৈরিই ছিলাম। মা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলখাবার সাজিয়ে প্লেট নিয়ে শ্রীদীপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার হাতে খাবারের প্লেট দেখে শ্রীদীপ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা মা! আমি কি এ বাড়ির শত্রু না ছেলে!' মা বললেন, 'কেন বাবা একথা বলছ কেন?' শ্রীদীপ হাসতে হাসতে বললেন, 'শত্রু না হলে এত খাবার কেউ দেয়! এত খাবার একসঙ্গে পেটে ভরলে কোনো মানুষ সুস্থ থাকতে পারে!' তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে সেজদি-ছোটদি আমি সবাই একসঙ্গে হেসে ফেললাম, মা শুধু বললেন, 'তোমার যা পছন্দ তাইই খাও, বেশী খেতে হবে না, তবে ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য সামান্য কিছু মুখে দিলে কিন্তু আমার খারাপ লাগবে। অফিস থেকে এসেছ অন্তত পেটটা যাতে ভরে সে রকম খাও।' 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলে আমার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে একটি সন্দেশ ও একটি রাজভোগ নিয়ে প্লেটটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। দুটি মাত্র মিষ্টি তুলে নিতে দেখে আমার ভীষণ রাগ হল, বললাম, 'এইটুকু খান বলেই তো এই রকম হালকা চেহারা আপনার! ভালো করে না খেলে কি স্বাস্থ্য ভালো হয়! নিন আরও অন্তত দুটো মিষ্টি নিন!'

অনুযোগের সুরে বলা আমার কথাগুলো শুনে শ্রীদীপবাবু একবার হাসলেন, মা আমাকে বললেন, 'কি রে প্রথম দিনেই তুই যে ছেলেটাকে শাসন করতে শুরু করলি! ছেলেকে শাসন করব আমি' বলে শ্রীদীপের দিকে ঘুরে মা আবার বললেন, 'নাও তো বাবা, আর দুটো মিষ্টি খেয়ে নাও তো!' মায়ের কথা রেখে শ্রীদীপ আরও দুটো

মিষ্টি খেয়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেজদি সকলের জন্য চা করে নিয়ে হাজির হল। চা পান করতে করতে শ্রীদীপ তাঁর নিজের ও পরিবারের সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প শুরু করলেন। শ্রীদীপের গল্প যখন শেষ হল ঘড়িতে তখন প্রায় সন্ধে ছটা। আমি এবার শ্রীদীপকে বললাম, 'আপনার কণ্ঠে নজরুল রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি শুনব, কি শোনাবেন তো?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কই সঞ্চয়িতা আর সঞ্চিতা দিন, আমি পড়ছি!' তাঁর কথায় দৌড়ে তিনতলার আমার পড়ার ঘর থেকে বই এনে দিলাম। আমাকে বই নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে ছোটদা হঠাৎ বলল, "তোরা সবাই আমার ঘরে এসে বোস, তাহলে আমিও কবি-কণ্ঠে একটু আবৃত্তি শুনতে পাই।'

ছোটদার কথায় শ্রীদীপ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই-ই চলুন, ছোটদার ঘরেই হোক।' এরপর ছোটদার ঘরে এসে রবীন্দ্র নজরুল মিলিয়ে প্রায় গোটা দশেক কবিতা আবৃত্তি করবার পর শ্রীদীপ থামলেন। সমস্ত ঘরের মধ্যে তখন নিশ্ছিদ্র নীরবতা। সবাই যেন কথা বলতে ভুলে গেছে। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মা এক সময় বলে উঠলেন, 'তা হ্যাঁ বাবা, তোমার মধ্যে আর কী কী গুণ আছে!' 'আমার তো কোনো গুণই নেই মা, আমি যা করছি এসব তো অনেকেই পারেন, এতে আর বৈশিষ্ট্য কী আছে!' বলে তিনি হাসতে থাকলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর হাসিটা এত মিষ্টি লাগছিল, যে, অন্তরাত্মা চাইছিল শিশুকে আদর করার মতো এক ছুটে গিয়ে শ্রীদীপকে আদর করে আসি, কিন্তু সে তো সম্ভব ছিল না, তাই অন্তরাত্মা চাইলেও সংসারের সংহিতাকে নীরব দর্শকই থেকে যেতে হয়েছিল। ছোটদার সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা গল্প করার পর আমি শ্রীদীপকে বললাম, 'এই যে স্যার, একবার উপরের ঘরে যাবেন কি? আমার লাইব্রেরীটা দেখাতাম' আসলে ছোটদার সঙ্গে তিনি যতই গল্পে মেতে উঠছিলেন, আমি ভিতরে ততই অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম, তাই একান্তে নিয়ে যাবার জন্যেই লাইব্রেরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাঁকে উপরের ঘরে যেতে অনুরোধ করলাম। আমার কথা শুনে শ্রীদীপ বললেন, 'আচ্ছা চলুন, আপনার লাইব্রেরীটা দেখে আসি।'

সিঁড়ির আলো জ্বেলে তাঁকে তিন তলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। ঘরের সব কিছুর মলিন এবং অগোছাল অবস্থা দেখে আমার নিজেরই ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ্রীদীপবাবু বললেন, 'কই আপনার বইপত্র দেখি।' আপনার প্রাণের ধনগুলিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন।' তাঁর কথায় আমার ঘরের খুব পুরনো দিনের একটা বড় টেবিলের দুটো পাশের দুটো দেরাজ খুলে অনেকগুলো বই তাঁর কাছে এনে দিলাম। দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'আরে এ যে সবই কবিতার বই! আপনি কবিতা এত ভালোবাসেন। অদ্ভুত ব্যাপার! আজকাল কবিতার কথায় লোকের গায়ে জ্বর আসে, আর এই বিংশ শতাব্দীর একজন য়্যাকম্‌প্লিশ্‌ড লেডি হয়ে আপনার কবিতাই ভালো লাগে। দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, আমার দেওয়া বইগুলো যথাযোগ্য হাতেই পড়েছে। সত্যিই আপনি যে এতটা কবিতা-পাগলী তা আমি ভাবতেই পারিনি।' শুধু কবিতাই নয় মশায়, আমি গানও জানি, তবলা বাজাতে

পারি, ইলেকট্রিক্-অরগ্যান বাজাতে পারি, নাচে থাঙ্কুমণি কুট্টি আমার গুরু, আবার মঞ্চে অভিনয় করে থাকি।' আমার এই কথাগুলো শেষ হতে না হতে শ্রীদীপ হঠাৎ সিধে হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, দু-হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, 'আরে বাপরে বাপ, আপনি তো সাংঘাতিক মহিলা! দাঁড়ান দাঁড়ান আপনাকে আগে ভালোভাবে একটা নমস্কার করে নিই।' তাঁর এই নমস্কার করা দেখে আমি বললাম, 'যাঃ কি হচ্ছে কি?' আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন, 'বয়সে আপনার চেয়ে বড় না হলে আমি আজ আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম!' ইস কি যে বলেন! আমি আপনার চেয়ে কত ছোট। আপনি কত বড় মানুষ, আপনি একজন স্রষ্টা, আমার কাছে দেবতার মতো।' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্রীদীপ এই সময়ে বললেন, 'কিন্তু আপনি তো দেবতা টেবতা বিশেষ মানেন না !' অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কেন মানব না! নিশ্চয়ই মানি, তবে ঐ সাধারণ লোকের মতো লোক দেখানো ভড়ং আমার নেই'। 'না না আপনি মোটেই দেবতা মানেন না।' শ্রীদীপবাবু জোর দিয়ে একথা বলতে এবার আমার ভিতরে ভিতরে সামান্য রাগ হল। আমি কিছুটা অসহিষ্ণুভাবে বললাম, 'আপনি কি করে জানলেন আমি দেবতা টেবতা মানি কিনা! তিনি বললেন, 'প্রমাণ দবকার? আচ্ছা প্রমাণ দিচ্ছি, এই দেখুন না একটু আগেই আপনি বলেছেন আমি নাকি আপনার নিকট দেবতার মতো, কিন্তু আগেব দিনে সাক্ষাতের সময় বলে দিয়েছিলাম আমার দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় শুধু 'দীপ' বলে 'তুমি' করে সম্বোধন করবেন। এতক্ষণ হয়ে গেল আপনাদের বাড়িতে এসেছি কিন্তু আপনি কি আমার সেদিনের কথা মতো একবারও দীপ বলে ডেকেছেন! তুমি করে সম্বোধন করছেন! করেননি তো! তাহলে দেবতাকে মানছেন কোথায়?' খুব গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করা তাঁর কথাগুলো শুনে আমি হেসে ফেললাম, এবং বললাম, 'আচ্ছা বলছি, তা শ্রীদীপবাবু অনেকক্ষণ তো হল পেটে কিছু পড়েনি এবার কিছু খান আপনি, একটু অপেক্ষা করুন আমি চট করে দোতলা থেকে আসছি!' বলে যেই পিছন ফিরেছি অমনি শাড়িব আঁচলটা টেনে ধরে আগে বলুন, 'দীপ তোমার কি খিদে পায়নি? কিছু খাবে না? তারপর আমার জবাব শুনে তবে নীচে নামতে পাবেন।'

আচম্বিতে আঁচলে টান পড়তেই ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আমি ততক্ষণে শ্রীদীপেব কাছাকাছি চলে এসেছি। তিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'আগে দীপ বলে ডাকুন, তারপর যে ভাবে বললাম ঐভাবে বলুন তবে আপনি নীচে যেতে পাবেন।' 'আচ্ছা বাবা বলছি, বলছি আগে আঁচলটা ছেড়ে দাও তো!' আমি আঁচলটা ছাড়তে বলার সঙ্গে সঙ্গে দীপ সেটা ছেড়ে দিল। এবারে আমি চোখেব দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, 'দীপ এবার বল তুমি কি খাবে?' কথাগুলো বলতে বলতে লজ্জায় মুখটা নীচু করে ফেলছি দেখে আমার থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে মুখটা তুলে ধরে বলল, 'এতক্ষণে আমার শান্তি হল, এবার তুমি যা দেবে আমি

তাই খাবো, পারো তো সামান্য চাট্টি মুড়ি নিয়ে এসো।' ওঁর নাম ধরে ডেকে এবং তুমি করে সম্বোধন করে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল তাই অনুমতি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে দোতলায়। বেশ কিছুটা সময় দোতলায় কাটিয়ে দুটো ছোট থালায় মশলা-মুড়ি তৈরি করে নিয়ে আবার যখন তিনতলার ঘরে উঠে এলাম তখন দীপ তন্ময় হয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে। তার তন্ময়তা ভঙ্গ না করে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। এক সময় আবৃত্তি শেষ হলে ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে একটা থালা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'দেখ আমি নিজে মেখেছি তোমার ভালো লাগবে কিনা দেখ,' দীপ বলল, 'তুমি পাশে বসে থাকলে আমার সব ভালো লাগবে!' তুমি একটু পাশে বস তো। আমি তোমাকে একবার ভালো করে দেখি!' কথাগুলো বলে সে আমার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তা দেখে আমি বললাম, 'আমি তো রূপসী নই, সুন্দরীও নই, নেহাতই সাদামাটা বাংলা দেশের একটা কালো মেয়ে, আমার মধ্যে দেখবার আর কী আছে, যে, তুমি অমন করে তাকিয়ে আছো?'

আমার কথা শুনে দীপ মুহূর্ত কয়েক কোনো উত্তর না করে, পরে বলল, 'নারীর রূপ কি শুধু তার দেহে! শুধু তার চামড়ার রঙে! নারীর আসল রূপ যে তার অন্তরের আলোয়, হৃদয়ের মাধুর্য্যে, তার শোভন আচরণে, তার বিনম্র ভাষায়, তার তিতিক্ষায়, তার মার্জনায়, তার ধৈর্য্যে, এ সব কথা কি তুমি জানো না!' তার এই সমস্ত কথা শুনে আমি যেন কেমন হয়ে যাই, তাই খাওয়া ভুলে বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে আবার বলে, 'তুমি জানো, তুমি যে আমার যৌবনের উদ্যানে নিসর্গের সুরভী মাখা 'হাস্নুহানা' ফুল। আমার মনের কথা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়! তুমি যে আমার বুকের মধ্যে হৃদয়ের পরতে পরতে মিশে আছো, তোমার সৌরভেই যে আমি হয়ে আছি মাতাল তা কি তুমি বুঝতে পারো না!'

এ পর্যন্ত শুনেই আমি বলে উঠলাম, না না দীপ তুমি এভাবে আমায় পাগল করে দিও না, আমায় আমায়........' বলতে বলতে কথা ফুরিয়ে গেল। তার পাশ থেকে উঠে নিজের আবেগকে সংযত করবার জন্য আমি বাইরে ছাদে চলে গেলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই দীপ আবার ডাক দিল। তার সেই ডাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার তার পাশে গিয়ে বসলাম। সে বলল,'নাও নিজের হাতে তুমি আমায় মুড়ি খাইয়ে দাও! যন্ত্রচালিতের মতো তার মাথাটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে মুখে সামান্য চাট্টি মুড়ি দিয়ে দিলাম। মুড়ি চিবোতে চিবোতেই সে বলল, 'জানো হাস্নুহানা তুমি সত্যিই আমার জন্ম জন্মান্তরের বন্ধু! কথা দিচ্ছি তোমার বন্ধুত্বকে কোনোদিন অবহেলা করব না।' তার কথা শুনে বুঝলাম আজ থেকে আমি তার 'হাস্নুহানা।' আবেগের বিহ্বলতায় তার ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'আমিও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, বাকি জীবনটা আমার তোমাকেই উৎসর্গ করলাম!'

কথা বলার সময় আমার হাত দুটো কাঁপছিল, সেটা বুঝে দীপ বলল, 'দারুণ

আবেগে তুমি এখন তন্ময় হয়ে আছ, কি বলছ তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না, তুমি যা বলছ বাস্তবে তুমি কিন্তু তা পারবে না, কারণ তোমার অভিভাবকরা তোমাকে সংসারী দেখতে চাইবেন, সুখী দেখতে চাইবেন, সন্তানবতী দেখতে চাইবেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা যখন ঐসব চাইবেন তখন তুমি তাঁদের কী বলবে!'

দীপের কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, 'তোমার সঙ্গে পবিচয় হবার আগেই সে সব চুকে বুকে গেছে। বড়দা অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমি রাজী হইনি। বারবার অমত করাতে মা ও বড়দা এখন ওচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো তোমার বন্ধুরূপে জীবন কাটানোই আমার বিধিলিপি ছিল, তাই এর আগে বিয়েতে আমি রাজী হইনি।' 'কিন্তু আমি যদি বলি তুমি ভুল করেছ, রাজী হওয়াই তোমার উচিত ছিল। কারণ এদেশে একজন মহিলার অনূঢ়া থেকে একা একা জীবন কাটানো আদৌ সম্ভব কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে!' দীপ বলল।

তার কথা শুনে আমি বললাম, 'কেন সম্ভব নয় কেন? অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মতো আয় বা বিদ্যে আমার যথেষ্ট আছে!' 'এ জীবনে শুধু আয় আর বিদ্যেই কি মানুষকে তৃপ্ত রাখতে পারে! মানুষের কাছে বিশেষ করে একজন পূর্ণবয়স্কা যুবতী নারীর কাছে যে জীবনের সংসারের অনেক দাবী, অনেক চাহিদা! সে সব না মেটালেই যে চতুর্দিকে হৈ হৈ পড়ে যায়!' দীপ কথাগুলো বেশ গম্ভীরভাবেই বলল। তার কথার উত্তরে বললাম, 'তা বলে যাকে তাকে বিয়ে করে সারাজীবন দাসখত লিখে দেওয়ার থেকে, স্বকীয়তা ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়ার থেকে, অনূঢ়া থাকা ঢের ভালো, ঢের বেশী সুখের।' আমার কথা শুনে দীপ হাসতে হাসতে বলল, 'অনূঢ়া তো থাকবে, কিন্তু এ সমাজ থেকে অসভ্য ইতরদের অশুভ দৃষ্টিগুলো, মলিন হাতগুলোকে কী করে আটকাবে! তারা কি তোমায় একা একা ভদ্র-জীবন যাপন করতে দেবে! তারা তো সব সময়েই উত্যক্ত করে মারবে! অনূঢ়া যুবতী নারীর শরীর যে মৃগমাংসের মতোই লোভনীয় তা কি তুমি জানো না বোঝ না!'

দীপের কথার অর্থ এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল। তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সোজাসুজি চোখের দিকে চেয়ে বললাম, 'সে রকম অসহায় অবস্থায় পড়লে তোমার সাহায্য চাইব, কি দেবে না তখন তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে!' দীপ বলল, 'বিপদে সাহায্য নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু তাতেই কি তোমার সব সাধ পূর্ণ হয়ে যাবে! তোমার শরীর, তোমার মন কি কোনোদিন অন্য কিছু চাইবে না!' 'না তোমার বন্ধুত্ব ভিন্ন কোনোদিন আর কিছু চাইব না।' আমার কথা শেষ হতে না হতে সে আবার বলল, 'তোমার পিয়াসী দেহ যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে মাতাল হয়ে ওঠে, যদি সেই মত্ত দেহ কোনো পুরুষ-স্পর্শ কামনা করে তখন কী করবে!'

দীপের এ কথার উত্তরে কী বলা উচিত সেটা না বুঝেই বলে ফেললাম, 'আঃ দীপ আমি কিচ্ছু জানি না শুধু জানি আমার বিপদে আপদে আনন্দে বেদনায় কামনায় বাসনায় তুমি, একমাত্র তুমিই আছো। জীবনের সব অবস্থাতেই প্রয়োজন বুঝলে

তোমাকে স্মরণ করব, তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দেব, তারপর এই আমাকে নিয়ে ভাঙা-গড়া, ছেলে-খেলা যা ইচ্ছা হয় তোমার কোরো। আগে থেকে আমি অত ভাবতে পারছি না। পরিস্থিতি যখন যেমন হবে তখন সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

দৃঢ় কণ্ঠে বলা আমার কথাগুলো শুনে দীপ বলল, 'আমার উপর তোমার এত বিশ্বাস! মাত্র তিন দিনের পরিচয়ে এতটা বিশ্বাস কিন্তু ভালো নয়! এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়!' আমি বললাম, 'বহুদিনের পরিচিত অতি আত্মীয় বিশ্বাসী লোকও মুহূর্তের দুর্বলতায় কত মেয়ের সর্বনাশ করে বসে আর আমি তো একজন সত্যিকারের মানুষকে বিশ্বাস করতে চাইছি! এই মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে হলেও আমার ক্ষতি নেই, কারণ আমি যে এরই মধ্যে মনে প্রাণে তার কাছে সমর্পিতা! যার কাছে মনে প্রাণে আমি সমর্পিতা, সে যদি আমাকে ভেঙে চুরে তছনছ করেও দেয় তবু কোনোদিন তার দোষ দেব না, বরং জানব সেও তো মানুষ তারও তো ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।'

কথাগুলো বললে বলতে ভাবছিলাম, দীপ হয়তো আবেগে উত্তেজনায় আমাকে তার বুকে টেনে নেবে, একটা সম্ভাব্য আদরের কথা ভেবে আবেশে আমার দু-চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু না কয়েক মিনিট কেটে গেলেও তেমন কিছু ঘটল না। দীপ যেখানে ছিল সেখানেই বসে থাকল, শুধু আমার মুখের দিকে তার সুন্দর চোখ দুটো থেকে দৃষ্টি ঝরে পড়তে থাকল। সে দৃষ্টিতে কামনার কলুষ ছিল না, ছিল এক শ্রদ্ধার শোভাঞ্জন, ছিল এক অনাবিল আনন্দের আভাস। তার সেই দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে আমার মাথাটা নীচু হয়ে এল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকার পর সে বলল, আজ তবে যাই এবার অনুমতি দাও, আজ এখন যাই!' আমি বললাম, 'এখনই যাবে! এই তো সবে আটটা, আরও একটু থাকো, নটার সময় যেও!' দীপ বলল, 'না এক্ষুণি যাব, আজ আমার মন প্রাণ ভরে গেছে। এখান থেকে আজ যা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, তা যে আমার কত বড় সম্পদ, সে কথা বলে বোঝাবার নয়। এই সম্পদ প্রাপ্তির আনন্দকে নিরালা নিভৃতে নিজের ঘরের কোণে বসে আমি উপভোগ করতে চাই, প্লিজ তুমি আমায় অনুমতি দাও! আমি এক্ষুণি যাই!'

কথাগুলো বলে সে অপেক্ষা করল না। পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে ছাদে এসে দাঁড়াল। আমিও তার পিছনে এসে ডান হাতটায় টান দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আবার কবে আসছ? দীপ বলল, 'দেখি কবে আবার সময় করে উঠতে পারি!' 'বেশী দেরী সইবে না কিন্তু, দেখা না হলে আমি কিন্তু মরে যাব। তোমার যা ভালো হয় কোরো,' বলে আমি তাকে আমার মনের অবস্থার কথা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিলাম। দীপ বলল, 'ভয় নেই, টান আমারও আছে সুতরাং দেরী হবে না বলেই বোধ হয়!' এরপর নীচে নেমে মাকে প্রণাম করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিনের মতো সে চলে গেল।

দিন কয়েক পরে মহাজাতি সদনে আমার একটা আবৃত্তির প্রোগ্রাম পড়ল। ফোনে

দীপকে তারিখ ও সময় জানিয়ে মহাজাতি সদনের সামনে অপেক্ষা করতে বললাম। যথাসময়ে গিয়ে দেখলাম আমার আগেই দীপ সেখানে হাজির হয়েছে। তাকে দেখে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। কার্ডের নম্বর অনুযায়ী তাকে সামনের দিকে একটা সীটে বসিয়ে আমি উঠে গেলাম মঞ্চে। জনা পাঁচেক আবৃত্তিকারের পর ডাক পড়ল আমার। রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতা পর পর আবৃত্তি করে নীচে নেমে দীপের পাশে বসলাম। আমার বসা দেখে সে একবার শুধু ফিরে তাকিয়ে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে!' ব্যস এরপর আবার নিবিষ্ট চিত্তে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে সে একমনে আবৃত্তি শুনতে থাকল। ঘণ্টা খানেক কেটে যাবার পরে মাঝখানে আর একবার আমার দিকে চেয়ে হাতে একটা কাগজের ছোট্ট ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কাজু আর আঙুর আছে খাও!' আমি বললাম, 'তোমার কই!' 'এই তো', বলে তার হাতের প্যাকেটটা আমাকে দেখিয়ে আবার সে একমনে আবৃত্তি শুনতে লাগল। গভীর মনোযোগ দিয়ে আবৃত্তি শোনা দেখে মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি মঞ্চে পঠিত কবিতার শব্দ বিন্যাস অনুযায়ী তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হচ্ছে। কখনো তার ভুরু কুঞ্চিত হচ্ছে, কখনো ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠছে, আবার কখনো সে বিরক্তি বোধ করে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। সে একমনে আবৃত্তি শুনছে আর পাশে বসে আমি একমনে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর একসময় ঘাড়টা একটু আমার দিকে কাত করে সে বলল, 'আমাদের পিছনে এবং আশে পাশে অনেক দর্শক ও শ্রোতা আছে, তারা কিন্তু মঞ্চ থেকে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে দেখছে!' সে কী বলতে চায় বুঝে লজ্জা পেলাম, বললাম, 'দেখুক গে, ভারী বয়েই গেল! লোকে দেখবে বলে আমার দেখাটা তো আমি বন্ধ করতে পারি না! এই মুহূর্তটিকে কি জীবনে আর কোনো দিন পাবো!'

ইতিমধ্যে হলে আলো জ্বলে উঠল। দশ মিনিটের জন্য অনুষ্ঠানের বিরতি। আমার কথা শুনে দীপ বলল, 'মহাজাতি সদনের আজকের এই মুহূর্ত হয়তো আর ফিরে পাবে না, তবে তুমি যখনই যেখানে ডাকবে, তখনই আমাকে পাবে। কারণ, তুমি ভিন্ন এখন আমার জীবনে আর অন্য কোনো চাওয়া নেই।' 'সত্যি বলছ! আমি প্রশ্ন করলাম। সে বলল, 'সত্যি, সত্যি, সত্যি, তিন সত্যি! তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি আমার মন কী ভালোবাসে, কাকে ভালোবাসে, কী জন্য ভালোবাসে!' 'বুঝেছি তোমার মন নাচ গান কবিতা নাটক ইত্যাদি ভালোবাসে। আসলে তুমি জাতশিল্পী তাই এসব তোমার মর্মের গভীরে তান তোলে, তোমাকে মোহিত করে!' আমার কথা শেষ হতে না হতে সে বলল, 'শুধু তাইই নয়, যাঁরা এসবের চর্চা করেন, আমি তাঁদেরও যথেষ্ট ভালোবাসি, যে জন্য আমি তোমাকে প্রাণপণ ভালোবাসি।' দীপের কথা শুনে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বাঁ হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললাম, দীপ, দীপ তুমি অনন্য, তুমি অসাধারণ, তুমি!' 'থাক থাক হয়েছে। তোমার কাছে আমি কিন্তু সাধারণ, আর সাধারণই থাকতে চাই। তুমি আমাকে ভালোবাস শ্রদ্ধা কর এইটুকুই আমার

কাছে যথেষ্ট, দশ ঘড়া মোহরের থেকেও দামী।' দীপের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'তুমিও আমার কাছে এক আকাশ নীল, এক সাগর ঢেউ, এক অরণ্য বাতাস, আর আর........' 'কি খেই হারিয়ে গেল?' দীপ বলল। আমি সামান্য হেসে বললাম, 'সত্যি দীপ! যখন দূরে থাক, তখন কত কি বলব বলে মনে মনে ঠিক করে রাখি, কিন্তু তুমি কাছে এলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়, সব কথারই খেই হারিয়ে যায়, আমি যেন কেমন হয়ে যাই!' আমার কথা শুনে সে বলল, 'জানো তো ভালোবাসার আবেগ মানুষকে সর্বহারা করে দেয়, মানুষকে উন্মাদ করে দেয়, মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। তুমি কিন্তু সাবধান, আমার জন্য এতটা আবেগ এতটা উন্মাদনা না দেখানোই ভাল, ওতে শুধু তোমার কষ্টই বাড়বে!' 'জানো দীপ, ভালোবাসার জন্য কষ্ট পেতে আমার কষ্ট হয় না, বরং ভালোই লাগে, অবশ্য মাত্র কিছুদিন আগেও আমার এই অনুভূতি ছিল না, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো এই অনুভূতি আমার কোনোদিনই আসত না, আমার জীবনে হঠাৎ তুমি এলে তাই আনন্দ এল, আর যেখানে আনন্দ আছে সেখানে কষ্ট তো কিছু আসবেই দীপ! সুখের অপর পিঠের নামই দুঃখ, তোমার জন্য দুঃখ পেতে বা কষ্ট স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্রও ভীত নই, আমি সব সহ্য করতে পারব!'

আমার কথা শুনে সে বলল, 'সত্যিই তুমি অদ্ভুত মহিলা, মা না হয়েও তুমি যেন প্রত্যেকটি মায়ের মতোই ধৈর্য্যশীলা! আচ্ছা হাস্নুহানা আমি যদি কোনোদিন বিশ্বাস-ঘাতকতা করি?' 'করবে, সে বিশ্বাসঘাতকতা তো তুমি আমার সঙ্গেই করবে, জেনে রেখো আমার সঙ্গে তুমি যাইই করো পৃথিবীর তৃতীয় ব্যক্তি কোনোদিনই তা জানতে পারবে না, আমার জীবন চলে গেলেও না!' দীপের কথার উত্তরে স্পষ্টভাবে কথাগুলো বললাম আমার চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'সত্যিই আশ্চর্য তুমি! ইতিমধ্যে হলের আলো নিভে গেল বিরতি-অন্তে পুনরায় মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হল। দীপও চুপ করে গেল। আমার খুবই ইচ্ছা করছিল দীপের সঙ্গে প্রাণ খুলে আরও কথা বলতে, কিন্তু তার নীরব ব্যক্তিত্বপূর্ণ গাম্ভীর্য আমাকে চুপ করিয়ে দিল। শুধু দীপের ডান হাতটা কোলের উপর নিয়ে একমনে আবৃত্তি শুনতে লাগলাম।

অবশেষে একসময় অনুষ্ঠান শেষ হল দীপ ও আমি একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়ায় এলাম। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে আমাকে শিবপুরের বাসে তুলে দিল এবং বাস না ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে তার টেলিফোন পেলাম। টেলিফোনে আমি নিরাপদে পৌঁছেছি কিনা সে জানতে চাইল। আমার ইতিবাচক উত্তর শুনে তবে তার শান্তি হল। দীপ ছিল এমনই, সে ছিল কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল অন্তরের অধিকারী একজন মানুষ!

তার সঙ্গে কয়েকদিনের মেলামেশাতেই আমার মানসিক অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে তাকে কদিন না দেখতে পেলেই মনে হত কত যুগ যেন দেখিনি, তাই দুদিন যেতে না যেতেই এক মঙ্গলবারে তাকে ফোন করে বললাম, 'আজ

আড়াইটে তিনটের সময় তোমার অফিসে আসছি, তুমি থাকবে তো?' দীপ বলল, 'চলে এসো।' সে চলে এসো বললেও আমি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলাম, 'আমি গেলে তোমার কাজের কোনো ক্ষতি হবে না তো?' সে বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটাও তো আমার একটা কাজ, নিজে যেচে এখানে এসে যখন সে কাজটার দায়িত্ব তুমি হালকা করে দিতে চাইছ তখন ক্ষতি নয়, তাতে আমার লাভই হবে, কারণ আমি নিজে গেলে তো আমার কাজের সময় থেকে সময় বের করেই যেতে হত! আর তুমি এখানে এলে প্রয়োজনে কাজও করতে পারব আবার কাজের ফাঁকে তোমার সঙ্গে গল্পও করতে পারব! তুমি এলে আমার কোনো ক্ষতি নেই বরং দু-দিক থেকেই লাভ!' তার কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল, হাসতে হাসতেই বললাম, 'বাঃ তুমি খুব হিসেবী তো! গল্প করতে করতে কাজও করবে, অর্থাৎ টাকা রোজগারের ফন্দি ফিকির মাথায় ঘুরবে। সেটি হচ্ছে না মশায়, আমি গিয়ে পৌঁছনোব সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ফেলে রেখেই আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে, তারপর ছটা বাজলে আমায় বাসে তুলে দিয়ে তবে তুমি ছুটি পাবে! কি রাজী তো?' আমার কথায় দীপ বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা! যথা আজ্ঞা দেবী, তুমি এসো তো আগে, তারপর তোমার হাতের রশির টানেই না হয় চলবে আমার মনের রথ! এসো চলে এসো।' 'ঠিক আছে, ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবো' বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

বেলা প্রায় আড়াইটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে দীপের কাছে পৌঁছতে প্রায় সওয়া তিনটে হয়ে গেল। অফিসের সামনে আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে, 'এসো এসো', বলে তার ব্যক্তিগত চেম্বারে বসতে অনুরোধ করল। তার অনুরোধ শুনে বললাম, 'তুমি হাতের কাজ সেরে নাও তারপর না হয় একসঙ্গেই তোমার চেম্বারে গিয়ে বসব!' প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হাতের কাগজ পত্রের কাজগুলো সেরে দীপ বলল 'এবার চল, ভিতরে যাওয়া যাক!' তার কথামতো ভিতরে এসে বসলাম।

চেম্বারে ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা দীপ, এই এত রকম লোহা-লক্কড়ের ঘোর প্যাঁচে থেকেও তুমি এত সুন্দর কবিতা উপন্যাস লেখ কি করে? এত বিচিত্র রকমের ছবি আঁক কি করে? আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, তুমি কী ভাবে কী কর!' মৃদু হেসে সে জবাব দিল, 'দেখ, মানুষের মন দুটো, চেতনা দুটো। একটা বহির্মুখী আর একটা অন্তর্মুখী। বহির্মুখী চেতনা বা মনের দ্বারা আমি ব্যবসাটা চালিয়ে যাই কারণ তা না হলে ভাত জুটবে না, আর অন্তর্মুখী চেতনা বা বোধের দ্বারা কথা-সাহিত্য বা চিত্র-শিল্প রচনা করি। তোমার এই দীপ নামক ব্যক্তিটি সব সময়েই দ্বৈত-সত্তা বয়ে বেড়াচ্ছে। আমার এই দ্বৈত-সত্তা না থাকলে এই সব করা হয়তো সম্ভব হত না। এই সত্তাটা ঈশ্বরের দানও বলতে পারো!' 'সত্যি পরম করুণাময়ের ইচ্ছা ছাড়া তুমি এই সত্তাও পেতে না আর এত বড়ও হতে পারতে না!' বলে আমি দীপেরই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

আমার কথা শুনে দীপ বলল, 'তুমিও কিছু কম নও, কারণ, একই অঙ্গে এত

রূপ দেখিনি তো আগে। একটা সংহিতা একই সঙ্গে গানের জগত, বাজনার জগত, নাচের জগত, আবৃত্তি-অভিনয়ের জগত, শিক্ষার জগত ইত্যাদি কত জগতেই না আলো বিকিরণ করছে! তোমার প্রতিও ঐ ঈশ্বর নামক অচেনা ব্যক্তিটির. কৃপা না থাকলে কি এটা সম্ভব হতো! বল!' 'তা সত্যি!' বলে আমিও দীপের কথায় সায় দিলাম!

কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে দীপ বলল, 'গানের বিহগী হঠাৎ নীরব হয়ে গেল কেন? কই কিছু বলছ না যে?' 'সব সময়েই কি বলা যায়? কিছু কিছু সময় আছে যখন শুধুমাত্র অন্যের কাছ থেকে কিছু শুনতে ইচ্ছে হয়, তুমি কিছু বল বরং আমি শুনি। আমার এ কথায় সে বলল, 'উৎস বন্ধ হয়ে গেলে নদী বইবে কেমন করে? তুমি যে আমার স্রোতধারার উৎস হাস্নু! তুমি কিছু বল তবে তো আমি কিছু বলতে পারব!' তার কথায় আমি বললাম, 'আমার মাথায় এখন শান্তিনিকেতন ঘুরছে, আগামী বৃহস্পতিবার স্কুলের দিদিমণিদের সঙ্গে, শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাচ্ছি। তুমিও চল দীপ আমাদের সঙ্গে!' 'তা হয় না হাস্নু, তোমার বন্ধুরা আমায় কেউ জানেন না, চেনেন না, সুতরাং এ যাত্রায় তোমার সঙ্গী হওয়া হল না। তুমি বরং একাই যাও পরে অন্য সময় দেখা যাবে!' সে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আমি আবার বললাম, 'তা হলে যাবার সময় হাওড়া স্টেশনে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস য়্যাটেন্ড করো, যাবার আগে যেন তোমার মুখটা একবার দেখতে পাই। কি আসবে তো সেদিন হাওড়া স্টেশনে?' সে উত্তর দিল, 'আচ্ছা যাব, নিশ্চয়ই যাব।' উত্তরটা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখখানা থমথম করছে, বুঝলাম আমি যাচ্ছি শুনে তারও আন্তরিক ইচ্ছে, যাবার। এ অবস্থাটা বুঝে আমি বললাম, 'তুমি গেলে আমার খুবই ভালো লাগত, চল না দীপ, প্লীজ!' 'তা হয় না হাস্নু, তাছাড়া আমাকে কোথাও যেতে গেলে অনেক আগে থেকে সব কাজ গুছিয়ে যে কদিন থাকব না তার প্রোগ্রাম করে দিয়ে তবে যেতে হবে।' একথা বলে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তার কথা শুনে বুঝলাম, না যেতে পারার দরুন তার মনে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে; তাই আবার বললাম, 'থাক তাহলে আমিও যাব না। যখন তুমি সময় পাবে তখন না হয় দু-জনে এক সঙ্গেই যাব!' 'সে কি! আমার জন্য তোমার নিজের মনের আনন্দ জলাঞ্জলি দেবে নাকি? তাছাড়া ওঁরাই বা কী ভাববেন! তুমি নিশ্চয়ই যাবে। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি ওঁদের সঙ্গে যাও! আমার জন্য তোমার যাওয়া বন্ধ হলে আমিও কষ্ট পাব। সুতরাং তোমার যাওয়াই উচিত!'

দীপের কথা শুনে আমি বললাম, 'যাওয়া না হলে কে কী ভাববে তা জানি না, তাছাড়া কেউ যদি ভিতরে ভিতরে কিছু ভাবে সে কি আমাকে বলে ভাববে, আর ভাবলেও কিছু যায় আসে না, সুতরাং ও নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাই না। আসলে তোমার ইচ্ছা রয়েছে অথচ তুমি যেতে পারছ না বলে আমারও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা দীপ, এক কাজ করলে হয় না! এদিক থেকে আমরা এক সঙ্গে গেলাম, আর একই দিনে তুমি একাই শান্তিনিকেতনে গেলে, তারপর ঐখানে

গিয়ে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হ'ল। ওখানেই আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই!' একথা শুনে সে বলল, 'না না এভাবে যাওয়ার দরকারই বা কি! যাবার সময় সারা রাস্তা তোমাকে সঙ্গে পাব না একা একা মুখ বুজে যাওয়া, সে আমার ভালো লাগবে না, তাছাড়া অত লুকোচুরি করার দরকারই বা কি? সকলের সঙ্গে পরিচয় টরিচয় হলে পরেই না হয় একসময় তোমার বন্ধুদের সঙ্গেই যাব! সকলে মিলে হৈ হৈ করতে করতে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার মজাই আলাদা। এবারকার মতো তুমি ঘুরে এসো প্লীজ!' 'দেখ ঠিক বলছ তো, তুমি কষ্ট পাবে না তো?' বলে আমি তার মুখের দিকে চাইলাম। সে বলল, 'তোমাকে বন্ধু বলে বরণ করে নিয়ে একটা অত্যন্ত সাধারণ কারণে যদি আমাকে কষ্ট পেতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন সত্যিকারের কষ্ট পাবার মতো বড় কারণ ঘটে, তখন আমি করবটা কী! হ্যাঁ কষ্ট অবশ্যই আমার একটা আছে, যেটা হ'ল তোমাকে রোজ দুবেলা দেখতে না পাওয়া, তবে সেটা তো আমি, 'জেনে শুনে বিষ করেছি পান!' সুতরাং এটাও সহ্য করে নিতে হবে। খোলা মনে খুব শান্তির সঙ্গে তুমি শান্তিনিকেতনে যাও, ফিরে এসে গল্প করবে আমি শুনব, তাতেই আমার শান্তি হবে; তাছাড়া ইতিপূর্বে আমিও দু-দুবার সেখানে গেছি।' আমি বললাম, আমি তো এর আগে পাঁচবার গেছি কিন্তু শান্তিনিকেতন এমন জায়গা যে দু-বার, পাঁচবার কেন জীবনে দুশো বার গেলেও মন ভরে না। বিশ্বকবির স্মৃতি, তাঁর চরণের ধুলো যে জায়গার পথে পথে ছড়ানো আছে, তাঁর শরীরের স্পর্শ পাওয়া বাতাস যেখানকার আকাশে মাটিতে বনে বনে গাছে গাছে জড়িয়ে আছে, তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব মধুর ধ্বনি যেখানকার বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে আছে, সেখানে গেলে আমার তো আর ফিরতেই ইচ্ছা করে না। মনে হয় কোনো একটা পথের পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়ে বেঁধে থেকে যাই! ওখানে রাস্তায় রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় আমি যেন এই জন্যেই জন্ম নিয়েছিলাম, পৃথিবীতে আর যেন আমার কোনো কাজ নেই মনে হয়—

"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই।
'কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি!
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে, যদি ধরা দেয়, বাঁধিব স্বপনপাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো
সে যে কাছে নাই।
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি!"

আমার গান থামতে না থামতে দীপ তার দু-হাতে আমার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলল, 'হাসনু, তুমি এত সুন্দর! তুমি এত গভীর! তুমি এত মধুর' এমন শিশুর

মতো উচ্ছ্বাসে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো সে বলে ফেলল, যে, আমাকে চমকে উঠে তার দিকে তাকাতে হল। তার মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অপরূপ আনন্দে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার হাতটা ধরে তার হাত দুটো তিরতির করে কাঁপছে। আমি ভাবলাম এক্ষুণি হয়তো সে এক ঝটকায় তার বুকে টেনে নেবে, আদরে আদরে আমায় পাগল করে তুলবে। তার হাতের কম্পনে আমার হৃদয় মনেও কাঁপন ধরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেললাম, কিন্তু নাঃ সে কিছুই করল না, এমনকি হাতে একটা আলতো টান দিয়েও কাছে যাবার বা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ দিল না, বরং আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে আবার বলে উঠল, 'হাস্নু তোমাকে বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য, আমি গর্বিত, আমি মুগ্ধ!'

তার কথা বলার ধরনে আমি মর্মে মর্মে বুঝলাম, আমাকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে সত্যিই সে মুগ্ধ, সে গর্বিত, কিন্তু বন্ধু হলেও আমি তো তার পুরুষ-বন্ধু নই, আমি যে তার নারী-বন্ধু এবং পুরুষের কাছে নারীর শরীরের যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে একটা অন্য চাহিদা থাকে সেটার তো কোনো ইঙ্গিতই পাই না, তার কাছ থেকে! মনে মনে ভাবলাম তবে কি আমার বন্ধুটি সত্যি সত্যিই নারী-সত্তাটিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বন্ধু-সত্তাটিকেই চায়! নাকি আমার দিক থেকে ইঙ্গিতের আশায় আছে!

মনের মধ্যে আমার যখন হাজার প্রশ্নের ভিড় এবং চোখে যখন শত বিস্ময়ের চমক, ঠিক তখনই আমাকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে দীপ বলল, 'তোমার সঙ্গে আচম্বিত পরিচয়ের পর এই কয়েক মাসের মধ্যে এত গভীরভাবে মেলামেশার কারণ হয়তো মাঝে মাঝে তুমি নিজের মনে অনুসন্ধান করছ, তাই তোমাকে আজ একটা খুব স্পষ্ট কথা বলি, সেটা হল, পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গ যেমন নারীর প্রয়োজন, তেমনি পুরুষদেরও মহিলা-বন্ধুর প্রয়োজন আছে, হ্যাঁ, শুধুমাত্র বন্ধুত্বের প্রয়োজনেই; সেখানে অন্য কিছুর আকাঙক্ষা নাও থাকতে পারে, কারণ, জীবনকে এক একজন এক একরকম দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। এর মধ্যে একটা আরও গুরুতর কথা আছে, সেটা হল যখনই কোনো পুরুষ বন্ধু নারী বন্ধুর কোমলতার সুযোগে শরীর-ভিখারী হয়ে ওঠে তখনই কিন্তু সে বন্ধুত্বের মর্যাদা হারায়, কারণ, কোনো নারীর মনের চাহিদা আর শরীরের চাহিদা এক নাও হতে পারে। হয়তো কোনো নারীর মন কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণপণে শুধু বন্ধুত্বটুকুই বজায় রেখে চলতে চাইছে সেক্ষেত্রে ভুল বুঝে অতি সাধারণ পুরুষের মতো নিম্নস্তরের ভেবে নিয়ে তাকে শরীরের দিকে আকর্ষণ করতে চাইছে এটা বুঝতে পারলে সেই নারীর প্রতি পুরুষ বন্ধুটির সম্মান বোধের পারদ এক লহমায় নেমে গিয়ে শূন্যে ঠেকতে পারে। নারী হল পুরুষের সাধনার বস্তু আর পুরুষ হল নারীর সনাতন সঙ্গী, সুতরাং দু-জনে দুজনের কাছাকাছি আসতে কোনো কালেই কোনো বাধা থাকা উচিত নয়, কিন্তু তাই বলে মেলামেশার সূত্র ধরে, ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে যা খুশী তাই করা চলে না বা উচিত নয়। বিশেষত যাঁরা শিল্পী-পুরুষ বা শিল্পী-

নারী তাঁদের তো নয়ই, কারণ নারীর প্রতি আবেগ বা পুরুষের প্রতি ভালোবাসা বা বিশ্বাস কমে গেলে পুরুষের বা নারীর শিল্প সাধনায় মস্ত ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং দুজনের হৃদয়ের আবেগকে যে যতটা বেশী সংযত রাখতে পারে সে শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে ততটা সার্থক হয়ে উঠতে পারে, কারণ আবেগের মৃত্যু মানেই শিল্পের মৃত্যু, আর শিল্পের মৃত্যু অর্থে শিল্পীরও মৃত্যু।'

দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মুখ চোখ সব লাল হয়ে উঠছিল, ভাবছিলাম এই মুহূর্তের আমার বুকের ভিতরের কথাগুলোও সে পড়ে ফেলেছে। আমার গূঢ় হৃদয়ের গোপন ইঙ্গিতটাও কি দীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে, তাই আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই এত কঠিন কথাগুলো এত সুন্দর মোলায়েম করে বলল! লজ্জায় মাটিতে মেশে যেতে ইচ্ছে করছিল, তাই কখন যে নিজের চোখ দুটো দীপের চোখের থেকে সরে গিয়ে ঘরের মেঝের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে তা নিজেই বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলাম তখন, যখন সে তার ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে আমার চিবুকটা তুলে ধরে বলল, 'হাস্নু বিশ্বাস কর, তোমাকে লজ্জা দেবার জন্য আমি কথাগুলো বলিনি, বলছি আমার প্রাণের বহু বছরের একটা ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। বিশ্বাস কর জ্ঞান হয়ে অবধি আমি এরকম গুণবতী এক মহিলাকে বন্ধুরূপে জীবনে পেতে চেয়েছি যে, আমাকে নিয়ে ভাঙবে, গড়বে, খেলবে, দুঃখ দেবে, আনন্দ দেবে, বকবে এবং প্রেরণার ঝড় দিয়ে সৃষ্টির রঙ্গভূমিতে আছাড় মেরে ফেলবে। জানো হাস্নু তুমি হলে আমার সেই গুণবতী, আমার সেই আকাঙ্ক্ষিতা। আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে তোমাকে আমি কোনো রকমেই হারাতে চাই না, তাই তোমার দিকে লোভের হাতও বাড়াতে চাই না!'

তার কথা শুনে কিছুটা অপ্রতিভভাবে আমি বলে ফেললাম, 'কিন্তু আমি তো কামনা বাসনাময়ী একজন নারী। আমার ইচ্ছা যখন তোমার কাছে ধরাই পড়ে গেছে, তখন কী ভাবে আমায় দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চাও! তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কি বন্ধ করতে হবে?' 'নাঃ তা কখনই বলিনি আমি, তবে এই যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অথচ না পাওয়ার বেদনা, এই বেদনাকে বুকে বন্দী করেই চোখের জল মুছতে মুছতেই আমাদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।' দীপের কথায় আমি চমকে উঠে বলে ফেলি, 'সারাজীবন শুধু কাঁদতে হবে! তুমি কাঁদবে আমি দেখব! আমি কেঁদে মরব আর তুমি বসে বসে দেখবে! অথচ উপায় থাকতেও তুমি আমার হবে না। আমি তোমার হতে পারব না! কেন? কিসের জন্য! কান্না দিয়ে পান্না সৃষ্টি করবার জন্য!'

এরপর কিছুটা রূঢ়ভাবে আমি বললাম, 'জানি না কী লাভ হবে আমাকে বঞ্চিত করে কিংবা তোমার নিজেকে বঞ্চিত হতে দিয়ে, কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না, সেটা হল শুধু গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা বা ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জীবনের অনেক না পাওয়ার বেদনাকে কি ভুলতে পারে!'

কঠিনভাবে দীপ উত্তর দিল, 'অবশ্যই পারে! শিল্প-কলা সৃষ্টির নন্দন কাননে যাদের

বাস, তারা জীবনের বহু দুঃখ বহু বেদনাকেই ভুলতে পারে। আবার সেই বেদনার পথ বেয়ে বহু সময়েই এমন সার্থক সৃষ্টি করে যেতে পারে, যা দেখে সারা পৃথিবী তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। মানুষের ইতিহাসে এমন নজীর ভূরি ভূরি আছে।' 'দীপ তোমাকে আমি মাঝে মাঝে একেবারে বুঝতে পারি না, কারণ তোমার কথাগুলোই আমাকে এমন এক জগতে নিয়ে যায় যে, সে জগত থেকে স্বাভাবিক জগতে ফিরে আসতে আমার অনেক সময় লেগে যায়। তুমি সোজাসুজি বলতো তুমি আমাকে বন্ধু ভিন্ন অন্য কোনোরূপে পেতে চাও কিনা?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে খুব স্পষ্ট করে বলে, 'না, তোমাকে বন্ধুরূপে ভিন্ন শয্যাসঙ্গিনীরূপে কোনোদিনই আমি পেতে চাই না!' তাব কথায় 'চুপ কর দীপ, প্লিজ চুপ কর! আমায় আর লজ্জা দিও না, আমায় আর ছোট করো না, প্লিজ দীপ, প্লিজ।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না দেখে সে উঠে এসে আমার মুখটা মাথাটা তার বুকে সজোরে চেপে ধরে বলল, 'কেঁদো না, চুপ কর হাস্নু, এই পৃথিবীতে সবারই সব ইচ্ছা পূরণ হয় না; কিছু কিছু বাকি থেকে যায়। তবে তুমি যদি অন্য কাউকে তোমার জীবনে গ্রহণ করতে চাও তাতে আমি অখুশী হব না। তুমি যদি তাতে সুখী হও আমিও সুখী হব। ইচ্ছা হলে তুমি তাই কোরো আমার কোনো বাধা থাকবে না।' 'না দীপ, তা আমি পারব না, মনটা থাকবে তোমার কাছে বাঁধা, আর শরীরটা নিয়ে অন্য একজন ছিনিমিনি খেলবে এটা ভাবতে গেলেই আমার নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে। তার চেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেব বাকি কয়েকটা বছর তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার জাদুভরা কণ্ঠস্বর শুনে.' বলে আমি থেমে গেলাম।

আমার শেষের কথায় সে হেসে ফেলল, বলল, 'আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভাবছ তো! কিংবা ভাবছ হয়তো শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ! কিন্তু বিশ্বাস কর কোনোটাই আমি নই! তুমি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এলে একদিন আমার জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনাব কথা বলব, শুনলে তুমি বুঝবে কেন আমি প্রিয়ারূপে না চেয়ে তোমাকে কেবলমাত্র বন্ধুরূপে পেতে চেয়েছি।' 'আজই বল না দীপ, এই তো মাত্র সাড়ে চারটে বাজল, এখনও তো অনেক সময় রয়েছে!' বলে আমি জিদ করতে লাগলাম কিন্তু সে বলল, 'না সে কথা এখানে নয় একেবারে একান্তে, যেখানে শুধুমাত্র তুমি আর আমি থাকব সেখানেই বলব। তুমি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে ফোন করবে আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার তিনতলার লাইব্রেরী ঘরে বসে সব বলব। প্লিজ এই কটা দিন একটু ধৈর্য্য ধর।'

কথা শেষ করে সে বাইরে থেকে ডেকে একজন কর্মচারীকে কিছু খাবার আর কফি আনতে নির্দেশ দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খাবার আর কফি এসে গেলে দীপ নিজে হাতে সেগুলি সাজিয়ে আমায় একটা প্লেট দিয়ে নিজে একটা নিল। জল খাবার খেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'আজ আমার মনের প্রচণ্ড একটা ভার তোমার কাছে নামাতে পেরে খুব হালকা লাগছে। তুমি যেন কোনো অন্ধ মোহের

বশে আমার সঙ্গে ঘুরো না বা আমার কাছে এসো না। আসতে হলে সব মোহ ময়লা উড়িয়ে দিয়ে বৈশাখী ঝড়ের মতো এসো। জানো হাম্মু একটু আগে তোমাকে বুকের উপর নিতে পারব না এই কথাগুলো বলতে আসলে আমার বুকটাই ভেঙে যাচ্ছিল, কিন্তু না বলেও উপায় ছিল না, কারণ তুমি বড্ড দ্রুত আমার বুকের উপর আশ্রয় খুঁজছিলে, কিন্তু আমি চাই তুমি চিরদিন আমার বুকের ভিতরে, হৃদয়ের গভীরে বন্দী থাকো, আমার অনুভবের অণুতে তুমি মিশে থাকো। কখনই আমার যৌবনের যৌন জগতের মধ্যে তোমার সিংহাসন আমি পাততে চাই না।'

'বুঝেছি, এক কথা বার বার বলতে হবে না। আমি এত মূর্খও নই, আর অবুঝও নই যে, মেয়ে গণ্ডারের মতো নাসাখর্গ নিয়ে চতুর্দিক তেড়ে ফুঁড়ে গিয়ে তোমার বুকের উপর আমার শরীরের প্রতিষ্ঠা করব। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার কাছে আসতে পেলেই হল! আর আমার কিছু চাই না।' বলে তার হাতটা ধরে বললাম, 'এবার চল তো ওঠা যাক, আমার আবার সন্ধে ছটা থেকে আবৃত্তির ক্লাস নিতে হবে! প্লিজ চল, আমায় একটু বাসে তুলে দেবে চল!'

আমার কথায় মিনিট দশেকের মধ্যে অফিসের ফাইলপত্র গুছিয়ে সব বন্ধ করে সে আমায় বাসে তুলে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরের দিন বুধবার বিকেলে তাকে ফোনে পুনরায় খেয়াল করিয়ে দিলাম যে বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে আমরা যাচ্ছি, সে যেন এসে ঐ গাড়ি অ্যাটেন্ড করে। আমার কথা অনুযায়ী সে আসবে বলে ফোন ছেড়ে দিল।

গাড়ি ছাড়বার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে স্টেশনে হাজির হয়ে অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে দেখতে পেলাম না। এদিকে গাড়ি ছাড়বার সময় এগিয়ে আসছে অথচ তার দেখা নেই। মনটা ভিতরে ভিতরে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে যখন, ঠিক তখনই দীপ দু-হাতে দুটো প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখলাম জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রের তাপে তার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। দেখেই ধমকে ওঠার ভঙ্গিতে বললাম, 'এত ঘামছ কেন' কোথায় রোদে রোদে ঘোরা হচ্ছিল শুনি!' আমি ঐভাবে বলতেই আমার বন্ধুদের সামনে হাসতে হাসতে সে বলল, 'দেখছেন, কীভাবে ছাত্রদের মতো আমাকেও ধমকাচ্ছে! আচ্ছা আপনারাই বলুন তো এই ভাবে ধমক খাবার কি আমার আর বয়স আছে!' তার কথায় আমার বন্ধুরা সকলে হো হো করে হেসে ফেলল, আর এক মুহূর্তের মধ্যে সবার সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল। এরপর কিছু বলবার আগেই আমার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও এই ঝোলা দুটো ধর। এর মধ্যে তোমাদের সবার জন্য পথের কিছু রসদ আছে। একটা ঝোলা আমি হাত থেকে নিয়ে দেখি তার মধ্যে অন্তত শতখানেক লিচু, ডজন খানেক কলা আর কেজি দুয়েক আম আছে। সেটা দেখেই আবার যেই ধমক লাগিয়েছি, 'কে বলেছে এই রোদে গরমে ঘুরে ঘুরে এগুলো কিনে আনতে? এই এত জিনিস কে খাবে? আমরা তো মাত্র চারটে প্রাণী! পয়সা খুব সস্তা হয়েছে না!'

আমার ধমকের চোটে বাঁ হাতের ব্যাগটা আর আমায় দিতে সাহস করল না, সেটা নিজেই আমাদের জিনিস পত্রের মাঝখানে নামিয়ে রাখল। চট করে সেটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি তার মধ্যেও কেজিখানেক চানাচুর, একটা বিরাট প্যাকেটে মিষ্টি ও পাউণ্ড দুয়েক পাউরুটি রয়েছে। তার এই ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার এবার হাসি পেল। আমার সঙ্গে আমার সেজদি ও বেলা ছিল, তাদের উদ্দেশে বললাম, 'ভালোই হল চল, আজ আর হোটেলে উঠে খাওয়ার অর্ডার করতে হবে না; উনি যা দিয়েছেন তাতে আমাদের চারজনের দুদিন চলে যাবে।' বলতে বলতে আবার তার দিকে তাকিয়ে ধমকাতে গিয়ে দেখি সে তখন আমাদের আর এক বন্ধুর পিছনে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে আছে। শিশুর মতো তার ঐ ভাবে লুকিয়ে থাকা দেখে গম্ভীরভাবে বলে উঠলাম, 'এ যে সুধীন দত্তের সেই 'উটপাখী' কবিতার মতো হচ্ছে। সামনে এসো আমি দেখে ফেলেছি, আর লুকিয়ে লাভ হবে না।'

আমার কথায় ভয়ে ভয়ে সে কাছে এসে দাঁড়াতেই কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'আচ্ছা তুমি কি বলতো? এই চারটি মাত্র প্রাণীর জন্যে এত জিনিস কেউ কেনে! আমরা কি রাক্ষস, তাছাড়া এই গরমে রৌদ্রে এই সব কিনতে গিয়ে নিজের মুখখানাকে কী করেছ একবার আয়নায় দেখতো!' বলে নিজের ভ্যানিটি থেকে ছোট্ট আয়নাটা বের করে তার হাতে দিতে যেতেই সে রুমাল দিয়ে মুখটা ঘাড়টা মুছতে মুছতে পিছন ফিরে পালাতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে তার ডান হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে বললাম, 'আমার ভয়ে আবার পালানো হচ্ছে! গাড়ি ছাড়বার আগে পর্যন্ত আমার পাশ থেকে নড়লে আর কোনোদিন কথাই বলব না!' এতক্ষণে সে চুপ করে দাঁড়াল। এরপর সবার সঙ্গে ভালোভাবে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। বেলার হাজব্যান্ড সঙ্গে গিয়েছিল, তাছাড়াও আমাদের দুই দাদা অজিতাভ আর জ্ঞানমোহন সঙ্গে গিয়েছিলেন ট্রেনে তুলে দিতে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

এদিকে মিনিট দশেক বাকি থাকতে গাড়িও প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। গাড়িতে উঠে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখে আরও কিছুক্ষণ গল্প করলাম। সিগন্যাল সবুজ হতেই গাড়িতে উঠে আমার কেনা মিষ্টির প্যাকেট থেকে ওর মুখে একটা মিষ্টি খাইয়ে দিলাম আর অন্য সকলকে হাতে হাতে দিয়ে দিলাম। তারপর গাড়ি ছাড়তেই জানালার ধারে এসে বললাম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব মন খারাপ লাগছে, ভালো করে থেকো আর শনিবার বিকেলেই আমাদের বাড়ি আসা চাই, আমরা শনিবার সকালেই ফিরে পড়ব, সুতরাং বিকেলে অবশ্যই আসা চাই!' বলতে বলতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

দুদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে শনিবার সকালে বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখি বাড়ির ফোন খারাপ, তাকে ফোন করার কোনো উপায় নেই। সে আসবে কি আসবে না ভেবে সারা দুপুর ছটফট করে যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময় দীপ এল। সে দোতলায় পা দিতেই, 'কি এতক্ষণে, এত দেরীতে? সেই কখন আড়াইটায় দোকান বন্ধ হয়েছে,

আর এই এতক্ষণে আসা হ'ল?' বলে অনুযোগ করলাম। সে বলল, 'আড়াইটায় বললেই কি ঘড়ি ধরে আড়াইটায় বন্ধ করা যায়! অনেক সময় অনেক কাজ থাকে যা সারতে সারতে দেরী হয়ে যায়। রাগ করছ কেন এই তো এসেছি! সেই রাত্রি নটা পর্যন্ত থাকব, হয়েছে তো!' তার কথা শুনে বললাম, 'ঠিক বলছ? ছটা বাজতে না বাজতে পালাই পালাই করবে না তো?' আমার কথায় দীপ বলল 'সত্যি বলছি পালাব না, সেই নটা পর্যন্ত থাকব!' 'তাহলে ঠিক আছে,' বলে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সে অফিস থেকে এসেছিল তাই তাকে বাথরুম থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসতে অনুরোধ করে তার জন্য খাবার সাজাতে বসে গেলাম। বাথরুম থেকে বের হলে নিজ হাতে তাকে জলখাবার এগিয়ে দিয়ে সেজদিকে ওর জন্য একটু চা করে দিতে অনুরোধ করলাম। চা জলখাবার খাওয়া হলে শান্তিনিকেতন থেকে আনা দুটো উপহার সামগ্রী ওর হাতে দিলাম। একটা খুব সুন্দর কাজ করা কাপড়ের সাইড ব্যাগ, আর একটা বাঁশের তৈরী পেন-স্ট্যান্ড। জিনিস দুটো দেখে ও ভীষণ খুশী হল। একবার শুধু বলল, 'তোমার এত কষ্টের পয়সা! আমার জন্য খরচা করতে গেলে কেন?' আমি বললাম, 'আমার মন চেয়েছে তাই এনেছি, তাছাড়া জীবনে এই প্রথম মনের মতো কারোকে আমি উপহার দিচ্ছি। এই নিয়ে তুমি একদম আমাকে বকবে না কিন্তু! তুমি বকলে আমি কেঁদে ফেলব!' আমার কথা শুনে সে হেসে ফেলল, এবং বলল, 'একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো, আমি কি তোমায় বকছি, দেখছ না তোমার দেওয়া উপহারগুলো আমার কত ভালো লেগেছে! ভালো লেগেছে বলে আগে মাথায় ঠেকিয়ে তবে পাশে রাখলাম! তুমি একেবারে আমাকে বুঝতে চেষ্টা কর না।'

দীপের কথায় তার কাঁধে হাতটা রেখে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'বুঝি বুঝি সব বুঝি, তুমি যে আমায় কত ভালোবাসো তাও বুঝি, তবে ভালোবাসা যেখানে, মান অভিমান তো সেখানেই, তাই মাঝে মাঝে ঐগুলোও এসে পড়ে। তুমি আমায় মাফ কর। আচ্ছা চল এবার উপরের লাইব্রেরীতে চল। আজকে কিন্তু সেই না-বলা কাহিনীটি শুনে তবে তোমায় ছাড়ব, তাতে যত রাতই হোক! চল প্লিজ উপরে চল, 'বলতে বলতে তার একটা হাত ধরে প্রায় জোর করে তাকে টানতে টানতে উপরের ঘরে নিয়ে এলাম।

উপরের ঘরে এসে মিনিট কয়েক একথা ও কথার পর সে শুরু করল, 'আজ থেকে বছর দশেক আগে ঠিক তোমার মতোই একজন আমার বান্ধবী জুটেছিল। সেই বহুগুণসম্পন্না মহিলা, নাম মিলি চ্যাটার্জ্জি। প্রথম মেলা মেশার মাস কয়েক পর থেকেই সেও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার দিকে এগোচ্ছিল, অবশ্য সেক্ষেত্রে দোষ ছিল সম্পূর্ণ আমার। আমারই উচিত হয়নি তার সামনে লোভের সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলে ধরা। আমিই তাকে আমার দিকে প্রচণ্ড গতিতে এগোতে দিয়েছিলাম এবং সঙ্গে

সঙ্গে নিজেও এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সব বুঝে তার বাবা একদিন হঠাৎ বললেন, 'বাবা দীপ, ঐ মেয়েটি আমার একমাত্র আশা। ওর উপর আমাদের এই কটি প্রাণীর, অর্থাৎ ওর মা, দাদা, বৌদি, দিদি ও আমার কজনের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করছে। তুমি ওকে কেড়ে নিলে আমাদের কি গতি হবে বাবা!' মুহূর্তে তাঁর কথার অর্থ বুঝে মিলির অসাক্ষাতেই তার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, 'আপনার ভয় নেই, আমি এমন কিছু করব না যাতে মিলিকে আপনাদের সকলকে ত্যাগ করে যেতে হয়, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। এরপর ধীরে ধীরে তাব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেওতো তোমারই মতো জেদী ছিল। প্রায়ই ফোন করে আমাকে যেতে বলত, দেখা করতে বলত। মাঝে মধ্যে তার কথা রাখতে এবং খানিকটা নিজের মনের দুর্বলতায় তার কাছে যেতাম। লেকের মাঝে ঘাসের উপর বসে গল্প করতাম। এভাবে বছর তিনেক কাটবার পর, তারই অনুরোধে পড়ে তার বৃদ্ধ বাবা, বৃদ্ধা মা ও তাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেলাম। তার বাবার ছিল হাই-ব্লাডপ্রেসার এবং আগে বার দুয়েক হার্ট-অ্যাটাকও হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির জার্নির ধকলে এবং হোটেলের তিন তলার ঘরে ওঠা নামার ধকলে পুরী পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনে তাঁর হল হার্ট অ্যাটাক। হোটেলের মালিকের সহযোগিতায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে পাঁচ-ছদিনের মাথায় বেশ সুস্থ করে তুললাম। বাবাকে সুস্থ দেখে কন্যা মিলি সেদিন সকাল থেকে বেশ খুশী খুশীই ছিল। দুপুরে মাকে খাইয়ে সে আমার ঘরে এসে বলল, 'আজ তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করব, আমার খাবারও তোমার ঘরেই দিতে বলেছি।' কথাগুলো বলেই সে মুহূর্তের মধ্যে বের হয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মাকে বিশ্রাম করতে বলে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে বেয়ারা দু-জনের খাবার আমার ঘবে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। খেতে খেতে আমাকে সে বলল, 'আজ দুটোর পবে বিকেল বেলাটা আমি তোমার কাছেই কাটাতে চাই। তোমার আপত্তি হবে না তো?' আমি বললাম, 'না না স্বচ্ছন্দে, তোমার যখন ইচ্ছা তখন আমার কোনো আপত্তি নেই।'

এরপর বেয়ারা থালা বাসন নিয়ে গেলে সে আর একবার মাকে দেখে এল এবং আমার ঘরে ঢুকেই ঘরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে সিধে এসে খাটে আমার পাশে বসল এবং হাসিমুখে প্রাণ খুলে নানান গল্প করতে শুরু করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল দিনের আলোতেই আমি যেন তার কমনীয় নারী শরীরের অর্ঘ গ্রহণ করি, এইটাই সে চাইছিল। আমি কিন্তু তার বাবাকে দেওয়া কথা স্মরণ করে খুব সতর্ক ছিলাম, তাই সমস্ত কথারই খুব হাল্কাভাবে হেসে উত্তর দিচ্ছিলাম। হেসে হেসে কথা বলতে বলতেই এক সময় সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল এবং বলল, 'এই কদিন তো বাবাকে নিয়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে, পর পব রাত জেগে বাবার সেবা করে তুমি তাঁকে ভালো করে তুললে, গত কাল থেকে বাবাতো বেশ ভাল আছেন, চল না দীপ আজ বিকেলে দুজনে মিলে গোটা পুরী শহরটা ঘুরে আসি!' তার কথায় আমি বললাম, 'না, তোমার বাবা আপাতত ভালো থাকলেও আমি যতক্ষণ না ভালয় ভালয়

তাঁকে তোমাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার শান্তি নেই, তাছাড়া পুরী আমি এর আগে বার তিনেক এসেছি সুতরাং পুরী ঘোরার শখ এখন আর নেই। আমি বরং বিকেলে হাসপাতালে তোমার বাবার কাছে থাকব, তুমি তোমার মাকে নিয়ে একটা রিকশা ঠিক করে পুরীটা ঘুরে এসো।'

গম্ভীর কণ্ঠে বলা আমার কথা শুনে তার হাসি খুশী ভাবটা দপ করে নিভে গেল, মুখটা বিছানার দিকে নামিয়ে সে বলল, 'তুমি একটা অনুরোধ আমার রাখবে!' আমি বললাম, 'কী?' তুমি সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরে একটিবার আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসবে? মাত্র আধ ঘণ্টা?' বলে সে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'আচ্ছা!'

বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখে এরপর সে আমার ঘর থেকে চলে গেল। বেলা ঠিক চারটের সময় আমি যখন তার বাবাকে দেখতে যাবার জন্য রেডি হয়ে হোটেলের দুশো ছয় নম্বর ঘর থেকে বের হচ্ছি দেখি সে একটা পাট ভাঙা হাল্কা রঙের শাড়িতে সেজে আমার ঘরের ঠিক সামনে বারান্দায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনে সে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম হাল্কা হলুদ রঙের জড়ির কাজ করা পাড়ের সবুজ শাড়ি তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজে তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। কপালে গোলাকার একটা সিঁদুর রঙের টিপ পরেছে এবং দু হাতে কিছু কস্টিউম জুয়েলারী পরেছে। ঐ সাজে দু-পা এগিয়ে সে সামনে এসে দাঁড়াতেই আমার মনে হল আমি যেন মিলিকে আজ প্রথম দেখছি। সে কাছে আসতেই যে কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই কথাটাই মুখ ফসকে বলে ফেললাম, বলে ফেললাম, 'মিলি তুমি এত সুন্দর! তোমার এত রূপ!' লজ্জা পেয়ে সে মুখটা নীচু করে ধীরে ধীরে বলল, 'মাকে নিয়ে আমি বেরোচ্ছি, সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরে তোমার জন্য ঘরেতেই ওয়েট করব, তুমি এসে আমাকে ডেকে নেবে কিন্তু!' 'ঠিক আছে,' বলে আমি হাসপাতালের দিকে যাত্রা করলাম।

সন্ধে সাতটায় ফিরে মিলিকে ডেকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গেলাম। পায়চারী করতে করতে স্বর্গদ্বার থেকে বি এন আর হোটেলের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসে সামান্য ফাঁকা জায়গা দেখে দুজনে বালুচরে বসলাম। মিলির পরনে বিকেলের সেই সাজ তখনো ছিল। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আমি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। এক সময়ে সে বলল, 'আচ্ছা দীপ, আজ এখন আমি যা যা তোমায় জিজ্ঞাসা করব তার সঠিক উত্তর দেবে তো তুমি? মনে রেখো যা উত্তর দেবে তার সাক্ষী আমি ছাড়া আরও দুজন থাকবে, তারা হল সামনের এই বিশাল সমুদ্র আর মাথার উপরের এই তারাভরা নীল আকাশ। তুমি যা উত্তর দেবে তার প্রত্যেকটি শব্দকে, প্রতিটি বর্ণকে আমি সত্য বলে মেনে নেব। অন্তত আজকে যে প্রসঙ্গ তুলব সেই প্রসঙ্গে জীবনে আর তোমাকে কোনোদিন বিরক্ত করব না।' তার কথায় আমি বললাম, 'দেখ মিলি, আমি তোমায় কতখানি ভালোবাসি তা তোমার অজানা নয়,' তা হলে মিথ্যা

করে সাজিয়ে উত্তর দেব একথাটা তুমি আগে থেকে ভাবছই বা কেন! আমি যা বলব তা সত্যিই বলব, এখন বল তোমার কী এমন গুরুতর প্রশ্ন!'

তার ডাগর ডাগর দু-চোখে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আমার ডান হাতটা দু-হাতের মুঠোয় ধরে সে বলল, 'এই হাতটা আমার বুকের বাঁদিকে যেখানে হৃদয় আছে সেখানে একবার ঠেকাও তো!' বলতে বলতে আমার হাতটা নিয়ে তার যৌবন পুষ্ট বক্ষের বাঁদিকে সে নিজেই ঠেকিয়ে দিল এবং বলল, 'এবার বল, তুমি আমায় ভালোবাস কিনা!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ তোমাকে ভালোবাসি।' সে আবার প্রশ্ন করল, 'তাহলে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তুমি আমায় এমন করে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ কেন? তোমার কী হয়েছে?' এই প্রশ্নের জবাব কী দেব, কী করে তাকে বলব যে তোমার বাবাই আমাকে তোমার সঙ্গে মেলামেশা কমাতে বলেছেন, কেমন করে বলব, তিনিই বলেছেন, 'বাবা দীপ তুমি আমার মিলিকে কেড়ে নিও না!'

কী উত্তর দেব যখন ভাবছি তখনই আমার হাতটাকে তার বুকে আরও নিবিড় করে চেপে ধরে বলল, 'কী হল বল! তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার আজকের জবাবের উপরেই নির্ভর করছে জীবনের সব থেকে বড় বিষয়ের উপর আমার দিক নির্ণয়ের ব্যাপারটা! আশা করি তুমি বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাইছি!' বলে সে চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার বুকের মধ্যে আমার হাতটা ধরে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল তার শরীরের কম্পন থেকে বুঝতে পারলাম, যে একটি সুন্দর পবিত্র প্রত্যাশায় তার সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে। ঐ মুহূর্তে তাকে কী করে বোঝাই যে, আমিও প্রাণপণে তাকে চাই, হ্যাঁ একেবারে নিজের করে চাই। ভাবলাম চোখকান বন্ধ করে বলেই ফেলি, 'মিলি তোমাকে ছাড়া বাঁচা আমার সম্ভব নয়, শুধুমাত্র বন্ধুরূপেই নয় বধূরূপে আমার বুকের উপর তোমাকে পেতে চাই।' কিন্তু নাঃ পারলাম না, প্রায় মিনিট দুই নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। তার গোটা শরীরটা তখনও থর থর করে কাঁপছে, তার বুকের উপর আমার হাতটা থাকায় আমি সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। একবার মনে হল এমনি করে কাঁপতে কাঁপতে সে হয়তো আবেশে অচেতন হয়ে পড়বে, এক সময় তার মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে আমার কাঁধে রাখল এবং আবার বলল, 'কী হল উত্তর দিচ্ছ না যে?'

আমি বললাম, 'মিলি যে কারণেই হোক তোমার এই প্রশ্নের জবাবটা দিতে আমি আপাতত অক্ষম। জবাবটা আমি তোমায় সামান্য কিছুদিন বাদে দেব, আজকের মতো তুমি আমায় ক্ষমা কর! প্লিজ মিলি, তুমি আমায় মাফ করে দাও।' এভাবে কথা বলায় এক ঝটকায় আমার হাতটা নামিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'না কিছুদিন না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় তুমি পাবে, আজই রাত্রের মধ্যে আমার জবাবটা চাই, শুধুমাত্র এই জবাবটা পাবার জন্যই এত ঝামেলা করে বাবা মাকে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে এসেছি। অন্য কোনো কারণে নয়, সুতরাং এ প্রশ্নের জবাবটা এই পুরীতে বসেই আমি পেতে চাই।' এই কথাগুলো বলেই আমাকে আর কিছু

বলবার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে সে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল। তার চলে যাওয়া দেখে আমিও তার পিছনে পিছনে এসে হোটেলের ঘরে ঢুকলাম।

এরপর সারা সন্ধ্যে সে আর আমার ঘরে এল না, এল একেবারে ডিনারের পর, শুতে যাবার আগে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য এসে আমাকে বলে গেল, 'রাত্রে ঘরের দরজাটা খুলে রেখো আমি ঠিক সাড়ে এগারটা নাগাদ তোমার কাছে আসব।' দরজার কাছ থেকে কথাটা বলে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে চলে গেল। সে চলে যাবার পর রাত্রি সাড়ে নটা থেকে টান টান উত্তেজনায় আমার সময় কাটতে লাগল। চোখের তন্দ্রা কোথায় যেন উবে গেল। ভয়ে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসতে লাগল। ভয়টা এই কারণে যে, উত্তরটা কী দেব। সাজিয়ে গুছিয়ে উত্তর দিলে তার মতো উচ্চ-শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার মিথ্যাটা ধরে ফেলবে, আমি অনেক ছোট হয়ে যাব। একবার ভাবলাম, তার বাবার করা অনুরোধটা খোলাখুলিই তাকে বলা উচিত, কিন্তু আবার ভাবলাম, তাহলে তার বাবাকে মেয়ের কাছে অনেক ছোট করা হবে। বিছানায় বসে সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কান মাথা সব গরম হয়ে উঠল। বাইরে সমুদ্রের দিকের ছোট্ট বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই সমুদ্র পেরিয়ে আসা হু হু হাওয়ায় মিনিট কয়েকের মধ্যেই মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে এল, হাতের ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি এগারটা পঁচিশ। আরও কয়েক মিনিট কাটতেই খুট করে ঘরের দরজা খুলে মিলি এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সোজাসুজি বারান্দায় এসে আমার হাতে টান দিয়ে সে বলল, 'চল ঘরে চল।' যন্ত্রচালিতের মতো তার পিছনে ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় তার দিকে তাকিয়ে তাকে কেমন যেন মোহময়ী ও রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।

আমার হাতটা তখনও তার হাতের মুঠোয় ধরা আছে। সেই অবস্থায় সে, এসে সুইচ অন করে ঘরের টিউব লাইট ও আরও দুটো লাইট জ্বেলে দিল এবং সোজাসুজি দু-হাত দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে চিবুকটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরে 'ভালো করে চেয়ে দেখতো আমার চোখে মুখে কী লেখা আছে! কোনোদিন তো ভালো করে আমাকে দেখবার চেষ্টাই করোনি। আজ দেখ, আমাকে সম্পূর্ণ করে দেখে নাও,' বলে আমার কোমর ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে গিয়ে সিঁথিতে নিজের হাতে খানিকটা সিঁদুর লাগিয়ে, কপালে চওড়া করে একটা সিঁদুরের টিপ পরে মাথায় শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে ঘোমটা টেনে নিয়ে আমার সামনে এসে ফের আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে, 'দেখ এবার আরও ভালো করে দেখ,' এই বলে সে তার ঠোঁট দুটোকে আমার ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল। তার পরণে ছিল রক্তজবা রঙের একটা সিল্কের শাড়ি আর ঐ শাড়ির কাপড়েরই একটা ম্যাচ করা ব্লাউজ। ঐ সাজে সে ঘরে ঢুকতে প্রথম থেকেই আমার বুকের ভিতরে মাতন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তার উপর সিঁথিতে কপালে সিঁদুর দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে কোমর জড়িয়ে ঠোঁট দুটোকে মুখের সামনে তুলে ধরতেই, আমার বিশ্বভুবন আমার নিজস্ব অস্তিত্ব সব

যেন চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল। মুহূর্ত কয়েক মুখের দিকে চেয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে তার মাথাটা সে আমার বুকে গুঁজে ধরল। আমিও সব কিছু ভুলে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মুখটা নামিয়ে তার ঠোঁটে যৌবনের অনুরাগের চিহ্ন এঁকে দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময় মনে হল, কেউ যেন বলছেন, 'বাবা দীপ মিলিকে তুমি কেড়ে নিও না, ওই ই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা, পাঁচ পাঁচটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাকর্ত্রী, বাবা দীপ, অমন করে মিলিকে তুমি কেড়ে নিও না, বাবা কেড়ে নিও না!'

আচম্বিতে আমি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'নাঃ, এ হতে পারে না, আমি কথা দিয়েছি, ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছি। এই শ্রীক্ষেত্রে এসে সে কথার খেলাপ আমি করতে পারি না, এ পাপ, মহাপাপ!'

আমার অস্ফুট কথার দু-একটা শব্দ মিলির কানেও পৌঁছেছিল, বুক থেকে মুখটা তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'কী পাপ! কিসের পাপ! একজন পূর্ণবয়স্কা শিক্ষিতা যুবতী যখন তার অন্তরের সমস্ত অনুরাগের রক্ত-রাঙা রঙকে ঢেলে দিয়ে তার প্রেমাস্পদের মন রাঙিয়ে দিতে চাইছে তার হৃদয়ের মদির নেশায় মনের মানুষটাকে মাতাল করে দিতে চাইছে, যৌবনতপ্ত দেহের আগুনে যখন তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের শরীরকে তপ্ত করতে চাইছে, তখন পাপের চিন্তা। কিসের পাপ দীপ? এতে কোনও পাপ নেই। এসো তুমি এসো, বলে দ্রুত হাতে সে ঘরের সমস্ত আলো একে একে নিভিয়ে ফেলল এবং দু-হাত দিয়ে টানতে টানতে আমায় বিছানায় নিয়ে এল। তার হাতের টানে আমি বিছানার এক পাশে বসে পড়তেই আমার কোলে মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলাম তার উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক তার শরীরে নেই, আমার হাত দুটো টেনে এনে তার নগ্ন পিঠের উপর ঠেকিয়ে সে বলল, আমি বুঝেছি দীপ, যে কোনো কারণেই হোক তুমি আমায় বিয়ে করতে পারবে না। শুধুমাত্র আজকের রাতটুকু আমাকে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা দাও, মাত্র আজকের রাতটুকু!' কথাগুলো বলতে বলতে সে কাঁদতে থাকল, আর আমার কোলে মাথাটা গুঁজে ধরল।

প্রেম ভালোবাসা মানুষকে যে কতটা বিহ্বল করে, কতটা আত্মভোলা, কতটা সর্বত্যাগী করে তোলে, কতটা অচেতন করে তোলে সেটা বুঝেই মিলির সর্বনাশ করতে পারলাম না। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে খুব নম্র কণ্ঠে বললাম, 'মিলি, আমি তোমাকে এভাবে কোনোদিনই চাইনি, আর তুমিও চাওনি! আমি জানি মিলি, তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসা তা আমি জানি.....কিন্তু তোমার বাবা আমায় যে অনুরোধ করেছেন তার জন্যই তোমায় বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এক ঝটকায় উঠে বসে আমার বুকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'বল বাবা কী বলেছেন! তোমাকে বলতেই হবে, বাবা কী বলেছেন!' আমি বললাম, 'না, তোমার বাবাকে আমি ছোট করতে পারব না, তবে এইটুকু তোমাকে বলতে পারি কোনোদিন যদি তোমার বাবা

সোৎসাহে মত দেন তাহলে আমি সেই দিনই তোমাকে আমার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করব, একটি দিনও দেরী করব না।' 'ঠিক আছে আমাকে বলো না, কিন্তু আজকের রাতটুকু আমাকে গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কিসে?' বলে সে তার ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরল। আমি বললাম, 'সসম্মানে যেদিন নিতে পারব সেই দিন তোমার সব গ্রহণ করব, এভাবে নয়। একটা দারুণ আবেগের বশে এখন তুমি নিজেকে এগিয়ে দিচ্ছ, সব বুঝে আমি তোমাকে এভাবে গ্রহণ করতে পারি না। এতে তোমার অসম্মানই হবে। হয়তো তোমার দেহটা আমাব পাওয়া হবে কিন্তু পরবর্তীকালে সারাজীবন তোমার আমার দুজনেরই অনুতাপ হবে।' 'তুমি বিশ্বাস কর দীপ মনে প্রাণে তোমাকেই আমি স্বামী বলে গ্রহণ করেছি, তাই তোমাকে সবকিছু সমর্পণ করলেও আমার কোনোদিন কোন অনুতাপ হবে না, প্লীজ দীপ, তুমি আজকের রাতটুকুর জন্যে আমাকে গ্রহণ কর।' মিলির এই কথায় এবার আমি দৃঢ়ভাবে বলতে বাধ্য হলাম, 'তুমি কী করতে যাচ্ছ তা কি তুমি বোঝ না? আজ এই রাত্রে বাসনার বিলাসে, কামনার তীব্র দহনে তুমি যে ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছ, কালকে সকালে সূর্যের আলোয় যখন আয়নার সামনে নিজেকে দেখবে তখন আমাকে আর সম্মান দিতে পারবে? বল আজ এই রাত্রে আমি যদি বিশ্বাসহন্তা হই, আর তার ফলে যদি তোমার মনের কোণে কোনোদিন কোনো অনুতাপ জমা হয় তাহলে পারবে তুমি আর কোনোদিন আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে? নাঃ মিলি, এ হয় না, প্লিজ, তুমি ওঠ,' বলে একরকম জোর করেই তার মাথাটা কোল থেকে তুলে দিলাম।

কোল থেকে উঠে ধীরে ধীরে সে গায়ের জামাগুলো পবে নিল, তারপর আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভিশাপ দিল, বলল, 'আমি যদি ব্রাহ্মণ-কন্যা হই আর মন প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালোবেসে থাকি, এই রাত্রে মন প্রাণ দিয়ে তোমার কাছে নিজের এ দেহ সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকি, তাহলে শুধু এই রাত্রে আমাকে বঞ্চনার কথা ভেবে তুমি আর কোনোদিন কাউকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করে তার শয্যা-সঙ্গী হতে পারবে না। কেউ কাছে এলেই আজকের এই রাত্রের কথা তোমায় সারাজীবন কুরে কুরে খাবে, আর ঠিক আজকের রাত্রের মতোই তুমি সংযত হয়ে যেতে বাধ্য হবে। কোনো রকমেই পারবে না মন প্রাণ শরীর দিয়ে কাউকে গ্রহণ করতে! হ্যাঁ আর একটা কথা শুনে রাখ, ভবিষ্যতে তুমি সামাজিকভাবে আমাকে স্ত্রী হিসাবে কোনোদিন পেতে চাইলেও আর পাবে না।'

রাগে ক্ষোভে দুঃখে অপমানে জর্জরিতা হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বাথরুমে গিয়ে সিঁথির সিঁদুরটা ধুয়ে সে যখন আমার ঘর হতে বের হয়ে যেতে চাইল, তখন ঘড়িতে রাত্রি দুটো। চলে যাওয়া দেখে তার হাতটা ধরে জোর করে তাকে এনে খাটের উপর বসালাম এবং ঘরের ছোট্ট নীলাভ আলোটা জ্বেলে দিয়ে বললাম, 'তুমি তো নির্বোধ নও মিলি! তুমি কি করে ভাবলে যে তোমার অভিশাপ আমায় লাগবে? কেউ কাউকে ভালোবাসলে তার অভিশাপ অনেক সময় আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছা হয়েই

ফিরে আসে!' মিলি বলল, 'তুমি পুরুষ; তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কী করে বুঝবে যে, কোন অবস্থায় পৌঁছলে তবে একজন যুবতী নারী তার কামনার পরম ধনকে অভিশাপ দিতে পারে! নারীর অভিশাপের মর্ম উদ্ধার করতে পুরুষ চিরকালই অক্ষম, হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমাকে আজ একটা অনুরোধ করছি, সেটা হল তুমি আর কোনো দিনও যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে সব ওলট পালট করে দিও না, আমিও সচেতন থাকব, কলকাতায় গিয়ে এরপর থেকে তোমার সামনাসামনি না হতে।'

সে এখনও রেগে আছে বুঝে আমি বললাম, 'দেখ মিলি, সামনে না দাঁড়ালেই যদি মন থেকে মুছে দেওয়া যেত, তাহলে সারা পৃথিবীতে এত কান্না ছড়িয়ে পড়ত না। একজন অপরজনকে না দেখতে পেয়ে কেঁদে মরত না।' আমার কথা শুনে এবার সে কিছুটা নরম হল, ধীরে ধীরে, 'দীপ, প্লিজ তুমি কিছু মনে করো না, আমার নারীত্বকে সোজাসুজি অপমান করলে বলে রাগে দুঃখে অভিমানে তোমাকে যা-তা বলে ফেলেছি। প্লিজ দীপ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও,' বলে সে আমার হাত দুটো ধরে ক্ষমা চাইল। আমি বললাম, 'দোষ তো তোমার নয়, দোষ আমার। তোমার চোখের সামনে দিনের পর দিন ভালোবাসার সবুজ চিঠি তো আমিই মেলে ধরেছিলাম, তাই তো তুমি আজ এত কষ্ট পাচ্ছ! দোষী তুমি নও, দোষী আমি, বরং তুমিই আমায় ক্ষমা কর!' 'ছিঃ দীপ, এসব কী বলছ তুমি! তুমি একাই দোষী! কখনো না, আমিও দিনের পর দিন যখন তখন তোমাকে ডেকেছি তোমাকে কাছে চেয়েছি, তোমাকে একান্তে চেয়েছি, একসঙ্গে কত সিনেমা দেখেছি, কত গল্প করেছি, দোষ আমারও কিছু কম নয়!' 'ছাড় ওসব কথা, দেখ ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটা, বাকি রাতটুকু আজ আমার ঘরেই তুমি থাক। ভোরের আলো ফুটলে ও ঘরে যেও।' আমার এই অনুরোধ শুনে মিলি, 'অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ওঘরে গিয়ে মাকে একবার দেখে আসি, মাকে একবার বলে আসি,' বলে বের হয়ে গেল এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই আবার আমার ঘরে এসে হাজির হল।

এবার সে আসতেই বিছানায় শুয়ে নিজেই আগ্রহ করে তার মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে চেপে ধরলাম সে চুপচাপ মাথাটা বুকের উপর রেখে পড়ে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম সে কাঁদছে। আমি বললাম, 'না পাওয়ার বেদনায় এই যে বুক ফাটা কান্না তোমার, এই কান্নাকে সম্বল করেই আমি বাঁচব! তোমাকে আজ কথা দিচ্ছি মিলি, বিয়ে যদি তোমাকে করতে পারি তাহলেই আমি বিয়ে করব, নচেৎ নয়! আমার কথা শুনে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল, 'ছিঃ ছিঃ কী করলাম বলতো? তোমার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে দিলাম!' 'না মিলি, এ জীবনে কিছুই যায় না ফেলা, সব থাকে জমা হয়ে বুকের ভিতর।' বলে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম।

বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে খানিকটা হাল্কা করে নিয়ে পাশে বসে আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতে শক্ত করে ধরে সে বলল, 'দীপ যদি কোনোদিন

অন্য কোনো মেয়েকে দেখে আমার মতো মনে হয়, তাহলে তুমি তাকে বিয়ে করো, তাতে তুমিও সুখী হবে, আর আমিও জানব তার মধ্যে দিয়ে আমিই তোমার কাছে রয়েছি! বিয়ের আগে একদিন শুধু তাকে নিয়ে আমার কাছে এসো! আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেও!' 'কী বকছ তুমি পাগলের মতো! সারারাত্রি তোমার ঘুম হয়নি তাই এখন আবোল তাবোল বকছ! যাও তো বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে এসে একটু আমার পাশে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতো! এই মাত্র তিনটে বাজল সকাল হতে এখনো ঘণ্টা তিনেক বাকি, সুতরাং প্লিজ একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

একথায় আমার মুখটাকে তার নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে, 'তোমার কাছে বসে পুরো একটা সপ্তাহই আমি না ঘুমিয়ে কাটাতে পারি, বরং তুমি আমার কোলে মাথাটা রেখে একটু ঘুমোও আর আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই,' এই বলে সে আমার ঘাড়ে গলায় হাত বুলোতে লাগল। তার হাতের স্নেহ-স্পর্শে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আর সে আমার মাথাটা আস্তে আস্তে বালিশের উপর নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে তা টের পাইনি। টের পেলাম তখন, যখন বেয়ারার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট নিয়ে সে আমার ঘরে এসে আস্তে আস্তে আমার পায়ে হাত দিয়ে আমায় জাগিয়ে তুলল।

আমি জেগে উঠতেই সে বলল, 'গুড মর্ণিং রাগ করো না প্লীজ, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে দেখে আমি তোমার বেড-টি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। নাও এবার ওঠ, এখন বেলা আটটা, দাঁত মুখ মেজে একেবারে ব্রেক-ফাস্টে বস তো দেখি!' তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে ঘুরে এসো, না হলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলাম দুজনের ব্রেকফাস্ট টেবিলের উপর রাখা হয়েছে আর সে আমার ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে রেডি করে আমার দিকে এগিয়ে ধরেছে।

তার দিকে ভালো করে দেখতেই বুঝতে পারলাম ইতিমধ্যেই তার স্নান হয়ে গেছে। তার পরনে পাট ভাঙা সাদা জমির উপর বেগুনী রঙের ফুল-পাতা ছাপের একখানা সাধারণ শাড়ি। ঐ সাধারণ সাজেই তাকে অসাধারণ দেখাচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ মনে হল ও যেন স্নেহময়ী কোনো মাতৃমূর্তি, হৃদয়ের সমগ্র বাৎসল্য নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! তার এই মূর্তি দেখে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম এবং কাছে গিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে যদি আমার প্রেমের সম্পর্ক না থাকত তাহলে আজকে এই মুহূর্তে অন্যরকম সম্বোধন করে তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম! এই সকালের আলোয় তোমাকে কী অপূর্বই না লাগছে!' আমার কথায় সে হেসে ফেলল, বলল, 'যাক বাবাঃ বাঁচা গেল, এ জন্মে তো আর সে সম্বোধন শোনা হচ্ছে না, পরের জন্মে না হয় দেখা যাবে। যাও তো এখন বাজে না বকে মুখ হাতটা ধুয়ে এসো তো!' আরও মিনিট খানেক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বাথরুমে প্রবেশ করলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে বাথরুম থেকে বের হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসতেই

সে বলল, 'আগামী পরশু রাত্রে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে আমরা ফিরছি, বেয়ারা সকালে এসে টিকিট দিয়ে গেছে। ফার্স্টক্লাসে একটা কুপে রিজার্ভ করে দিয়েছে। হোটেলের মালিক মাখনবাবু বাবার অসুস্থতার কথা ভেবে সঙ্গে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। সত্যি পুরী হোটেলের মালিকরা কী সজ্জন মানুষ, তাই না? বাবার অসুখের কদিন আমাদের জন্য হাসপাতালে খাবার পাঠানো, বাবার জন্য হরলিকস্ করে পাঠানো, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী পথ্য তৈরী করে পাঠানো, দু-বেলা খোঁজ খবর নেওয়া এসব ব্যবস্থা অন্যান্য হোটেল-ওয়ালাদের কাছ থেকে পাবার কথা ভাবাই যায় না। সত্যি এঁদের ব্যবহারের কথা চিরদিন মনে থাকবে।' 'তুমি ঠিক বলেছ, এঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বিশেষ করে মাখনবাবুর ছোট ছেলে রাজকুমার এই কদিন আমাদের জন্য যা করেছে, তা ভোলা যায় না। মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজ কাল দুটো পুরো দিনরাত সময় রয়েছে এর মধ্যে কি কোনো প্রোগ্রাম করতে চাও তুমি? যদি ইচ্ছা কর তো টুরিষ্ট বাসে পুরীর চতুর্দিকের টুরিষ্ট-স্পটগুলো মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পারো। ভুবনেশ্বর, ধবলগিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন ইত্যাদি সবই একদিনে হয়ে যাবে। যাবে তো যাও, আমি তোমার বাবার কাছে থাকব।'

আমার কথা শুনে মিলি বলল, 'তোমাকে বাদ দিয়ে কোনো জায়গায় গিয়ে আমার ভালো লাগবে একথাটা তুমি ভাবলে কী করে? কোথাও যাব না, এই দুটো দিন দুটো রাত আমি ছায়ার মতো তোমার সঙ্গে ঘুরব, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।' 'কেন, আমি কি চিরকালের মতো কোথাও চলে যাচ্ছি নাকি, যে আর কোনোদিন তুমি দেখতে পাবে না!' আমার এ কথায় সে খাওয়া থামিয়ে আমার মুখের দিকে চাইল এবং বলল, 'তুমি চলে যাবে না বটে, কিন্তু আমি চলে যাব অনেক অনেক দুরে, তোমার দেখা সাক্ষাতের অনেকে বাইরে। কলকাতায় ফিরে পরের দিন থেকেই তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না।' কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে তার চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেটা দেখে আমি বললাম, 'কী হচ্ছে কি! এই সাত সকালে খেতে খেতেও কান্না!' 'ও তুমি বুঝবে না, ওটা আমার আমার......' বলতে বলতে সে খাওয়া ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল, বুঝলাম কান্না সামলাবাব জন্য সে আমার চোখের আড়াল হতে চাইছে।

মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন বের হল তখন তার হাত দুটো ধরে নিয়ে এসে আবার ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসালাম! সে বলল, 'আমার খেতে ভালো লাগছে না, শুধু চা-টুকু খাব, আর কিছু খাব না, তুমি খাও!' তার কথা শুনে তার দিকে চায়ের একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা তুলে নিলাম। আমিও কিছু খাচ্ছি না দেখে সে আবার এক পীস টোষ্ট তুলে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা আমি খাচ্ছি, তুমিও খাও, না খেলে তোমার কষ্ট হবে, প্লিজ তুমি ব্রেকফাস্টটা পুরো খেয়ে নাও।' 'তুমিও অন্তত কিছুটা খাও,' বলে আমি অনুরোধ করায় সে বলল, 'এই তো খাচ্ছি!' ব্রেকফাস্টের

পরে কিছুক্ষণের মধ্যে স্নান-টান সেরে দুজনে একটা রিকশা চড়ে হাসপাতালে গেলাম তার বাবার কাছে। দেখলাম তিনি বেশ সুস্থ হয়ে গেছেন। বালিশে হেলান দিয়ে বেডের উপর বসে আছেন এবং আমাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছেন কাছে গিয়ে মিলি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'কি তুমি পরশু পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে তো?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আজই ফিরে যেতে পারি! তোমাদের সেবায় যত্নে আমি বেশ ভালো আছি মা, বাবা দীপ! তোমাকে কী বলে যে আশীর্বাদ করব! তুমি না থাকলে এ যাত্রায় হয়তো আর নিষ্কৃতি ছিল না, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি বাবা তুমি খুব সুখী হবে।'

সেই মুহূর্তে তাঁর কথাকে আমার উপহাস বলেই মনে হল, কারণ কিছুদিন পূর্বেই মিলির সঙ্গ ত্যাগ করতে অনুরোধ করে তিনি যে আমার সব সুখই কেড়ে নিয়েছেন সে কথাটা বিশ্বভুবনে আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, তাই তাঁর ঐ আশীর্বাদ আমার প্রাণে কোনো উৎসাহই সঞ্চার করতে পারল না। তাঁর কথার জবাবে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে শুধু বললাম, 'না না আমি আর কী করেছি কাকাবাবু, বাবা জগন্নাথের করুণায় আপনি ভালো হয়ে উঠেছেন। যা করবার তিনিই করেছেন!'

আমার কথা শুনে মিলি চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে চাইল, মনে হল সে যেন আমার মনের ভিতরটাও পড়ে ফেলেছে! একবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আশ্চর্য মানুষ বটে তুমি! এত ধৈর্য্য তোমার, এত সহনশীলতা তোমার! আচ্ছা দীপ, নিজের অধিকার রক্ষা করতে তুমি কি কারও সঙ্গে কোনো লড়াই চাও না? তোমার সব হারিয়ে যাচ্ছে দেখেও অচল পর্বতের মতো তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। ইস্‌স্‌ তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম তাহলে নিজের অধিকার কেড়ে নেবার জন্য অন্তত প্রাণপণ লড়াই করতাম, তাতে মান-সম্মান প্রাণ থাকতো আর না থাকতো যাই-ই হতো!'

তার কথার উত্তরে ফিসফিস উত্তর দিলাম, 'তোমার একথার জবাব আজ সন্ধ্যায় হোটেলের ঘরে বসেই দেব, এখন নয়।' এরপর ঘণ্টা দুয়েক মিলির বাবার কাছে কাটিয়ে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে গেলাম। সেখানে হোটেল থেকে অন্য একটা রিকশায় ওর মা আগে থাকতেই এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরপর তিনজনে একসঙ্গে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দর্শন করে, মন্দির অঙ্গনের অন্যান্য দ্রষ্টব্য দর্শন করে, বেলা প্রায় সাড়ে-বারোটায় হোটেলে ফিরলাম।

লাঞ্চ হয়ে যাবার পর মিলি মাকে বলে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে সে এক সময় বিছানায় গা এলিয়ে দিল এবং গল্প করতে করতেই এক সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। গত রাত্রে এক মিনিটের জন্যও সে বিশ্রাম পায়নি তাই তার অচৈতন্যের মতো ঐ ঘুম দেখে আমার মায়া হল। আস্তে আস্তে তার পাশ থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় যাবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছি অমনি আমার সার্টের কাপড়টা হাত দিয়ে চেপে ধরে ঘুম জড়ানো কণ্ঠেই বলল, 'একি তুমি

পালাচ্ছো!' আমি কোথায় এলাম তোমার পাশে একটু বিশ্রাম নেব বলে, আর তুমি অচেতন মনে করে আমাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছ! আচ্ছা দীপ তুমি এত নিষ্ঠুব কেন বল তো! আমার এইটুকু সুখও কি তোমার সহ্য হচ্ছে না!'

একথা শুনে বুঝলাম, কর্মে বিশ্রামে, জাগরণে অণুতে পরমাণুতে জড়িয়ে আছে তাব দীপ, হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এতক্ষণ সে তার দীপেরই স্বপ্ন দেখছিল তাই আমি বিছানা ছেড়ে ওঠা মাত্র সে বুঝতে পেরেছে। তার কথায় বড্ড মায়া হল, আবার বসে পড়লাম পাশে। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আদর করে হাত বুলোতে লাগলাম তার ঘাড়ে-গলায়-মাথায়-গালে-কপালে আর সেও পরম নিঃসঙ্কোচে পরম তৃপ্তিতে পরম নিশ্চিন্তে আবার গভীব ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে ঘুমোচ্ছে আর সারা দুপুর মাথায় গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আমি তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস উপলব্ধি করছি। তার বুকের ওঠাপড়া প্রত্যক্ষ করছি। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে তার দীর্ঘশ্বাস শুনছি। এভাবে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কাটাবার পর বেলা আড়াইটা নাগাদ তার তন্দ্রার ঘোর কাটল। হাত দুটো তুলে আমার ঘাড়টা ধরে টেনে নিজের মুখের উপর নামিয়ে এনে সে বলল, 'দীপ তুমি কি দেবদূত! দীপ তুমি কি জাদু জানো? বলনা দীপ!' এর পরে সে বলল, 'এর আগে শুনেছ, একজন পর পুরুষের কোলে মাথা রেখে কামনাময়ী কোনো যুবতী পরম বিশ্বাসে, পরম সুখে, পরম নিশ্চিন্তে এভাবে ঘুমোতে পারে!'

আমি বললাম, 'কেন পাববে না! নারী-পুরুষের আসল সম্পর্ক তো ভালোবাসায়, যদি সে ভালোবাসা বিশ্বাসে স্থির হয়, তাহলে অনেকেই পারে। মিলি আমি যে তোমাকে ভালোবাসি! আর সে ভালোবাসা যে আমার স্থির ভালোবাসা, বিশ্বাসে বিমুগ্ধ ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার জোবেই তুমি ভালোবেসে বিশ্বাস করে আমার কোলে মাথা রেখে পরম তৃপ্তিতে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছ। তোমার ঘুমের সময় সারাক্ষণ আমি তোমার মুখের দিকে চেয়েছিলাম, শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে তোমার বুকের তরঙ্গ শোভা দেখছিলাম। মাঝে মাঝে ভীষণ ইচ্ছা করছিল তোমাকে প্রাণভরে আদর করতে!' 'যা ইচ্ছা করছিল তা করলে না কেন দীপ? বাধা ছিল কি কোথাও? মানা ছিল কি আমার?' বলে সে আমার ঘাড়টাকে ধরে তার মুখের আরও কাছে নিয়ে গেল, তার তপ্ত নিঃশ্বাস আমার সমস্ত মুখমণ্ডল স্পর্শ করতে লাগল।

মুহূর্ত কয়েক ঐভাবে থাকার পর সে স্পষ্ট করে আমার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'দীপ এই মুহূর্তে তোমার ঐ ঠোঁট দুটি যদি আবেগে থরথর আমার এই অধর-ওষ্ঠ স্পর্শ করে তাতে কি বিশ্বের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে? এই সসাগরা পৃথিবীতে কি ভূকম্পন জেগে উঠবে! একবার, শুধু একটি বারের জন্য তোমার ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে দেখ তো আমার ঠোঁট দুটো!' বলে সে চোখ বন্ধ করল। ধীরে ধীরে আমার মুখটা তার মুখের আরও কাছে নামিয়ে এনে আমার ঠোঁট দিয়ে তার কপালে ও চোখের পাতায় চুম্বন করলাম কিন্তু পারলাম না তার ওষ্ঠ স্পর্শ করতে। আমি পারলাম না বুঝে সে আবার চোখ খুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল,

'পারলে না দীপ, তুমি পারলে না! তুমি কি বোঝ না, কী দুঃসহ যন্ত্রণা আমি আমার ছোট্ট বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি! শুধু তোমাকে এই বুকের উপর পাবার জন্য আমি পৃথিবীর সব বুকের ভালোবাসা ত্যাগ করতে পারি, শুধু তোমার অধরের স্পর্শ পাবার জন্য আমি বিশ্বের আর সব সুখ ত্যাগ করে বসে থাকতে পারি! দাও দীপ একবার দাও, শুধু একটি বারের জন্য দাও!' 'না মিলি, না, তা হয় না, আমার হৃদয় মন সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে তোমায় চাইলেও আমি তা পারি না! এই অক্ষমতাকে আমার পৌরুষের দুর্বলতা বা কঠোরতা যাই-ই বল তুমি, আমি তা পারি না। ভবিষ্যতে তোমার বাবা যদি আমাকে আমার শপথ থেকে মুক্ত করেন, তখন তুমি যা বলবে আমি প্রাণভরে তোমায় দেব, তার আগে নয়। আমার কথা শুনে আমার ঘাড়টা ছেড়ে দিয়ে মাথাটা কোল থেকে তুলে সে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'আসলে তুমি একটা ভীরু! একজন মানুষ হয়তো তাঁর স্বার্থের কথা ভেবে তোমাকে দিয়ে কি না কি শপথ করিয়ে নিলেন আর সেই কথা শুনে একজন নারীর নারীত্বকে অবমাননা করছ, তার হৃদয় ভরা ভালোবাসাকে পদদলিত করছ! এখনও সময় আছে, আগামী ছত্রিশটা ঘণ্টা আমি তোমার কাছেই রয়েছি, এর মধ্যে কোনও মুহূর্তে যদি আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা জাগে তো স্পষ্ট করে বোলো।'

কথাগুলো বলে সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে বের হয়ে খাটে না বসে সমুদ্রের দিকের বারান্দায় চেয়ারে গিয়ে বসল। তার কাছে না গিয়ে ঘরের ভিতরে খাটের উপরেই সেদিনের স্টেট্‌সম্যান কাগজখানায় চোখ বুলোতে লাগলাম। আসলে আমি চাইছিলাম বারান্দায় সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ার স্পর্শে তার মনটা শান্ত হোক, তার মনের ভিতরকার অভিমানের মেঘটা কেটে গিয়ে সে নির্মল আকাশের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

খুব বেশী সময় গেল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ধীর পায়ে খাটে আমার পাশে এসে সে বসল। বসেই কাগজটা হাত থেকে নিয়ে ওদিকে টেবিলের উপর রেখে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। এক সময় তার ডান হাতটা আমার বুকে উঠে এল এবং বুকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে উঠল, 'দীপ, এই কদিনের আমার সব নির্লজ্জতা তুমি ক্ষমা করতে পারবে! পার তো ক্ষমা করে দিও।' কথাগুলো বলে আমার পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল।

এই দুদিনের তার সমস্ত ব্যবহার থেকে আমি খুব স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম আমাকে না পাওয়ার বেদনায় তার অন্তরের অন্দরমহলটা ভেঙে ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার ছোট বড় স্বর্ণ মিনারগুলো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কান্না দেখে তাই আর মুখে কোনো সহানুভূতি না জানিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। এক সময় আপনা হতেই তার কান্না থামল। আমি বললাম, 'মিলি, প্লিজ ওঠ এবার, বেলা প্রায় চারটে বাজল, বেয়ারা এক্ষুণি বিকেলের চা নিয়ে আসবে। উঠে, মুখে চোখে জল দিয়ে নিজেকে শান্ত কর এবার।' আমার কথা শুনে

শান্তভাবে উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে এসে চুপ করে পাশে বসল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বেয়ারা চা নিয়ে এলে সে নিজেই উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে চা তৈরী করে আমায় দিল এবং নিজেও এক কাপ নিল। তার মনটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, 'চা খেয়ে একবার বাজারের দিকে যাই চল, তোমার দিদি দাদা বৌদিদের জন্য কিছু কিনতে হবে তো!' গম্ভীরভাবে সে বলল, 'যার সঙ্গে কোনোদিন কোনো সম্পর্কই হবে না, আমার কোনো আত্মীয়স্বজনের জন্য তাকে কিছু কিনতেও হবে না, কিনতে হলে আমি একা গিয়েই কিনবো!' 'আমি সঙ্গে যেতেও পারব না?' আমার একথায় সে চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরী হয়ে দুজনেই বাজারের দিকে গেলাম। ওর দাদার জন্য একটা কটকী লুঙ্গি ও দিদি-বৌদির জন্য দুখানা কটকী শাড়ি আর বাবা মায়ের জন্য এক জোড়া করে জুতো কিনল ; কিন্তু নিজের জন্য কিছু কিনল না, আর একটি পয়সাও আমাকে খরচ করতে দিল না। বাজার থেকে ফেরবার সময় একেবারে হাসপাতালে বাবাকে দেখে রাত্রি আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরেই জিনিসপত্রগুলো রেখে ও একাই সমুদ্রের ধারে যাচ্ছে দেখে আমিও পিছু নিলাম। গত সন্ধ্যার মতো হাঁটতে হাঁটতে স্বর্গদ্বার থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে ও বসল। খুব সন্তর্পণে কোনো কথা না বলে ওর পাশে বসলাম।

আমাকে বসতে দেখে ও বলল, 'মনের পৃথিবীতে ঢুকে তো আমাকে শেষ করে দিয়েছ, বাইরের পৃথিবীতেও কিছুক্ষণের জন্য কি আমাকে একা থাকতে দেবে না?' সে কী বলতে চায় বুঝে তৎক্ষণাৎ তার পাশ থেকে উঠে দূরে অন্ধকারে আমি মিলিয়ে যেতে থাকলাম, বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর বুঝতে পারলাম একা থাকতে চেয়েও সে একা থাকতে পারেনি। খুব কাছেই তার পায়ের শব্দ পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, হাত দশ-পনের দূরেই সে আমার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে হাত দুটো ধরে বললাম, 'এ কী করছ! এ অন্ধকারে একা একা দূরে আসা তোমার ঠিক হয়নি, আমি না হয় পুরুষ মানুষ কিন্তু তুমি?' 'থাক খুব হয়েছে, পুরুষ মানুষের পৌরুষ তো গত আটচল্লিশ ঘন্টায় অনেক বারই দেখলাম। তাছাড়া আমাকে অন্ধকারে একা পেয়ে যদি শেয়াল কুকুরেও টেনে খুবলে খায় তাহলেও আমার আর কোনো আপত্তি নেই, কারণ যার জন্য এতদিন ধরে তিল তিল করে এই দেহের মন্দির সাজালাম সেই-ই যখন অবহেলা করে দূরে চলে গেল, তখন একদিন না একদিন তো কোনো না কোনো শেয়াল কুকুরে এই নারী-মাংস ভক্ষণ করবেই! সুতরাং কার জন্য আর একে বাঁচিয়ে রাখব! আর কিসের জন্যই বা ভয় করব!' দারুণ হতাশায় ও অভিমানে ভরা তার কথাগুলো শুনে বললাম, 'মিলি তুমি বড্ড অবুঝ! আমাদের জীবনটা কি এরই মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে! তোমার বাবা তো ভবিষ্যতে মত পাল্টাতেও পারেন! তখন তো তুমি আমারই হবে!' 'নাঃ আমি আর কোনোদিনই তোমার হব না, হতে পারব না। এই দুনিয়ায় কত মেয়েই তো তার মনের মতো পুরুষকে জীবনে

না পেয়ে মুখে হাসি নিয়ে ঘর সংসার করছে, সন্তানেরও জন্ম দিচ্ছে। রাতে দিনে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিজেদের বলি দিচ্ছে, আমি না হয় তাদেরই মতো এ জীবনটাকে উৎসন্নে দেব!' কথাগুলো বলতে বলতেই আবার দারুণ কান্নায় ভেঙে সে আমাকে বুকের উপর আছড়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শান্ত করে তাকে নিয়ে হোটেলের ঘরে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও নিজের ঘরে মায়ের কাছে চলে গেল। ডিনারের সময় দেখলাম একটা মাত্র খাবার আমার ঘরে দিয়েছে। দেখেই সন্দেহ হওয়াতে ওঘরে গেলাম। ওঘরে ঢুকে দেখলাম ও ঘরেও শুধু মায়ের খাবার। মিলিকে উদ্দেশ করে বললাম, 'মিলি, তুমি আমার ঘরে একবার এসো তো!' কোনো উত্তর না করে সে উঠে এসে আমার ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, তোমার ডিনার কই?' 'আমি খাব না, খেতে ভালো লাগছে না, তাই সন্ধে বেলাতেই নিষেধ করে দিয়েছি!' বলে সে আবার নিজের ঘরের দিকে চলে যেতে চাইল। তার হাতটা ধরে পাশে বসিয়ে বললাম, 'ভালো করেছ, আজ এই প্লেট থেকে দুজনে ডিনার ভাগ করে খাব, নাও তুমি হাত ধুয়ে এসো!' 'দীপ, তুমি বড্ড ছেলে মানুষ হয়ে যাচ্ছ! এই রকম মানসিক অবস্থায় কোনো মেয়ে খেতে পারে! তুমি কি ভাব বলতো আমাকে!' বলে সে চুপ করে খাটের একপাশে বসে পড়ল। 'তাহলে থাক, আমিও খাব না, বরং বেয়ারাকে ডেকে এগুলো ফেরত দিয়ে দিচ্ছি!' বলে যেই আমি বেলের সুইচে হাত দিতে গেছি অমনি আমার হাতটা চেপে ধরে, 'তুমি শিশুর মতো এমন কর না, যে আমার কিচ্ছু করার থাকে না!' বলে সে এসে আমার পাশে ডাইনিং টেবিলে বসল। নিজের হাতে রুটি ছিঁড়ে তাকে খাওয়াতে লাগলাম। দু-এক টুকরো মুখে দেবার পর সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা মেনে একটা রুটি আর একটু তরকারী আমি নিচ্ছি!' আমি বললাম, 'ওরা একজনের জন্যেই যে খাবারটা দিয়েছে তাতে আমাদের দু-জনেরই পেট ভরে যাবে। নাও তো দেখি, দুজনেই খাই এসো,' বলে আমি থামতেই সে বলল, 'তুমি এমনই মানুষ যে ঝগড়া করেও আমায় থাকতে দেবে না! কেন যে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল জানি না!' কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আমার বিছানাটা ঝেড়ে ঝুড়ে টান করে সাজিয়ে দিয়ে, 'দরজা বন্ধ করে দাও আমি ও ঘরে মায়ের কাছে যাচ্ছি!' বলে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিলি বললেও আমি দরজা বন্ধ করিনি, কারণ আমি মনে মনে ভালোই জানতাম এক সময় না এক সময় সে আসবেই, তাই দরজাটা শুধুমাত্র ভেজিয়ে দিয়ে আলো জ্বেলে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। রাত্রি এগারটা নাগাদ সে এসে টুক করে আমার ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিল, তারপর খাটে আমার পাশে বসে বলল, 'তুমি জানতে আমি আসব! দরজা খোলা রেখেছিলে যে!' আমি বললাম, 'কেন আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার হৃদয়টা পাথরের তৈরী!' একথার উত্তর না দিয়ে আমার হাতটা ধরে টেনে সমুদ্রের ধারে বারান্দার দিকে নিয়ে গিয়ে বলল,

'আজ সারারাত এই বাইরে বারান্দায় বসে অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের রূপ দেখে কাটাব। কি তুমি পারবে না রাত জাগতে আমার সঙ্গে?' 'কেন পারব না! তুমি পাশে থাকলে আমি ঘুম ভুলে বহু রাত্রিই জাগতে পারি!' বলে তার পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। অন্য চেয়ারে বসে আমার বাঁ হাতটা সে তার কোলের উপর নিয়ে ধরে থাকল। অন্ধকারের মধ্যে বহুক্ষণ কেটে গেল। ইতিমধ্যে স্বর্গদ্বারের বালুতটের আলোগুলো নিভে গেছে। দূরে অন্ধকারের মধ্যে শুধু সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে ফেনিল ঢেউয়ের সাদা রঙ আর ফসফরাসের উজ্জ্বল আলো ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি দরদর ধারায় তার গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। হাত ধরে তাকে টেনে তুলে ঘরের মধ্যে বিছানায় বসালাম এবং বললাম, 'কেন তুমি দিন রাত কাঁদছ বল তো? আমি কি তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছি? কেন মিছিমিছি তুমি এত উতলা হচ্ছ!' 'এই রাতটুকু, আর মাত্র একটি দিন রাত, তারপর, তারপর সত্যিই আমি হারিয়ে যাব দীপ, দেখে নিও তুমি, আর কোনোদিন আমায় দেখতে পাবে না।' মিলির কথা শুনে, তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু আছে, যেটাকে হঠাৎ তার ভীষণ প্রতিজ্ঞা বলে মনে হল, তাই ভয়ে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল। কাঁপা গলাতেই, 'কেন বার বার তুমি এভাবে আমায় সন্ত্রস্ত করে তুলছ মিলি! তুমি কি জানো না তুমি হারিয়ে গেলে আমিও হারিয়ে যাব!' এই বলে দুহাত দিয়ে সজোরে তাকে নিজের বুকে টেনে নিলাম। আমার বুকের উপর মাথা রেখেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার অঝোর ধারায় কান্না দেখে আমারও চোখে জল এসে গেল। দু ফোঁটা চোখের জল তার মাথায় গালে পড়তেই বুকের থেকে মাথা তুলে সে বলল, 'একি দীপ! তুমি আমার জন্য কাঁদছ! কাঁদো কাঁদো, খুব কেঁদে নাও, এই রাত আর কালকের চব্বিশটা ঘণ্টা, এইটুকু ছাড়া তোমাব কান্না এই মিলি চ্যাটার্জী আর কোনোদিন দেখতে আসবে না, কাঁদো দীপ খুব কাঁদো। কথাগুলো বলতে বলতে সে নিজেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কান্নার মধ্যেই তার গোটা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তার খুবই কষ্ট হচ্ছে বুঝে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এসে মুখে চোখে বুলিয়ে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে কান্না থামলে সে প্রশ্ন করল, 'দীপ আজ আর কালকের রাতটা আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই, তুমি পারমিশন দিচ্ছো তো?' 'নিশ্চয়ই, তবে রোজ রাত্রে এভাবে চলে আসায় তোমার মা কী ভাবছেন বল তো?' সে বলল, 'আমার মা জানেন তুমি আমায় ভালোবাসো আর আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমার দ্বারা যে আমার কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এটাও মা জানেন আর শুধু যে জানেন তাই-ই নয়, মা তোমাকে দারুণ বিশ্বাস করেন। আমি মাকে বলেই এসেছি যে তোমার কাছে আসছি।'

মিলির এ কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। একজন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত বয়স্কা গৃহবধূর এত মনোবল! তাঁর চব্বিশ বছরের অনূঢ়া সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যাকে একজন

অর্ধ পরিচিত যুবকের কাছে সারারাত কাটাতে দিতেও আপত্তি নেই! মিলিকে বললাম, 'তোমরা মা কি দেবী? তিনি কি আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত পড়তে পারেন? তিনি কী করে বুঝলেন যে আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না? সত্যি ব্যাপারটা ভাবতেই আমার অবাক লাগছে!' ঐখানে দাঁড়িয়েই হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে মিলির মায়ের উদ্দেশে নমস্কার জানালাম। আমার প্রণাম করা দেখে মিলি সামান্য হেসে ফেলল, 'আজ .... সারারাত আমি তোমার গায়ে মাথায় পায়ে হাত বুলোব, তুমি কিছু বলতে পারবে না কিন্তু!' 'তোমার যা খুশী!' বলে তার পাশে শুয়ে পড়লাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ঘুম ভাঙলে দেখলাম ঠিক গত কালকের মতো ব্রেকফাস্ট হাতে বেয়ারার সঙ্গে মিলিও আমার ঘরের টেবিলের সামনে উপস্থিত।

ব্রেকফাস্ট নামিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই বলল, 'কি মশায় আজও যে এত বেলা পর্যন্ত ঘুম! কি ব্যাপার কি, গতরাত্রে কি কারও জন্যে জেগে কাটাতে হয়েছে নাকি!' বলে সে ফিক করে হেসে ফেলল। তার হাত থেকে পেস্ট ব্রাশটা নিতে গিয়ে দেখলাম সাত সকালেই স্নান সেরে সে চাঁপা রঙের সিফন-জর্জেটের একটা শাড়িতে নিজেকে রমণীয়া করে তুলেছে। কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা টিপ পরেছে আর মাথার খোঁপায় একটা সাদা টগর ফুল গুঁজেছে। 'এত সকালে ফুলের আবির্ভাব কোথা থেকে হল?' প্রশ্ন করতেই, 'ইচ্ছা থাকলে উপায় করা যায়,' বলে গোটা দশেক স্বর্ণচাপা ফুল নিজের মুঠো থেকে আমার ডান হাতে তুলে দিল। ফুলগুলো নাকের কাছে নিয়ে দেখলাম একেবারে টাটকা চাঁপা, মুঠি খুলতেই ঘরটা গন্ধে 'ম ম' করে উঠল। সে বলল, 'নিন তো মশায় ফুলগুলো রেখে এখন বাথরুমটা ঘুরে এসে ব্রেকফাস্ট করুন তো দেখি!' আমি বললাম, 'কিন্তু ফুলের আবির্ভাব রহস্যটা উদ্ধার হল না তো?' হাসতে হাসতে সে বলল, 'বেয়ারা অর্জুন ভাইকে দিয়ে আনিয়েছি, দু-দিন আগেই বলেছিলাম, জোগাড় করতে পারেনি। আজ ভোরবেলায় ঠিক জোগাড় করে এনেছে। একেবারে টাটকা, দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি গাছ থেকে পেড়ে এনেছে!' 'সত্যিই ফুলগুলো টাটকা, শুধু তাই নয়, ঐ টাটকা টগরটা খোঁপায় গুঁজে তোমার মুখটাও টাটকা গোলাপের মতো হয়ে উঠেছে!' আমার কথায়, 'যাও, তোমায় আর ঠাট্টা করতে হবে না! কত একেবারে ভালোবাসা! কত একেবারে দিন রাত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন উনি! আজকের দিনটা আর রাতটুকু, ব্যস্, তারপর কোথায় থাকবে মিলি চ্যাটার্জী আর কোথায় থাকবে তার টাটকা গোলাপের মতো মুখ!' কথাগুলো বলতে বলতে সে মুখটা নীচু করে নিল।

ব্রেকফাস্ট সেরে, স্নান করে নিয়ে সে আর আমি তার বাবার কাছে হাসপাতালে গেলাম। বেলা বারোটা নাগাদ সেখান থেকে ফিরে লাঞ্চ সেরে মিলি বলল, 'আমি মায়ের কাছে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে পরে এখানে আসছি। আজ বিকেলে বাবার কাছে একবার হসপিটালে যাওয়া ছাড়া আমি সর্বক্ষণ শুধু তোমার কাছে থাকব!'

ঠিক একঘণ্টা পরে টুক করে দরজা খুলে সে আমার কাছে চলে এল। আমার

ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আমি ব্রাউনিং-এর 'দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার' কবিতাটি পড়ছিলাম। টিপি টিপি পায়ে সে এসে আলতো করে আমার পিঠে কিলোতে লেগে গেল, বলল, 'এই তো নিজেই লাস্ট রাইড টুগেদার পড়ছেন, আর গত তিনদিন ধরে আমাকে কেবল স্তোক দিয়ে চলেছেন! ছাড় কবিতার বই, ঘোর এই দিকে!' বলে নিজেই বইটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিজের দিকে করে দিল। বাধ্য হয়ে তার চোখে চোখ রাখলাম।

চোখে চোখ পড়তেই সে বলে উঠল, 'জানো দীপ, গতকাল রাতে আমার কোলে মাথা রেখে তুমি যখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলে ঠিক তখনই তোমার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তন্দ্রার ঘোরে আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি।' 'কী সে স্বপ্ন?' আমি প্রশ্ন করতেই মিলি আবার বলল, 'আজ থেকে প্রায় আট-ন বছর পরে ঠিক আমার মতোই আর একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, ঠিক আমারই মতই তার নরম মন নরম ব্যবহার। তার ব্যবহারে তার ভালোবাসায় তুমি নিজেকে আবার জড়িয়ে ফেলেছ। ঠিক আমারই মতো সেও তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে পেতে চাইছে, কিন্তু তুমি যেন ধরা দিয়েও দিতে চাইছ না, দিতে পারছ না। তোমার দূরবস্থা দেখে আকাশের বুক থেকে পরীর মতো ডানায় ভর করে নেমে এসে আমি বলছি 'দীপ এই সেই মেয়ে, যার কথা আমি বলেছিলাম, আমার অভিশাপের কথা ভুলে যাও দীপ। এগিয়ে যাও দীপ এই মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে যাও, এ মেয়েকে আর তুমি বঞ্চিত করো না, ওর তো বাধা নেই, ওর বাবা তো তোমার ভালোবাসার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেননি, দীপ তুমি এগিয়ে যাও, দীপ দীপ দীপ .....' আমি যত বলছি, তুমি ওর দিকে না এগিয়ে হাত দুটো উপরে তুলে আকাশের দিকে ছুটে আমার দিকে ধেয়ে আসতে চাইছ। আকাশের দিকে আসতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পেরে তাই আমি তোমাকে আবার বললাম, 'দীপ তুমি ভুল করছ আমি আর এখন মাটীর পৃথিবীর নই, যে মাটির পৃথিবীতে রয়েছে তার দিকে যাও, দীপ তুমি সামনে দেখ, পিছনে নয় সামনে দেখ। এই আকাশ অনন্ত, এ আকাশ অসীম। এখানে ছুটে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। দীপ তুমি এ কী করছ! দীপ দীপ তুমি ওর দিকে যাও!'

এতক্ষণ তার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'তা স্বপ্নের মেয়েটিকে দেখতে কেমন, ঠিক তোমার মতন তো, আমার তো আবার পছন্দ হওয়া চাই!' সে বলেছিল, 'রূপে সে তার মতো সুন্দরী নয় কিন্তু তার গুণে সে তোমাকে জয় করে নেবে দেখো। আমার এ স্বপ্ন কখনো মিথ্যে হতে পারে না!'

সারা দুপুর গল্পে কাটিয়ে বিকেলে সবাই মিলে হাসপাতাল থেকে তার বাবাকে দেখে এসে মাকে নিয়ে মিলি আমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসলাম, কিছুক্ষণ বসার পর তার মা বললেন, 'আমার শীত লাগছে, আমি হোটেলের ঘরে যাচ্ছি তোরা পরে আসিস।' আমরা দুজনে নানা গল্প করে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটায় হোটেলে ফিরলাম।

আমাদের ফিরতে দেখেই অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ডিনার দিয়ে গেল। ডিনার শেষে

মিলি মায়ের কাছে সামান্যক্ষণ কাটিয়েই আমার ঘরে চলে এল। আমি বুঝলাম আজকের এই পুরীর শেষ রাতটুকু সে একবিন্দু অপচয় করতে চায় না, তাই সাড়ে দশটার আগেই এসে আমার ঘরে ঢুকল।

সে ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তার পরণে একটা লাল ইঞ্চি পাড়ের সাদা ধবধবে সূতীর কাপড়। বেশ কিছুটা দূরত্বে একটা চেয়ারের উপর বসে স্থির দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'কী দেখছ অমন করে?' সে ছোট্ট উত্তর দিল, 'তোমাকে!' 'এস, কাছে এসো, কাছে এসো ভালো করে দেখ,' বলে তার হাত ধরে বিছানায় আনতে গেলাম, সে বলল, 'না আজ সারারাত আমি তোমাকে এমনিভাবে দূর থেকেই দেখব, প্লিজ দীপ, আজ তুমি আমায় একেবারে ডিস্টার্ব করো না। প্রাণভরে, দু-চোখ ভরে তোমায় দেখতে দাও! জানো দীপ, তোমার চোখগুলো, তোমার ঐ ঠোঁট দুটো কত সুন্দর!'

সে যখন কথাগুলো বলছে তখনও তার ডান হাতটা আমার হাতে ধরা। প্রায় জোর করে তাকে উঠিয়ে আমার বিছানায় ধরে নিয়ে এলাম। দেওয়ালের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে সে বিছানায় চুপচাপ বসে থাকল, তার মুখে কোনো উত্তর ছিল না, শুধু চোখে জল চিক চিক করছিল! এক সময় আমিই তার পিঠে হাত দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিলাম। আমি টানতেই মাথাটা বুকে গুঁজে দিয়ে চুপচাপ সে পড়ে থাকল, আমার বুকে তার গরম নিঃশ্বাস আর চোখের জলের স্পর্শ ভিন্ন অন্য কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে তার মধ্যে কোনো প্রাণ-শক্তি আছে। এক সময়ে তার মাথাটা তুলতে যেতেই বুঝলাম যে সে চেতনা হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম থেকে জল নিয়ে তার মুখে চোখে মাথায় ছিটে দিতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে চোখ মেলে হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলল, 'কোথায় তুমি দীপ? কাছে এসো প্লীজ।' 'এই তো আমি', বলে একেবারে তার মুখের কাছে আমার মুখটা নামিয়ে আনতেই সে জোর করে আমার ঠোঁট কামড়ে ধরল, বলল, 'তোমাকে এই আমার প্রথম, আর আমার শেষ উপহার, তোমার অমতে জোর করেই দিলাম। যাকে সর্বস্ব দেব বলে প্রস্তুত ছিলাম, তাকে মাত্র এইটুকু দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। প্লিজ দীপ, এর জন্য তুমি যেন আমাকে আবার বকতে শুরু করো না।। এই তোমাকে ছেড়ে দিলাম আর তোমাকে স্পর্শ করব না। আমার দেওয়া এইটুকু উপহার স্মৃতিতে রেখে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না দীপ? যদি না পারো তাহলে গতকাল রাত্রের স্বপ্নে দেখা সেই মেয়ের কাছ থেকে বাকিটা নিয়ে নিও। আমি জানি দীপ, তোমাকে পেলে সেও সব উজাড় করে দিতে চাইবে। আমার শেষ অনুরোধ, তুমি যেন তাকে বঞ্চিত করো না। সিঁথিতে সিঁদুর যদি কোনোদিন নাও দিতে পার তবু সে যদি মন প্রাণ দিয়ে তোমাকে চায় তাহলে একটি রাত্রের জন্যে হলেও তুমি যেন সম্পূর্ণভাবে তার হ'য়ো।'

কথাগুলো বলে আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে দরজার কাছ থেকে, 'আচ্ছা গুড নাইট।' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হাতের রিষ্ট-ওয়াচে দেখলাম রাত্রি

দুটো। বাকি রাতটুকু সমুদ্রেব দিকের বারান্দায় বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোর প্রায় চারটের সময় পাশের ঘরের সামনের বারান্দায় মিলি এসে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। এ বারান্দায় আমি যে বসেছিলাম সেটা সে খেয়াল করেনি। বারান্দায় ঝুঁকে সমুদ্রের দিকে একমনে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত চুল এলো করে খোলা। চুলগুলো হাওয়ায় এমনভাবে উড়ছিল দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন সর্বহারা রমণী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার জীবনের অন্তিম প্রহরের অপক্ষোয়।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তার বারান্দার দিকে ঝুঁকে ডাক দিলাম, 'মিলি, এই মিলি! একা একা দাঁড়িয়ে কেন! এখানে এসো আমার কাছে, একবারের জন্য আমার বারান্দার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সে উত্তর দিল, 'না, আমি সব শেষ করে দিয়েছি, আর তুমি কক্ষণো আমায় ডেকো না।' কথাগুলো বলেই সে ঘরে ঢুকে গেল।

সেই তার ব্যক্তিগত বিশেষ কথার শেষ। পরের দিন যথা সময়ে সে সব কিছুই করল। রাত্রের ট্রেনে বাবা মাকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছে মেডিক্যাল কলেজে তার বাবাকে চেক আপের জন্য ভর্তি করে দিয়ে, বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরবার আগে একবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, 'মিলি তুমি কি আমায় কিছু বলবে!' 'না, আমার যা বলার ছিল তা বলা হয়ে গেছে, প্লিজ দীপ, তুমি আমাব সঙ্গে কোনোদিন মেলামেশা করার চেষ্টা করবে না!' 'এ কথা কি তোমার প্রাণের কথা?' বলে আর একবার নিশ্চিত হতে চাইলাম, সে বলল, 'আমার প্রাণ মন কোনোটাই দুটো নয়, সবই একটা করে, সুতরাং কথাও একটাই। তার একথা শুনে মরিয়া হয়ে আর একবার বললাম, 'যদি তোমার বাড়িতে যাই তাহলেও কি তুমি দেখা দেবে না?' 'না না না, আঃ কেন তুমি অমন করে বার বার জিজ্ঞাসা করছ? বলছি তো আর কোনোদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!' একথা বলে সে আর সেখানে দাঁড়াল না। হতচকিতের মতো মিনিট কয়েক একা দাঁড়িয়ে সেখান থেকে মাথা নত করে বাড়ি ফিরে এলাম।'

এতক্ষণ বলার পর সংহিতা পুনরায় শুরু করল, 'সেদিন তার বলা ছোট্ট কাহিনীটা শুনতে শুনতে আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল দেখে, সচকিত হয়ে প্রশ্ন কবেছিল, 'ছিঃ তুমি কাঁদছ?' দীপেব সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি?' দীপ বলেছিল, 'হাঁ মাত্র দুবার দেখা হয়েছিল। প্রথমে বছর তিনেক পরে তার বিয়ের দিনে তার বন্ধু আরতিকে দিয়ে ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছিল। দীপ গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেখেছিল, তখন গায়ে হলুদের পর অন্য একটা কী অনুষ্ঠানে বাবাব পাশে বসে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। হাত ইশারায় তাকে পাশে যেতে বলতে দীপ পাশে গেলে দীপের কানে কানে মিলি বলেছিল, 'আজ আমার বিয়ের দিনে সকাল থেকে যত অনুষ্ঠান হচ্ছে সব অনুষ্ঠানেই আমি মন্ত্র পড়েছি কিন্তু তোমাকে স্মরণ করেই ; আমার বুকের মধ্যে জামার ভিতর তোমার একটা ছোট্ট ছবিও লুকনো আছে। এই পর্যন্ত শুনেই দীপ কান্না সামলাতে

না পেরে সেখান থেকে এক দৌড়ে বের হয়ে এসেছিল, আর আসবার সময় ওকে উপহার দেবার জন্য যে হারটা গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা আরতিকে দিয়ে ওর গলায় পরিয়ে দিতে বলেছিল। এরপর আরও চার বছরের মাথায় সে একদিন দীপকে ফোন করে দেখা করতে বলেছিল। তার কথা মতো একদিন বৃহস্পতিবার বেলা এগারটা নাগাদ দেশপ্রিয় পার্কের ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ওয়েটিং লাউঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করেছিল দীপ। বেলা সাড়ে এগারটায় ব্যাঙ্কে এসে তার নামে ফিক্সড অ্যাকাউন্টে রাখা দশ হাজার টাকা দীপের হাতে তুলে দিয়ে মুখটা নামিয়েই সে বলেছিল, 'তুমি একদম আমার চোখের দিকে চাইবে না, এক মিনিটও আমার কাছে দাঁড়াবে না, এক্ষুণি চলে যাও, তোমার চোখে চোখ পড়লে আমি কেঁদে ভাসিয়ে ফেলব। দীপ তুমি তাড়াতাড়ি পালাও এখান থেকে। তুমি জানো না দীপ, কত ব্যথা, কত কান্না আমার বুকে জমা হয়ে আছে!' তার কথা শুনে দীপ বলেছিল, 'আচ্ছা' এবং সেখান থেকে দ্রুত চলে গিয়েছিল।

ঐখানেই মিলির প্রসঙ্গের যবনিকা টেনে আমার মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে দীপ বলেছিল, 'এই জন্যেই আমি তোমার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চাই, সংহিতা। প্রথম জীবনে তোমারই মতো একজনকে বধূরূপে পেতে চেয়ে তাকে যে আঘাত দিয়েছি নিজে যে আঘাত সয়েছি, সেই আঘাতে পুনর্বার আর কাউকে আহত করতে চাই না আর নিজেও আহত হতে চাই না, তাই তোমাকে বারবার সাবধান করে দিতে চেয়েছি। হ্যাঁ আর একটা কথা, রবীন্দ্রসদনের আবৃত্তির অনুষ্ঠানে প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, কেন জানি না সেদিন বহু বছর আগে পুরীতে দেখা মিলির সেই স্বপ্নের মেয়েটির ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। হ্যাঁ তুমিই সেই মেয়ে, তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষিতা। দুঃখ দিয়ে মিলির মতো তোমার বুক বিদীর্ণ করে দিতে চাই না বলেই তোমাকে এড়িয়ে চলতে চাই!'

তার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'কিন্তু আমি যে তোমাকে প্রাণপণে চাই, ঠিক তোমার মিলির মতোই!' সে বলেছিল, 'সত্যি বলতে কি, আমার মন প্রাণ হৃদয়ও তোমার দিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বড্ড ভয় হয়। আমার জীবনে প্রথম প্রেমকে আমি দলিত-মথিত করেছি। আজ আবার যদি তার অভিশাপে তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলি!' তার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'তোমার মিলি তো তোমায় শাপমুক্ত করে দিয়ে গেছেন। যে নারী ভালোবাসে, সে কি কখনও তার ভালোবাসার মানুষের অমঙ্গল চাইতে পারে! আমাকে গ্রহণ করলে মিলি কোনোদিনই অসন্তুষ্ট হবেন না। তাছাড়া মিলি তো এখনও এই মর্তেই আছেন, তিনি তো বলেইছেন, তোমার যাকে পছন্দ তাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনতে, চলনা দুজনে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি তিনি কী বলেন! আমার কথায় দীপ খুব সন্ত্রস্ত ভঙ্গীতে চমকে উঠে বলেছিল, 'না না তা হয় না, সে এখন ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। দারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছে। এ অবস্থায় আমি তার সামনে গিয়ে

দাঁড়াতে পারব না। তার চেয়ে এই-ই ভালো, এসো দুজনে দুজনের বন্ধুই থেকে যাই। নাই বা হল বাইরের ফুলশয্যা, দুটি হৃদয়ের মধ্যে ফুলের শয্যা পাততে তো কোনো দোষ নেই!'

দীপের এই কাহিনী শুনে, তার অন্তরের ব্যথাটা অনুধাবন করে আমি আর তার সঙ্গে নিজেকে জড়াবার পথে পা বাড়াইনি, কিন্তু সেই দিনেতেই কথা দিয়েছিলাম যে, যতদিন বাঁচব তার বন্ধু হয়েই থাকব, অন্য কাউকে বরণ করে দীপকে আর আঘাত দেব না।

সে রাত্রে গল্পের শেষে সে যখন আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন তার মনটা খুব ভারী হয়ে আছে ভেবে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ট্রামডিপোর কাছ থেকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম। সারারাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটল।

পরের দিন রবিবার। লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে দীপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। হঠাৎ বেলা নটার সময় বেল শুনে গেট খুলে দিতে এসে আমাকে তার বাড়ির সামনে হাজির দেখে দীপের কি আনন্দ! সে আমার ডান হাতটা ধরে, 'এসো এসো' বলে অত্যন্ত যত্নে আমাকে তার বাড়ির দোতলায় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মিনিটের মধ্যে তার হুকুমে সরবৎ, জল খাবার এসে গেল। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সরবতের গেলাসে চুমুক দেবার আগে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'গত সন্ধ্যায় তোমার বলা মিলির কাহিনী শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত্রি আমি ঘুমোতে পারিনি, তাই ভোর না হতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বিনা নোটিশে এভাবে এসে পড়ায় তুমি রাগ করলে না তো?' আমার ডান হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে নিজের বুকের কাছে তুলে সে বলল, 'এ তো আমার সৌভাগ্য সংহিতা! তুমি এসেছ, এ তো অতি আনন্দের কথা। শুধু শুধু রাগ করব কেন!' তার বলার ধরণে চোখে মুখে খুশী উপচে পড়ছিল। তার খুশী দেখে আমি আশ্বস্ত হ'লাম।

সেদিন সারাদিন দীপের কাছে কাটিয়ে তার লাইব্রেরীর বই ঘেঁটে, কবিতা পাঠ করে যখন উঠলাম তখন সন্ধে সাতটা। দীপ স্টেশন পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল। তাকে ছেড়ে চলে আসতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবু আসতে হল!

এরপর দিন দুই পরে শিশির মঞ্চে আমার একটা প্রোগ্রামের কথা জানিয়ে তাকে ফোন করে দিলাম। অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ শুক্রবার একটা ধর্মঘটের জন্য দীপের অফিস বন্ধ ছিল। কাছে পিঠের অফিস থেকে ছোটদিকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এই দুপুর বেলায় অসময়ে সে আমাদের বাড়িতে আসবে কিনা! ছোটদি নির্দ্বিধায় তাকে চলে আসতে বলেছিল। সে এসে পৌঁছেছিল বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। আমি তখনও স্কুল থেকে ফিরিনি। আমি নেই দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোটদি ও মা তাকে জোর করে আটকে রেখেছিল। বেলা একটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি ছোটদার খাটে দীপ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তাকে দেখেই খুশীতে আমার মন প্রাণ উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। কাছে এসে তার মুখের উপর ঝুঁকে হাসতে হাসতে

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি আমার আবৃত্তিটা কি এই মঞ্চে হবে নাকি?' ধড়মড় করে উঠে বসে দীপ জবাব দিল, 'আরে দেখ না, তোমার আবৃত্তির জন্যেই তো আমার বাড়ি যাওয়া হল না! আজ বাজারে এসে দেখলাম পোস্তায় মারামারির জন্য আমাদের বাজারে ধর্মঘট হয়ে গেছে হঠাৎ। এই দুপুরে যদি বাড়ি ফিরে যেতে হয়, তাহলে আর আবৃত্তি শুনতে আসাই হবে না, তাই ছোটদিকে ফোন করে পারমিশন নিয়ে তবে এই দুপুরে তোমাদের এখানে এসেছি।'

কথাগুলো দীপ এমন সঙ্কোচের সঙ্গে বলছিল, যে শুনে মনে হচ্ছিল এই ভর দুপুরে পরের বাড়িতে এসে পড়ার জন্য তার লজ্জার অন্ত নেই। তার সেই সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'খুব ভালো হয়েছে, একা একা আমাকে এই বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে শোয়ার-ট্যাক্সিতে যেতে হত, তার চেয়ে তোমাকে সঙ্গী পেয়ে আমার সাহস বাড়ল। তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি চট করে স্নান সেরে ভাত-কটা খেয়েই আসছি।'

আধঘণ্টার মধ্যেই স্নান সেরে কোনো রকমে নাকে মুখে গুঁজে দীপের কাছে বসলাম। মা দীপের জন্য সরবৎ ও মিষ্টি নিয়ে এলেন। দীপ শুধু সরবৎটুকু খেয়ে মিষ্টি পরে খাবে বলে ফিরিয়ে দিল। এরপর সারা দুপুর দীপের মাথার কাছে বসে হাজার রকম গল্পে মেতে গেলাম। দীপের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বলে ফেললাম, 'সত্যিই দীপ, তোমার চোখগুলো আর ঠোঁট দুটো সত্যিই খুব সুন্দর। যে মেয়ে দেখবে তারই লোভ হবে।' আমার কথায় দীপ কিছু বলল না। আমার ডান হাতটা নিয়ে বুকের তলায় গুঁজে উপুড় হয়ে ঘুরে শুল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, 'এ্যাই পাজী! এখানে ঘুমোবার জন্য আসা হয়েছে! নাঃ ঘুমোন চলবে না, তার চেয়ে এই কদিনে কী কবিতা লিখেছ পড় শুনি।'

কথাটা শেষ করে দীপের খাতাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই পড়া শুরু করলাম। বেশ কয়েকটা কবিতা পড়ে দীপকে বললাম, 'তোমার কণ্ঠে এবার শুনব তোমার স্বরচিত কবিতা।' বিছানার উপর সোজা হয়ে উঠে বসে দীপ খুব সুন্দর করে কবিতা পড়তে লাগল। তার কণ্ঠস্বর শুনে ছোটদি ও মা পাশের ঘর থেকে উঠে এসে কবিতা শুনতে লাগলেন। প্রায় গোটা দশেক কবিতা পড়ে দীপ থামতেই সেজদি এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সেজদি বলল, 'অফিস থেকে এসেছে, দীপকে কিছু খেতে দিয়েছিস নাকি শুধু কবিতাই পড়াচ্ছিস! যা ওঠ, আগে দীপের জন্য কিছু খাবার এনে দে, তারপর কবিতা হবে। সব সময় কেবল কবিতা কবিতা আর কবিতা! আর দীপটাও হয়েছে তেমনি, কবিতা পেলে আর কোনো জ্ঞান থাকে না, খিদে তেষ্টাও ভুলে যায়!'

সেজদির স্নেহপূর্ণ অনুযোগ শুনে দীপ বলল, 'যাঃ পেট খালি থাকলে কি কবিতা পড়া হয় নাকি! এখন আমার খিদে পায়নি, খিদে পেলে আমি ঠিক চেয়ে খাব, এ

বাড়িকে আমি কখনই পরের বাড়ি মনে করি না।' সেজদির একটা হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিয়ে, 'এ্যাই সেজদি, তুমি আমার পাশে একটু বস গোটা কয়েক কবিতা শোন, শুনে বলতো কেমন লাগছে!' সেজদি ভালোই জানত দীপ কেমন কবিতা পাগল, তাই তার কথায় চুপ করে তার পাশে বসে কবিতা শুনতে লাগল আর যেখানটায় যেখানটায় ভালো লাগল সেই জায়গাগুলো দু-বার তিন-বার করে পড়তে অনুরোধ করতে লাগল। সেজদির ব্যাপার স্যাপার দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'কিরে সেজদি, তুইও শেষকালে কবিতা-পাগলী হয়ে গেলি নাকি!' সেজদি বলল, 'সত্যিরে দীপের গলায় কবিতাগুলো এত ভাল লাগে! নিজে পড়লে এতটা ভালো লাগে না, কেন বলো তো?' সেজদিকে ঠাট্টা করার জন্য বললাম, 'কণ্ঠে যে জাদু আছে, তাই মোহিত হয়ে গেছিস!' 'এইবার তোকে ঠ্যাঙাবো,' বলে সেজদি আমার দিকে তেড়ে এল, আর আমিও টুক করে কিচেনে এসে ঢুকে দীপের জন্য ওমলেট তৈরি করতে লেগে গেলাম।

তারপর আরও ঘণ্টা দেড়েক গল্পে গল্পে কাটিয়ে বেলা পৌনে পাঁচটা নাগাদ দীপের সঙ্গে মন্দিরতলায এসে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে উঠেই দীপ বলল, 'চলুন।' তার হাবভাবে বুঝলাম বাবু কারও সঙ্গে আমাকে শেয়ার করতে রাজী নয়। ট্যাক্সিওয়ালা একবার জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু আপনারা মিটারে যাবেন না শেয়ারে যাবেন?' দীপ বলল, "না না শেয়ার টেয়ার নয় আমরা মিটারের পুরো ভাড়া দিয়েই যাব।' একা একা দীপের পাশে বসে যেতে পাবো বুঝে আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

মন্দিরতলার বাস-স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে ট্যাক্সি নতুন ব্রীজে উঠতেই দেখলাম দীপ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সে প্রথম এই ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছে তাই সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একবার তার চিবুকে হাত দিয়ে নিজের দিকে মুখটা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম, মুহূর্ত কয়েকের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আবার বাইরের ব্রীজ দেখতে লাগল। গঙ্গা পার হয়ে গাড়ি যখন কলকাতার দিকে ঢুকছে, তখন দীপ বলে উঠল, 'দেখ দেখ হাস্নু, এখান থেকে কি সুন্দর লাগছে কলকাতাকে! সত্যিই যেন স্বপ্ন-সুন্দরী!' তার সারল্যভরা কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'কবিদের কাছে কলকাতা স্বপ্ন সুন্দরী, কল্লোলিনী, তিলোত্তমা ইত্যাদি কত কি, কিন্তু আসল কলকাতাটি কী বস্তু বল তো! আসল কলকাতাটি তো আজ আর বাঙালিকে নিজের লোক বলে মনেই করেন না!' 'সেটা কলকাতার দোষ নয়, কলকাতার পরিচালকদের দোষ।' তার কথায় আমি বললাম, 'অবশ্যই পরিচালকদের!' কথায় কথায় ট্যাক্সি এসে রবীন্দ্রসদনের কাছে থামতে, ভাড়া মিটিয়ে আমরা দুজনে রবীন্দ্রসদনের পূর্বদিকের ঘাসে পা ডুবিয়ে হেঁটে গিয়ে শিশির-মঞ্চে পৌঁছুলাম।

গ্রীণ-রুমে ঢোকবার আগে দীপকে বললাম, 'তুমি একটু অপেক্ষা কর, অজিতাভদা তোমার জন্য এখানে এসে অপেক্ষা করবেন, তিনি এলেই তুমি তার সঙ্গে হলে ঢুকে যাবে। তার কাছেই তোমার গেষ্ট-কার্ডটা দেওয়া আছে। হাতের ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে

দীপ বলল, 'ঠিক আছে তুমি ভেতরে চলে যাও আমি একটু ঘুরে টুরে এসে ঠিক ছটায় হলে ঢুকবো।'

সে সন্ধ্যায় মঞ্চে আবৃত্তি শেষ করে হলের মধ্যে দীপের পাশে বসতে গিয়ে দেখি সেখানে অন্য একজন ভদ্রলোক সীট আলো করে বসে আছেন। দেখে খুব রাগ হল। আমি যেভাবে কার্ড দিয়েছিলাম, তাতে দীপের বাঁদিকের সিটটা তো খালি থাকবারই কথা, কিন্তু এরকমটা কী করে হল! পরে দীপের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ঐ ভদ্রলোক দীপের পাশে এসে বসে পড়েছেন। ভিতরে ভিতরে রাগ হলেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু করার ছিল না তাই অজিতাভদার ডানদিকের সিটে বসে পড়তে হল। অনুষ্ঠান শেষে একটা ট্যাক্সি করে সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত্রি সাড়ে-নটা। আমাদেব সকলকে বাসে তুলে দিয়ে দীপ চলে গেল ট্রেন ২ ৮।

পবের দিন শনিবার, দীপকে ফোন করে বিকেলে আসতে বললাম। দীপ আমাদের বাড়িতে এল ঠিক সাড়ে তিনটেয়। সে অফিস থেকে এসেছিল বলে তাকে একেবারে চা জলখাবার খাইয়ে নিয়ে তিনতলার লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলাম। লাইব্রেরীতে ঢুকেই সে এ-বই ও-বই নিয়ে টানাটানি কবতে লাগল। দীপের ছিল এই এক স্বভাব। বইপত্র কাছে পেলে আর পাশের মানুষের সম্বন্ধে তার খেয়ালই থাকত না। তক্ষুণি সে অন্যমনস্ক হযে পড়বে বুঝে তার হাত থেকে বই নিয়ে কবিতা পড়তে পড়তে এক সময় বইটা চট করে নামিয়ে রেখে তার কাছে বসলাম। তার পাশে বসতেই দীপ বলল, 'এত গায়ের কাছে বসছ কেন? একটু দূরে বস!' 'না আমি তোমার গায়ের কাছেই বসব, দেখব কী হয়!' বলে তার ডান হাতটা কোলে তুলে নিয়ে হাতের উপব হাত বুলোতে লাগলাম। কি জানি কি হল, দীপও আস্তে আস্তে তার বাঁ-হাত দিয়ে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর কখন যে দুজনে নিবিড হয়ে বসেছি খেয়াল ছিল না, খেয়াল হল, দীপ যখন আমার মাথাটা তাব বুকের মাঝখানে টেনে নিয়ে হাত বুলোতে লাগল আর বলতে লাগল, 'হ্যাঁ হাসু, তুমিও ঠিক তারই মতো আমায় ভালোবাস!' আমি বললাম, 'তাই কি পারি! তিনি ছিলেন তোমার প্রথম ভালোবাসা, তোমার প্রেমের প্রথম জগত, আর আমি হলাম তোমার দ্বিতীয় জগত!' ঠিক এই সময় দীপ নিজেকে সড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি বললাম, 'তোমার কি কোনো অস্বস্তি হচ্ছে?' 'না ঠিক অস্বস্তি না, তবে আমি তোমাকে নষ্ট করতে চাই না, তাই!' দীপের কথা শুনে হেসে বললাম, 'মানুষ মানুষকে ভালোবাসলে নষ্ট হয় নাকি? কে বড়? মানুষ না ভালবাসা?' আমার এ কথার কোনো জবাব দীপ দিতে পারল না শুধু বিস্ময়-নিবিড় অপলক চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকল।

তার সেই নিবিষ্টতা দেখে আমি বললাম, 'দীপ, আমি কোনো বন্ধন চাই না, শুধু তোমাকে চাই, যেমনভাবে তোমার মিলি শেষের দিকে তোমাকে চেয়েছিল, ঠিক সেরকমভাবে ; পারবে না দীপ আমাকে তোমার বুকের উপর টেনে নিতে?' 'না তা

হয় না হাসু,' বলে দীপ ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে ছাদে চলে এসেছিল। আমিও তার সঙ্গে ছাদে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। অজস্র তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, সে রাত্রে হঠাৎ দীপ গলা খুলে গেয়ে উঠল—

"জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে।।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে কী আছে আমার মনে।
চির নিশীথতিমির গহনে আছে মোর পূজাবেদী—
চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি।
বিজন দিবস-রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো—
তুমি শুনে যাও খনে খনে কী আছে আমার মনে।।"

এরপর দীপ আবার একখানি গান ধরল—

"রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।।
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমাচাঁদ, তুমি এলে।।
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিবে, যাক সে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে।।"

আচম্বিতে দীপকে পরপর দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুনে তার গলার কারুকার্য্য ও গানের বিস্তার শুনে আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম এই আমার দীপ! আমার দীপ এত গুণের! মুহূর্তে তাকে ছাদের আলসের ধার থেকে টেনে ঘরে নিয়ে এসে জোর করে জাপটে ধরলাম ও কম্পিত আবেগে বললাম, 'দীপ আমার দীপ, আমার দীপ...!' তাকে কতক্ষণ ঐ ভাবে জাপটে ধরেছিলাম মনে নেই আর আবেশে বিভোর অবস্থায় কতবার যে আমার দীপ আমার দীপ বলেছিলাম তাও মনে নেই, শুধু মনে আছে, দীপ নিজে হাতে চিবুক তুলে ধরে আমার অধরে পরিপূর্ণ প্রেমে একখানি গভীর প্রেমচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। তারপর আমার কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটোকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, 'হাসু আমার সময় বড় অল্প এবার আমাকে যেতে হবে, যাবে না আজ

আমাকে পৌঁছে দিতে তোমাদের শিবপুর ট্রামডিপোর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত!' আমি বলেছিলাম, 'যাব'।

এরপর সে দোতলায় নেমে একে একে মায়ের কাছে, সেজদির কাছে, ছোটদির কাছে আলাদা আলাদাভাবে বিদায় নিয়েছিল এবং প্রত্যেকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। তখনও কি জানতাম, যে সেই প্রণামই তার বিদায়ের প্রণাম! দীপ আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসবে না!

সেদিন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছতেই দীপ হঠাৎ বলল, 'চল হাস্নু, আজ তো বেশী রাত হয়নি সবে সাড়ে সাতটা, চল আজ আমাকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে চল।' তার কথায় খুব আনন্দের সঙ্গে হাওড়ায় পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে তাকে সাতটা পঞ্চান্নর দুশো তেত্রিশ নম্বর আপ বর্ধমান লোকালে তুলে দিয়ে যতক্ষণ না ট্রেন ছাড়ল ততক্ষণ তার জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে তার ডান হাতটা ধরে নেড়ে দিয়ে আমি তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাড়ি এসেছিলাম, কিন্তু তখনও বুঝিনি, যে সেই ছোঁয়াই আমার শেষ ছোঁয়া, সেই বিদায়ই আমার শেষ বিদায়। দেখলে তো, দীপ আমাকে কেমন বোকা বানিয়ে চলে গেল! আমাকে আজীবন কাঁদবার অবকাশ দিয়ে সে কেমন হাসতে হাসতে চলে গেল!'

সংহিতার কথা শেষ হতেই বাড়ির দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। সঙ্গীতা উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই, দেখল, সিঁড়ির মাথায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা খাম। সামনে সঙ্গীতাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'এটাই তো হাস্নুদের বাড়ি? মানে সংহিতাদের বাড়ি?' সঙ্গীতা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আপনি কোথা থেকে আসছেন!' 'আমি আসছি মল্লিক ফটক থেকে, আমার নাম দিলীপ ব্যানার্জী, মৃত্যুর আগে শ্রীদীপ এই চিঠিটা সংহিতা দেবীর জন্য লিখে রেখে অন্য একটা খামে ভরে আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। পোষ্ট মারফৎ আমার বাড়িতে পৌঁছতে দু-একদিন সময় লেগেছে। চিঠিটা আজই পেয়েছি, তাই দিয়ে গেলাম।' ঘরের ভিতরে বসে সংহিতা সবই শুনতে পাচ্ছিল। সে সেখান থেকেই বলল, 'ছোটদি, ভদ্রলোককে উপরে আসতে বল, বল সংহিতা ডাকছে!' ভদ্রলোক সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সংহিতার গলা শুনতে পেয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সঙ্গীতাকে বললেন, 'ওর সামনে ঠিক এই মুহূর্তে আমি দাঁড়াতে পারব না, পরে না হয় একদিন এসে দেখা করে যাব! দীপ আসলে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।' কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক আর না দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বারান্দায় বের হয়ে সংহিতা ডেকেও তাঁর আর সাড়া পেল না।

এরপর সঙ্গীতার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে খামটা খুলে দেখল, ছোট্ট একটা সাদা চকচকে আর্টপেপারে কালো কালি দিয়ে লেখা।

'হাস্নুহানা আমার, চললাম। আমার সময় হয়ে গেছে। যাবার আগে তোমার জন্য এই চিঠিতে একটা শেষ চুম্বন রেখে গেলাম, দুটো গোলাপের পাপড়ি আর কয়েকটা

হাস্নুহানার পাপড়ি রেখে গেলাম। অনেকক্ষণ আগেই খবর পেয়েছি জীবনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মিলি আত্মহত্যা করে করে তার জ্বালা জুড়িয়েছে, তাই তার কাছে যাবার জন্য আমিও বারোটা ঘুমের বড়ি খেলাম। বেশ কিছুক্ষণ আগেই বড়িগুলো খেয়েছি। তোমাকে একটা শেষ অনুরোধ, আমার মতো অভিশপ্ত মানুষকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো আর পার তো একদিন আমার বাড়িতে এসে আমার ছবিতে একটা টাটকা বেলফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে যেও। তোমার হাতের মালা পেলেই আমি মিলির কাছে পৌঁছুতে পারব। চললাম হাস্নুহানা! ঐ মিলি আমার জন্য দুহাত বাড়িয়ে পরী সেজে আকাশ থেকে নেমে আসছে, ঐ মিলি আমায় নিতে আসছে, চললাম হাস্নু, আমি চললাম।'

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সংহিতা বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে একে একে সবাই পড়লেন। চোখের জল মুছতে মুছতে সরিতা শুধু একবার বলে উঠলেন, 'মানুষ নিজের প্রতি এত নিষ্ঠুরও হয়!' তার কথা শুনে রমলা বলে উঠলেন, 'ও যে দেবদূত! ওর মতো দেবদূতেরা পৃথিবীর মানুষকে যুগে যুগে এরকম করেই জ্বালিয়ে যায়, কাঁদিয়ে যায়! ওদের যত মায়া তত নিষ্ঠুরতা! ওরা যে দেবদূত মা, ওরা যে দেবদূত! ওদের কি কেউ কখনো কোনো মায়ার বাঁধনে বাঁধতে পারে!'